বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ (১৯৪৭ - ১৯৭১)

দিলারা হাফিজ (বি.এ. অনার্স, এম.এ)
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
382310

382310

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি ডিগ্রির জন্যে প্রস্তুত গবেষণা
সেপ্টেম্বর - ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ (১৯৪৭ - ১৯৭১)

দিলারা হাফিজ (বি.এ. অনার্স, এম.এ)
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382319

তত্ত্বাবধায়ক:

ওয়াকিল আহমদ (পি.এইচ.ডি, ডি-লিট)
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যন্ত যে সময়কাল, বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের জন্যে তা খুবই গুরুত্ববহ। এই সময়ে দেশ এবং জাতি নানাবিধ আন্দোলন ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল যে ঘটনা — মাতৃভাষার জন্যে অকাতরে রক্তদান — তা এই সময়কালেই সংঘটিত হয়। বলাবাহুল্য, দেশ ও সমাজের মতো সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে গভীরভাবে। বিশেষ করে, কবিতায় তৎকালীন জীবনের বিচিত্র আবেগ, প্রতিবাদ, আশা-আকাঙক্ষার প্রতিফলন অধিকতর পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য পর্বে (১৯৪৭-১৯৭১) বাঙলাদেশের কবিতায় আমাদের দেশ ও সমাজের মানুষ, এই গণমানুষের চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙক্ষার যে পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। আমার জানা মতে, এর আগে এ বিষয়ে কোন গবেষণা হয়নি। এ কারণে আমি এ বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

প্রস্তাবিত বিষয়টি আমি নিম্নোক্ত ৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি —

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি।

বাংলা-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠির রয়েছে দীর্ঘ দিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সময়ে নানা অভিঘাতে এই ধারা হয়েছে সমৃদ্ধ। বহিরাগত নানা সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এই জাতির ভাষা ও সাহিত্য হয়েছে সমৃদ্ধ। সামাজিক, রাজনৈতিক নানা উত্থান-পতনসহ এর অর্থনৈতিক বুনিয়াদও আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এ দেশের মানুষ সংগ্রামশীল। আমাদের কবিদের কবিতায়ও স্বাভাবিকভাবেই এই সংগ্রামী জনগোষ্ঠির কথা এসেছে। এই পর্বে আমি বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কবিজীবন ও কাব্য—পরিচিতি।

382310

বাংলাদেশের প্রধান-প্রধান কবির জীবন ও রচনাবলীর আলোকে এই সময়কালের বিচার করতে গিয়ে আমি তিন (চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের) দশকের প্রধান কবিদের ব্যক্তিজীবন ও কাব্যালোচনা করে সমকালীন সময়ে তার প্রতিক্রিয়া ও ভাবাবেগ কীভাবে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে — তা নিরূপণের চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে প্রত্যেক কবির ব্যক্তিজীবনের অনুষঙ্গ যথাযথভাবে অনুসরণ করবার প্রয়াস পেয়েছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম-বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কৃষি-ভিত্তিক জীবন থেকে উঠে এসে এই কবিরা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ভাবধারা কীভাবে আত্মস্থ করেছেন, সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন টানা-পোড়েন, ঘাত-প্রতিঘাত, আলোড়ন-বিলোড়নে কতটা আন্দোলিত হয়েছেন — তাঁদের রচনায় এইসব সামাজিক আন্দোলন ও আলোড়নের অভিঘাত কতটা সার্থক ও সফলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে — তা বলবার প্রয়াস পেয়েছি। এক্ষেত্রে আলোচ্য পর্বের সময়-পরিধিতে শুধুমাত্র সেই কবিদের আমি অন্তর্ভুক্ত করেছি — যাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১৯৭১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এমনও দেখা গেছে, ষাটের দশকের অনেক কবি সেইসময়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু যেহেতু '৭১-এর মধ্যে কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, এরকম ক্ষেত্রে আমি তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করিনি। তবে সার্বিক আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের কথা এসেছে। ১৯৪৭-'৭১ সময়পরিধির মধ্যে যে ক'জন কবির ব্যক্তিজীবন ও কাব্যগ্রন্থ আলোচনায় এসেছে — তাঁদের জীবন ও রচনা একনজরে দেখার জন্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি সারণী প্রদান করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রতিফলন এবং স্বরূপ অন্বেষণ

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে এদেশের জনগোষ্ঠির ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে এসে আছড়ে পড়েছে নানা তরঙ্গ। স্বাধিকার অর্জন ও গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন, বিশেষ করে 'ভাষা-আন্দোলন' ব্যক্তিজীবনকে যেমন, সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনকেও তেমনি প্রভাবিত করেছে। স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের আন্দোলন ধাপে-ধাপে উন্নীত হয়েছে "স্বাধীনতা ও মুক্তি-সংগ্রামে"। আমাদের কবিদের রচনায় এর প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে — এই অধ্যায়ে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি।

চতুর্থ অধ্যায় : বিষয়বস্তু ও রূপপ্রকরণ

রবীন্দ্রনাথ আধার ও আধেয়ের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, সেই সূত্র মনে রেখে বলা যায়, কবিতার যে ভাষা এবং রূপ কবির চেতনালোক থেকে উত্থিত, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ, তার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এবং আলোড়ন দ্বারা তা প্রভাবিত। এই অধ্যায়ে সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে কাব্যের আঙ্গিক ও ভাষার ব্যবহার কতটা অনিবার্য এবং যথাযথ, সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আশা করি, এতে বাংলাদেশের কবিতার একটি সামগ্রিক ধারা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

উপসংহার

স্বাভাবিকভাবে উপসংহারে পূর্বের অধ্যায়সমূহে বর্ণিত বিষয়ের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়-পর্বে রচিত বিভিন্ন কবির রচনায় বাংলাদেশের জলবায়ু এবং তার সমাজ-বাস্তবতা কীভাবে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তারই একটি সামগ্রিক রূপ অনুধাবনের জন্যে এবং বাংলাদেশের কবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে আমি এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করি।

আমার এ গবেষণা-সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, কলা অনুষদের প্রাক্তন ডীন এবং প্রাক্তন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর ওয়াকিল আহমদ। তাঁর সাগ্রহ ও আন্তরিক নির্দেশনা ও মূল্যবান উপদেশ আমাকে এই অভিসন্দর্ভ রচনায় নিরন্তর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সময়ে-অসময়ে শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মে সর্বদাই যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন সেজন্যে আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রফেসর শঙ্খ ঘোষ, প্রফেসর পবিত্র সরকার, প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রফেসর মোহাম্মদ আবু জাফর, প্রফেসর সাঈদ-উর-রহমান বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণার আলোচ্য সময়-পরিধির কবিবৃন্দ এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার দানে আমাকে বাধিত করেছেন। এজন্যে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ৭ — ৩৪

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৫ — ১২১

ব্যক্তিজীবন ও কাব্য-পরিচিতি

তৃতীয় অধ্যায় ১২২ — ১৮৬

কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রতিফলন এবং স্বরূপ অন্বেষণ

চতুর্থ অধ্যায় ১৮৭ — ২৩০

বিষয়বস্তু ও রূপ—প্রকরণ

উপসংহার ২৩১ — ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল প্রথম পর্যায়ে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্তবাদী শক্তিসমূহের ধ্বংস-সাধন ও তদস্থলে নবযুগের নতুন শক্তির পত্তন ঘটানো এবং পরবর্তী পর্যায়ে বহির্দেশে স্ব-জাতির প্রভুত্ব বিস্তার করা। কিন্তু বাংলাদেশে যখন এই ভাবধারার আংশিক ব্যাপ্তি ঘটে ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন তার সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের বুক থেকে বিদেশের উপনিবেশবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করা। সামন্তবাদ এই আন্দোলনের প্রধান শত্রু নয়, প্রধান শত্রু হল ইংরেজ।[১] উপনিবেশবাদী ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করার এই আন্দোলনে সামন্তবাদী শক্তিসমূহও ছিল অংশীদার। ফলে দেশের প্রচলিত সামন্তবাদী ভাবধারার সংগে বহিরাগত মানবতাবাদী ভাবধারার একটা সংমিশ্রণ ও সমঝোতা দেখা গেছে। রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে সামন্তবাদী শক্তির ঐকমত্য লক্ষ্য করা গেছে।

সামন্তবাদী ভাবধারা ও শক্তিসমূহকে জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে শাসক ইংরেজেরও ভূমিকা ছিল অনেক। গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী শক্তি যতটা উপনিবেশবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদী শক্তি ঠিক ততটা নয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক শোষণের জন্যেও সামন্তবাদী কিংবা প্রায়-সামন্তবাদী একটা ব্যবস্থাই ছিল তাদের পক্ষে অধিকতর অনুকূল। সর্বোপরি সামন্ত-যুগীয় জীবনাদর্শের অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে এদেশের জনগণ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকার ফলে ইংরেজদের পক্ষে এদেশে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন চালানো সহজ ছিল। ইংরেজ শাসকেরা এ ব্যাপারে সচেতন ছিল এবং সব সুযোগেরই তারা সদ্ব্যবহার করেছিল। এর ফলেই উদ্ভব হয়েছিল 'দ্বিজাতিতত্ত্বের'।[২] এই দ্বিজাতিতত্ত্বকে ব্যবহার করেই ব্রিটিশ সরকার ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরায় এই উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান এই দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের যে শিক্ষা হয়েছিল, তার ফলে তখন থেকেই তারা এদেশে তাদের শাসন কায়েম রাখার জন্যে নীতি হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছিল সুকৌশলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, গোড়া থেকেই ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে সাড়া দিতে পারেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের প্রবেশ ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসকে অনেক ক্ষেত্রেই কালিমালিপ্ত করে রেখেছে। সাধারণ হিন্দু-মুসলমান ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সেখানে সামান্যই রূপ পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ তাদের বিভেদনীতির খেলায় শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে। ফলে সাম্প্রদায়িক রেষারেষির পরিণামে ভারতবর্ষ প্রথমে হয়েছে দ্বিখন্ডিত, তারপর এসেছে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই বৈরিতা, বারংবার যুদ্ধ, ফলে এখনো আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম।[৩]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রথম সভাপতি ডব্লিউ সি. ব্যানার্জী। ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি। উল্লেখ

---

১. আবুল কাশেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম (প্রথম পর্ব), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জুন ১৯৭২, পৃ. ২।
২. পূর্বোক্ত
৩. ড. মধুসূদন চক্রবর্তী, বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

করা যেতে পারে ১৮৮৬-তে কংগ্রেসের দ্বিতীয় সভাপতি দাদাভাই নওরোজীর ভাষণ — Then I put the question plainly : Is this congress a nursery for sedition and rebellion against the British Government (cries of no, no) or is it another stone in the foundation of the stability of that Government (cries of yes, yes)?

এরপর দ্রুতগতিতে ইতিহাসের পটপরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ হলো লর্ড কার্জনের সময়ে। ইতোপূর্বে ১৮৫৩ সালে স্যার চার্লস গ্রান্ট বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্তিকরণের সুপারিশ করেন। ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসী প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে সমরূপ মন্তব্য করেন। এই বিভক্তিকরণ হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। কিছুতেই তারা এই বিভাজন মেনে নিতে পারেনি। ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য বিশাল আন্দোলন দানা বাঁধে। অপরদিকে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বঙ্গভঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। প্রতিবছর লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের সমর্থন ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলনের নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেয়। অপরদিকে ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালের ভারতীয় কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ রদ ও বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। লীগ ও কংগ্রেসের কোন্দলের সূত্রপাত হলো লীগের জন্মলগ্ন থেকেই।

১৯০৯ সালে লীগের আন্দোলনের ফলে মর্লিমিন্টো রিফর্ম। এতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় বিপ্লবীরা তাতে সক্রিয় অংশ নেয়। তাঁদের প্রচেষ্টায় সারা বাংলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯০৮ সালে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী এই আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দান করেন। ফলে ১৯১১ সালে এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠার প্রাক্কালে রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। এই বছরে বল্কান যুদ্ধে তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশ আচরণ, ইতালী কর্তৃক ত্রিপলী অধিকার, আলীগড়ে এবং ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সরকারী গড়িমসি ও কালক্ষেপণ ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমানদের মনে নতুন করে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে।

১৯১৩ সালে লীগের সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনতন্ত্রের পুনর্বিন্যাস করে মুসলীম লীগ অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসনই লীগের লক্ষ্য বলে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেয়া হয়।[১] ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে তুরস্ক স্বীয় স্বার্থে জার্মানীর পক্ষ হয়ে মিত্রশক্তি বৃটেন-ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তুর্কী-জার্মান আঁতাতও ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে হতবুদ্ধি করে তোলে।[২] এই বছরেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে কংগ্রেসে যোগ দেন। এরপর তিনিই ধীরে ধীরে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতায় পরিণত হন এবং তাঁর ইচ্ছে অনুসারেই কংগ্রেস পরিচালিত হতে থাকে।

লীগ ও কংগ্রেস নেতারা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে জনগণের অর্থনীতিক, রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে প্রগতিশীল কর্মসূচী গ্রহণ করে পরস্পরের কাছে আসে। ১৯১৮ সালের কুখ্যাত মন্টেগু

---

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪র্থ সং-১৯৯২, পৃ: ৪৭৪।
২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চেমসফোর্ডকে লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই প্রত্যাখ্যান করে। ইংরেজের দমননীতি আরও প্রচন্ড হয়। ১৯১৯-এ গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া রাওলাট এ্যাক্ট-এ উপরোক্ত রিপোর্টই গৃহীত হয়।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিন পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক নিরস্ত্র জনতার উপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গুলি চালায়। ফলে প্রায় ৪০০ লোক নিহত হয়। এই হত্যাযজ্ঞের ফল ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস সুদূরপ্রসারী হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন।

গান্ধী, তিলক প্রমুখ 'খিলাফত' প্রশ্নে মুসলমানদের পূর্ণ সমর্থন জানান। ১৯২০ সালের নাগপুর অধিবেশনে সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' বা 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে'র কর্মসূচী গৃহীত হয়। সারাদেশে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন চলতে থাকে। অচিরেই সারাদেশে অসহযোগ গণ-আন্দোলন প্রতিরোধের আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯২২ সালে গান্ধীকে গ্রেফতার করা হলে অসহযোগ আন্দোলনে ক্রমশ ভাটা পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও উপমহাদেশের ইতিহাসে এই গণজাগরণ ছিল অভূতপূর্ব। সেইজন্যে উপমহাদেশের স্বাধিকার-আন্দোলনের ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলনের অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন এই দেশের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছিল সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।[১]

১৯২০-২১ সালে 'খিলাফত' ও 'অসহযোগ' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান কাছাকাছি এসেছিল। একটা সম্প্রীতির ভাবও গড়ে ওঠে। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের এই সদ্ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। উভয়ের মিলিত ধর্মনিরপেক্ষ একটি স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে সম্ভাবনা ছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এর জন্য প্রধানত দায়ী করেছেন আন্দোলনে হিন্দুচরিত্র প্রতিষ্ঠায় গান্ধীর অবিরাম প্রয়াসকে।[২] এরিমধ্যে ১৯২২ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজাফর আহমদ। ১৯২৭ সালে বসলো সাইমন কমিশন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিধানসভা চালু হল ১৯৩৫-এ।

লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শিক নীতিগত বিরোধ ক্রমবর্ধমান হতে আরম্ভ করে। মতিলাল নেহরু কমিটি ১৯২৮ সালে শাসনতন্ত্রের নীতি-নির্ধারণ বিষয়ে যে সুপারিশ করেন তাতে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ১৯২৯ সালে দিল্লীতে আগা খাঁর সভাপতিত্বে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের দাবি উত্থাপিত হয় নতুন ভাবে। ঐ বছর দিল্লীতে লীগের অধিবেশনে জিন্নাহ্‌ও মধ্যপন্থী সমাধানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

১৯২৯-এ কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করে।

কিন্তু মুসলিম সমাজের বৃহদংশ এতে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা দেখতে পেল না। ১৯৩২-এ যে ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন হয়, তাতে এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়।

---

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ: ৪৭৯।
২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান: আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, ১৯৭০, পৃ: ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একপ্রকার বৈরিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতোমধ্যেই। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার অনুসারে ১৯৩৭ সালে যখন সাধারণ নির্বাচন হল, কংগ্রেস জয়ী হয়ে ৭টি প্রদেশে যখন সরকার গঠন করল, তখন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস সরাসরি অগ্রাহ্য করল।

১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগের পাটনা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ্ বলেন : "The congress has now, you must be aware, killed every hope of Hindu-Muslim settlement in the right royal fushion of fascism. The congress does not want any settlement with the Muslims of India. As the chairman of reception committee has said in his address, the congress wants the Muslims to accept settlement as a gift from the majority. The congress is nothing but a Hindu body. That is the congress leaders know it.[১]

এর বছর দুই পরে ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'দ্বিজাতিতত্ত্বে'র থিওরী পেশ করেন জিন্নাহ্, লীগের মুসলমানদের চিন্তায় তখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, এদিকে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঐ লীগ অধিবেশনে গৃহীত হল। এরপর জিন্নাহ্র নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই লীগের মুখ্য আন্দোলন হয়ে দাঁড়াল। লীগ-কংগ্রেস বিরোধ পৌঁছাল চরম পর্যায়ে। দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙক্ষা থেকেই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের স্বপ্নবীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপরেখা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণার সৃষ্টি হয়। বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক (জ. ১৮৭৩ – মৃ. ১৯৬২) কর্তৃক উত্থাপিত ঐ প্রস্তাবে বলা হয় "ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন এলাকা বা ইউনিটগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে চিহ্নিত করিয়া এমনভাবে গঠন করা উচিত যাহাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের ন্যায় যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যায় অধিক সেইগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে একত্রীভূত করা যাইবে এবং তাহাতে অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি হইবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম"।[২]

উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে অঞ্চলগুলি যাতে দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ, আমদানি- রপ্তানি এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য বিষয়সমূহে সর্বক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে সেইভাবে একটি শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট অধিবেশনে কার্যনির্বাহিক কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করে। মূলত এই প্রস্তাবে কনফেডারেশনের ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুইটি পৃথক রাষ্ট্র একটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং অপরটি পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের স্বার্থ সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন দৃষ্টিসম্পন্ন মি. জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের দিল্লী কনভেনশনে সুকৌশলে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে 'স্টেটস'- এর জায়গায় 'স্টেট' করে এককেন্দ্রিক পাকিস্তানের কাঠামো গ্রহণ করেন। সেই কারণে এবং তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহে শেষ পর্যন্ত দু'টি ভূখন্ডকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র — *পাকিস্তান* — জন্ম লাভ করে।

---

১. Select Documents on the History of India and Pakistan Vol. IV Evaluation of India & Pakistan, 1858-1947, Edited by C. H. Phillips and others. London (1962) P. 350-51.

২. বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২, পৃ: ৫১৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর চার দশক জুড়ে ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক পটভূমি মুখ্যত উচ্চশ্রেণী ও উচ্চ মধ্যবিত্তের আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘকাল সহাবস্থানের পরেও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা, ক্ষমতা দখলের কারসাজি, কখনো এদিকে কখনো ওদিকে বৃটিশের উস্কানি। ধরতে গেলে প্রতি বছরই বিভিন্ন স্থানে ঘটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এককথায় বলা যায়, শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার স্বার্থে ব্রিটিশরা যখন যেমন খেলিয়েছে উভয়পক্ষ তেমনি খেলেছে। বিচিত্র এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে এই উপমহাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন যেভাবে নির্বীর্য, বিষাক্ত, অভিশাপগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল তার চমৎকার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের পটভূমিকায় :

"এই কালের হিন্দু-মুসলমান সমাজের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? এদেশের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ়মূল ছিল সেই সময়। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম ছিল তখনো কঠোর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ব্যবধান ছিল যথেষ্টই। হরিজনরা ছিল অন্ত্যজ। বহুবার বহুস্থানে হরিজনরা নিগৃহীত হয়েছেন। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা নিবারণের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজো ভারতে এই ব্যাধি বিদ্যমান। আজও নিম্নশ্রেণী অবহেলিত, উপেক্ষিত।

আর একটি সুবিধাবাদী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল বুর্জোয়া সমাজ। জমিদারী প্রথার কল্যাণে একদিকে যেমন ভূমিহীন দাস সৃষ্টি হচ্ছিল লাখে লাখে, অন্যদিকে তেমনি বিলাস-ব্যসনে মত্ত ছিল জমিদাররা। এদের আয়ের উৎসই ছিল জমিদারী। নিষ্কর্মার মতো অপরকে খাটিয়ে বঞ্চিত করে এরা অর্থের পাহাড় জমা করতো। এই জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে গজিয়ে উঠল নতুন এক ধরনের বড়লোক — শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। মুনাফার বাজার স্ফীত হয়ে উঠলো — এরাও কুক্ষিগত করে নিল ভারতের ধনসম্পদ। আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় জমিদার ও শিল্পপতিশ্রেণী তাদের শোষণ ও শাসন চালালো। এরা, বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ ভৃত্য, শোষণে তাদের সাহায্য করাই এদের স্বধর্ম। অবশ্য এই দলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে ছিল — কারণ এরকম শ্রেণীভিত্তিক সমাজে সেটাই সম্ভব। মুষ্টিমেয় একদল ধনী ও দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ গরীব — খেটে খাওয়া চাষী মজুর। এরাই সাধারণ হিন্দু-মুসলমান। এরাই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ। দরিদ্র, সহায় সম্বলহীন, নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত চালকহীন।

আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে থাকে। তার অধিকাংশ কৃষক। এছাড়া শ্রমিক-মুটে-মজুর এরাই বেশী। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব এদের মধ্য থেকে কোনদিনই আসেনি — এসেছে এক শ্রেণীর উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। এইসব নেতা ওদের মাথায় বারবার কাঁঠাল ভেঙ্গে এসেছেন।

ফলে, যখনই যে দলের প্রয়োজন হয়েছে, জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এর বিচিত্র রূপ। কখনো তা স্বাভাবিক ভাবেই গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে, কখনো সরকারের স্বার্থে বা দলের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করেছে।

দরিদ্র, উপেক্ষিত, অবহেলিত এই আমাদের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। যেখানে সহজেই নানান ধরনের প্রলোভনের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাতিয়ে দেয়া যায় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামে, ব্যবহার করা যায় যথেচ্ছভাবে। হিন্দু-মুসলমানের কথায় আসা যাক। একই দেশে জন্ম, আবহমান কালের পরিচয়। একই আকাশতলে মানুষ। একই পারিপার্শ্বিকতা। মাটি তাদের এক। তবু কত তফাৎ।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে অবস্থার খুব কমই পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ হিসেবে হিন্দু-মুসলমান কি আলাদা ও কারুর কি হাত পা বেশী ছিল? রক্ত কি কারুর হলদে বা নীল? অথচ আশ্চর্য আমাদের মানসিকতা। হিন্দুরা মুসলমানের সঙ্গে একত্র জলপান পর্যন্ত করতো না। আহার, পংক্তিভোজন তো দূরের কথা। মসজিদে মন্দিরে রেষারেষি — ধর্মের আফিম খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে দেয়া — পরস্পরের প্রতি অপরিসীম সংশয়, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, ঈর্ষা। অথচ গরীব হিন্দু, গরীব মুসলমান একই কায়দায় একইভাবে শোষিত হয়, রোগে-শোকে-মহামারীতে ভুগে প্রাণ হারায়, শিক্ষা জোটে না তাদের, জোটে না পরনের বস্ত্র।

এই বঞ্চনার ইতিহাস, এই বঞ্চনার পাহাড় জমেছে ইংরেজ শাসনের সেই আদি যুগ থেকেই। বৃথাই ধর্ম নিয়ে মৌলভীতে ও পণ্ডিতে যুদ্ধ করেছে — আখের গুছিয়ে নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পক্ষপুষ্ট আধা-সামন্ততন্ত্রের জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণী। একালের সমাজ সম্বন্ধে তাই যে যতই বলুক না কেন বড় বড় কথা, যে যতই আদর্শবাদ প্রচার করুক না কেন, তার সপক্ষে ওকালতি করুক না কেন, আসলে এ এক অতি পচনশীল সমাজ ভেঙ্গে পড়ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, মূল্যবোধ দ্রুত অবলুপ্তির পথে, ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, বেকারত্ব, অশিক্ষা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। বার বার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পদধ্বনি, মহামারী, মড়ক। গ্রামের দিকে দৃষ্টি নেই। শশ্মান, শ্রীহীন শহরমুখী ভীড় সেখানেও অস্থিরতা, অব্যবস্থিত-চিত্ততা। দৈন্য, দুর্যোগ খুব প্রকট। সীমাহীন সমস্যা। নানান ত্রুটি ও অসঙ্গতি। এককালে খুব গুণগান করা হতো একান্নবর্তী সমাজের। এখন তা ফেটে চৌচির। মুসলিম সমাজ আরো অনগ্রসর। বহুবিবাহ প্রথা। বহু কুসংস্কার। হিন্দুদেরও কুসংস্কার নানান বাঁধনে বেঁধে রেখেছে।

বস্তুত হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজই ক্ষতদুষ্ট। এর প্রথম এবং প্রধান কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক দুর্যোগ। আমাদের সোনার দেশ। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা দেশ ধীরে ধীরে দিনে দিনে কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শাসনের কালে যা পারে, যতটুকু পারে, যেভাবে পারে, লুটে-পুটে নিয়ে গেছে। এরপরও আধা-সামন্ততন্ত্রের শোষণ। গ্রামীণ অর্থনীতি একেবারে দেউলিয়া। ভাবনার কেউ নেই, কিছু নেই, শিল্পপ্রতিষ্ঠা নগণ্য মাত্র। ব্রিটিশ রাজের শোষণের দিকে লক্ষ্য রেখে পিছিয়ে পড়েছে সমগ্র জাতি। শিল্প বিজ্ঞানে অনগ্রসর। শিল্প বিপ্লবের ঢেউ আছড়ালো না। স্বনির্ভর হবার কোন সুযোগই পেল না। সে সুযোগ দেবেই বা কেন ইংরেজ বেনিয়ারা! দেশের যুবকবৃন্দ কর্মহীন নিরাশ। কোন পরিকল্পনা নেই। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ভূমিকম্প, খরা। গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মত। স্ত্রী পুরুষে অসততা। পুরুষ-প্রধান সমাজ। স্ত্রী স্বাধীনতা অনেক পরে স্বীকৃত। সন্তান ছাড়া অন্য কোন উৎপাদন কাজে লাগে না। মেয়েছেলে জন্মালে অনেক সময় নানা প্রক্রিয়ায় তাকে হত্যা করা হতো। জীবন দুর্বিষহ। সমস্তই অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার পরিণতি। অবিভক্ত বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষের যখন এই রকম রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভগ্নদশা, তখন আমাদের বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, সমগ্র দেশের মানুষ জেগে উঠছে। মানস পটভূমিকায় তার আলোড়ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাতীয় চেতনায় যে উজ্জীবনের ঢেউ এসেছিল, তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্যে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সাহিত্য সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেকখানি পূরণ করেছে। এ সাহিত্য শোষণ, নিপীড়ন, অন্যায়, বঞ্চনা, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করেছে, সমস্ত বন্ধন-শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য সমাজকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। আধুনিক যুগের এই ঐতিহ্য নিয়ে পাকিস্তান আমলের সাহিত্য সাধনা চলে। সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-অনুভূতির

Dhaka University Institutional Repository

তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়কার সাহিত্য মূলত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা; রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে এক অভিনব পরীক্ষা। এর দু'টি অংশ পরস্পর থেকে পনেরশত মাইল বিদেশী এলাকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। শুধু ভৌগোলিক দিক থেকে অবাস্তব নয়, অন্যান্য দিক থেকেও যেমন ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রেও দুই অঞ্চল পরস্পর থেকে পৃথক। একমাত্র ধর্ম ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাদের কোন মৌলিক ঐক্য- বন্ধন ছিলো না। পাকিস্তানের এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সেদিন অনেক রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের দৃষ্টি এড়ায়নি।

নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই দুই অঞ্চলের মধ্যে অসম অর্থনীতি ছাড়াও জাতিগত মানস-প্রকৃতিগত, সংস্কৃতিগত এবং ইতিহাসের স্বতন্ত্র সত্তাগুলি ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। ১৯৪৮ সালে প্রথম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলা ও প্রবঞ্চনা শুরু হয়। "পাকিস্তানের পঁচিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্যটি সুস্পষ্ট হবে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিলো ঔপনিবেশিক এবং সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রবঞ্চনা ও নির্যাতনের ইতিহাস।"

ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বয়ং পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার প্রয়াস পান। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নেই সর্বপ্রথম সংঘাতের সূচনা হয় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু — রাষ্ট্রপ্রধান জিন্নাহ্‌র এই উক্তি ছিল রাজনীতি-প্রসূত। খুব স্বাভাবিকভাবে এই উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় ভাষা-আন্দোলন। বদরুদ্দীন উমর প্রণীত "পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" গ্রন্থে স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ঘোষণাপত্রে বাংলা ভাষাকে যে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে বাংলা ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করবার দাবী করেন তার উল্লেখ আছে। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তান গণ-পরিষদে বাংলা ভাষা ব্যবহার সিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে ভাষার দাবী একটি সুস্পষ্ট আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে"।[১]

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ ঢাকা সফরে আসেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি কোনরকম শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষাকে উপেক্ষা করে জিন্নাহ্ ২১ শে মার্চের জনসভায় এবং ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত ভাষণে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। জিন্নাহর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-প্রতিনিধিদের দিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কারণ বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার এটাই ছিলো প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ছাত্ররা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করে। আন্দোলনের প্রথম স্তরেই "সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক সরকারের কাজে বাংলাভাষাকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী তিন বছর মার্চ মাসে সংগ্রাম পরিষদের ডাকে সারা বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়। ইতোমধ্যে প্রশাসন

---

১. ডক্টর মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ৪র্থ সং, ১৯৯২, পৃ: ৫১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অনেক রদবদল হয়। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহ্‌র মৃত্যু হয়। তার স্থানে গভর্ণর জেনারেল পদে অভিষিক্ত হন উর্দুভাষী বাঙালী খাজা নাজিমউদ্দীন। নাজিমউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল-ব্যক্তিত্বহীন রাজনীতিক। পূর্ব বাংলার স্বার্থের দিকে তার বিশেষ নজর ছিল না।

অতঃপর ১৯৫২ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়কত আলী খান পাকিস্তানের ভাবী সংবিধানের রূপরেখা হিসেবে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। এই রিপোর্ট মূলত পূর্ব বাংলার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমউদ্দীন তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারিতে তিনি ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে এক জনসভায় "উর্দুই হইবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" বলে ঘোষণা করেন। আবার সংগ্রাম শুরু হল নতুন করে — প্রদেশব্যাপী হরতাল, ধর্মঘট ও ছাত্র-বিক্ষোভ। ১১ই ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে প্রস্তুতি দিবস এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী হয়। কিন্তু ২১ তারিখে ঢাকার ছাত্ররা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং প্রতিবাদ মিছিল বের করে। ছাত্ররা গণপরিষদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রর্দশন করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী গুলি চালায়। বহু ছাত্র-জনতা হতাহত হয়। শহীদদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাশের ছাত্র আবুল বরকত এবং সালাম, রফিকসহ সামনে ছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়। পরিষদের অভ্যন্তরে তুমুল বাক-বিতন্ডার মধ্যে মুসলিম লীগ দলের একজন সদস্য দলত্যাগ ও অপরজন সদস্যপদ ত্যাগ করেন। সারা প্রদেশে মাতৃভাষার দাবিতে সর্বত্র গণবিক্ষোভ চলতে থাকে। বহু ছাত্র, শিক্ষক, জননেতা গ্রেফতার হলেন। সর্বত্র ধরপাকড় শুরু হয়। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দাবিতে সেইদিনের বাঙালীর আত্মত্যাগ ছিল যথার্থই অতুলনীয়। শেষ পর্যন্ত সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হলো যে, তারা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন। প্রাদেশিক পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন স্বয়ং বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশের প্রথম গণচেতনার সুসংগঠিত সফল গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তীকালের শাসকচক্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

ইতোমধ্যে ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে মুসলিম লীগ নেতাদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ও সরকারী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালে ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার জন্যে "আওয়ামী মুসলিম লীগ" বা জনগণের মুসলিম লীগ গঠন করেন। বিশিষ্ট যুবনেতা এবং পরবর্তীকালের বাঙালী জাতির জনক ও জাতীয়তাবাদের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান (১৯১৭-১৯৭৫) যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবের যোগ্য নেতৃত্বে এবং ছাত্র-সমাজের সক্রিয় সমর্থনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে এই দল বাঙালীর মধ্যশ্রেণীর সংগ্রামী কণ্ঠস্বররূপে পরিগণিত হয়। অপরদিকে প্রশাসন বিভাগে অসমতা, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সরকার ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে জনমন ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ বাংলাদেশে বিলম্বিত সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে নির্বাচন-যুদ্ধে জয়লাভ কঠিন বিবেচনা করে সরকার-বিরোধী শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতোমধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ.কে.ফজলুল হকের নেতৃত্বে "কৃষক শ্রমিক পার্টি" (K.S.P.) নামে একটি নতুন রাজনীতিক দল গঠিত হয়। ছাত্র-তরুণ এবং প্রগতিবাদীদের দাবিতে একটি সম্মিলিত ঐক্যজোট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাদের দাবির ফলেই ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়। প্রধানত

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে ২১ দফা সংবলিত যুক্তফ্রন্টের যে নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো তাতে তৎকালীন পূর্ববাংলার সমগ্র নির্যাতিত এবং বিভিন্ন সংগ্রামী ও মধ্যশ্রেণীর অধিকার ও প্রয়োজন সংক্রান্ত দাবিকে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে ও হক-সোহ্‌রাওয়ার্দী-ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। বাঙালীর স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাসে এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই নির্বাচনেই পূর্ববঙ্গের জনগণ বাঙালী হিসেবে আপন অস্তিত্বের প্রবল স্বাক্ষর উপস্থিত করল। অপর দিকে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার-চেতনা, স্বাতন্ত্র্য-চেতনা, বঞ্চনা বোধ ও বিদ্রোহের তাগিদ দৃঢ়তর হতে থাকে। নির্বাচনের পর শেরে বাংলার নেতৃত্বে পূর্ববাংলায় যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল অচিরেই নানা অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার তা ভেঙে দিয়ে ৯২-ক ধারা জারী করে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেছিল এবং সারা দেশে চরম নির্যাতন ও সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।

পূর্ব বাংলার জনগণের এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও আপোষহীন মনোভাবের ফলেই ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তাতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'বাংলার' স্বীকৃতি দেয়া হয়। শাসনতন্ত্রে উল্লেখ ছিল, বিশ বছরের প্রস্তুতির পর বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কার্যকর করা হবে। পাকিস্তানবাদী চক্রের কুটিলতার পূর্ব-দৃষ্টান্তের ফলে ছাত্র-জনতা এই শাসনতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতিতে পুরোপরি আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। তাই তারা ক্রমাগত দাবি উঠাতে থাকে অবিলম্বে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার জন্যে।

১৯৫৮ সালে আইয়ুবের সামরিক অভ্যুত্থানের পর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল হয়ে যায়। এই সুযোগে বিভিন্ন মহল থেকে পাকিস্তানবাদী চক্র আবার দাবি উঠাতে থাকে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। এই অবস্থায় এ বিষয়ে নতুন করে আবার বিতর্কের সম্মুখীন হতে সাহস না করে আইয়ুব সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকবে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান যে শাসনতন্ত্র দিয়েছিল, তাতে উল্লেখ ছিল যে, বিশ বছরের প্রস্তুতির পর একটি অভিজ্ঞ কমিটি বাংলা ভাষার প্রবর্তনের বিষয়ে বিবেচনা করবে। পূর্ববাংলার জনগণ এই প্রতিশ্রুতিতেও আস্থা স্থাপন করতে পারেনি।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে পাকিস্তানবাদীরা নানাবিধ কুটিল চক্রান্ত ও অন্তর্ঘাতী উপায়ের আশ্রয় নিয়েছিল। তার একটি হলো বাংলা ভাষার জন্যে আরবী ও রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা। এ সম্পর্কে ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন —

১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ইসলামী আদর্শ ও জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষার জন্যে আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রস্তাবটি প্রথমে প্রকাশ পায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর একটি বক্তৃতায়। সেই সঙ্গেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্ররা প্রতিবাদ করেন। ড. শহীদুল্লাহ বাংলা হরফে উর্দু লেখার একটা বিকল্প প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। এ সত্ত্বেও আরবী হরফে বাংলা শিক্ষাদানের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সরকারী উদ্যোগে হতে থাকে। এই সৎকার্যে সরকার বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সাল ছিল এক্ষেত্রে তাদের সবচাইতে তৎপরতার সময়, তবে আরবী হরফের পক্ষে দু'চার জনের বেশী সমর্থক তাঁরা পাননি; বিরোধিতা হয়েছিল প্রবল। এমন কি পূর্ববাংলা সরকার যে ভাষা সংস্কার কমিটি গঠন করেছিলেন তাঁরাও এর বিরোধিতা করেছিলেন। এর ফলে প্রকাশ্যে আরবী হরফ নিয়ে মাতামাতি করা সম্ভবপর হয়নি সরকারের পক্ষে। তবে সরকার হাল

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে দেননি একেবারে। আরবী হরফে বাংলা লেখার চর্চা করার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠানকে আইয়ুব সরকারের সময়েও অর্থ সাহায্য করা হত।

আইয়ুব সরকার কিন্তু আরবী হরফে অতটা উৎসাহী আর হতে পারেনি। পূর্ববর্তী দশকের প্রয়াস যেভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তার স্মৃতি নিশ্চয় মুছে যায়নি একেবারে। কিন্তু আইয়ুবের সখ হল বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষার জন্যই রোমান হরফ প্রবর্তন করা। শুধু বাংলা হরফের বিলোপ সাধন আর এতদিনে সম্ভবপর ছিল না। বৈজ্ঞানিকতা ও জাতীয় ঐক্যের যুক্তিতে তিনি এই প্রস্তাব আনলেন সম্ভবত ১৯৬২ সালে। কিন্তু এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিলেন। উর্দু ভাষার অধ্যাপক ও লেখকেরাও এতে যোগ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু প্রেমিক অনেকেই আপত্তি জানান এর পরে। ফলে সে চেষ্টাও পরিত্যক্ত হয়।[১]

যদিও বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছিল তবু এর পশ্চাতে আসল উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে রোমান হরফ প্রবর্তনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রসর হয়ে বাংলা ভাষার অগ্রগতিকে রোধ করা।

"পাকিস্তানবাদীরা বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের নামে বাংলা ভাষার অগ্রগতি রোধ করার আর একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পূর্ববাংলার ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের অনেকে সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার সুবিধার্থে বাংলা বর্ণমালার কিছু কিছু সংস্কার সাধনের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই সূত্র ধরে পাকিস্তানবাদী চক্র কিছু সংখ্যক ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীর সাহায্যে বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের নামে বাংলা ভাষার অগ্রগতি রোধের একটা উদ্যোগ নেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের বাধাদান সত্ত্বেও একটি সুপারিশ প্রণয়ন করে তা কার্যকরী করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে পাঠানো হয়। এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের কিছু সদস্যের বাধাদান সত্ত্বেও আত্মবিক্রিত সদস্যেরা তা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর বিরুদ্ধে ভাষা ও সাহিত্যসেবীরা এবং ছাত্রেরা প্রতিবাদ তোলে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত 'লেখক সংঘে'র পূর্বাঞ্চল শাখা প্রতিবাদ জ্ঞাপনে বিশেষ তৎপরতা দেখায়। আইয়ুব-মোনেম সরকারের বিরুদ্ধে তখন দেশব্যাপী অভ্যুত্থানের সূচনা হতে থাকে। তার ফলে এ বিষয়টির গুরুত্ব তখন কম ছিল — ধারণা ছিল যে, সরকারের উৎখাত হলেই এই চেষ্টা বন্ধ হবে। তাছাড়া আইয়ুব-মোনেম সরকারের ভূমিকা তখন এতই নগ্ন ও নির্লজ্জ ছিল যে বিবৃতি দিয়ে কিংবা প্রতিবাদ সভা করে তখন কোনই ফল লাভের আশা ছিল না। সরকারের উৎখাত সাধনই ছিল তখন প্রধান আন্দোলনের বিষয়। অচিরেই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব-মোনেম সরকারের পতনের ফলে বর্ণমালা সংস্কারের প্রশ্ন আর ওঠেনি। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে ১৯৭১ -এর একুশে ফেব্রুয়ারীতে কাগজের ব্যাজে, যানবাহনের গায়ে ও প্রচার-পত্রাদিতে ছাপার অক্ষরে বড় করে লেখা ছিল – 'ঈ' একটি বাংলা অক্ষর। একটি বাঙালীর জীবন।[২]

পাকিস্তানবাদী চক্রের আর এক উদ্যোগ পাকিস্তানে বাংলাভাষার একটা স্বতন্ত্র রূপ সৃষ্টি করা। ১৯৪৯ সালে সরকারী উদ্যোগে "পূর্ববাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হয়।

---

১. Why Bangladesh — by A Group of Scholars in Viena, Bangladesh Documents, পৃ: ১৬।
২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তিসংগ্রাম (আদি পর্ব) ঢা. বি., ১৯৭২, পৃ: ১৪

Dhaka University Institutional Repository

এই কমিটি সংস্কৃত প্রভাব পরিহার করে আরবী-ফারসী ও আঞ্চলিক মূলের শব্দ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করার সুপারিশ করে। শাসকচক্রের সহযোগী কিছু সংখ্যক বাঙালী লেখক ও কবি বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগে অগ্রসর হয়। তাছাড়া এই লেখকদের অনেকে বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষাকে নিয়ে একটা স্বতন্ত্র ষ্ট্যান্ডার্ড বাংলা ভাষা দাঁড় করাবার চেষ্টা করে। পাকিস্তানে বাংলা ভাষার একটা ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করার এই উদ্যোগের পেছনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো সাম্প্রদায়িক মনোভাব"।[১]

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ্ সাহেব ঢাকায় এসে রমনার রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন — "আমরা বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী, পাঠান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। ইউনিট হিসেবে সেগুলির অবশ্য একটা অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি — চৌদ্দ শ বছর পূর্বে আমাদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল আমরা কি তা ভুলে গেছি? আমার মতো আপনারা সকলেই এখানে বহিরাগত। বাংলাদেশের আদি অধিবাসী কারা? যারা এখন এদেশে বাস করছে তারা নয়। কাজেই আমরা বাঙালী বা সিন্ধী বা পাঠান বা পাঞ্জাবী এ-কথা বলার প্রয়োজন কি। না, আসলে আমরা সকলেই হলাম মুসলমান।"[২]

বাঙালী মুসলমানরা একদা যে বাংলাদেশেরই বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী অধিবাসীদের থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল — এই সত্যকে জিন্নাহ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য জিন্নাহর বক্তব্যের বিপরীত। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের যুগে আরব-ইরান থেকে যেসব ধর্মপ্রচারক এসেছিলেন সেসবের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য, আর বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্য থেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে ব্যাপকভাবে লোকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর মুসলমান সব সময়েই এক বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। জিন্নাহ সাহেব এবং অন্যান্য পাকিস্তানবাদী নেতারা ছিলেন এই জাতীয় মানসিকতার লোক। তাই জিন্নাহ বলতে পেরেছেন — "আমার মত আপনারা সকলেই এখানে বহিরাগত।" পাকিস্তানের শাসকচক্রের ও গোঁড়া পাকিস্তানবাদীদের মানসিকতা সব সময়ই ছিল এই জাতীয়। এরা সব সময়ই বাংলাদেশের ও বাঙালী জাতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে অস্বীকার করে একটা স্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান করেছে। প্রকৃতপক্ষে এদের স্বদেশ কোথায় তা এক অনুসন্ধানের বিষয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকচক্রের সঙ্গে যোগসাজশে এই শ্রেণীর লোকেরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে বসে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু-ঐতিহ্য ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সম্পর্কশীল সকল বিষয়কে এরা অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করে এবং তা বর্জন করার আয়োজন করে। সেই অনুযায়ী তারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সকল পর্যায়ের পাঠ্য-তালিকা, বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকার নীতি প্রণয়নের চেষ্টা করে। এর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ, শিক্ষকমন্ডলী ও কবি-সাহিত্যিকরা প্রতিবাদ করেন। তবুও তারা সরকারী শক্তির বলে তাদের নীতি বহু ক্ষেত্রে কার্যকরী করে।

দেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও তারা এই বিকৃত মনোভাবের পরিচয় দেয়। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে তারা ছাত্রদের মস্তিষ্ক ধোলাই করার চেষ্টা করে। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়। ছাত্র-

---

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তিসংগ্রাম (আদি পর্ব) ঢা. বি., ১৯৭২, পৃ: ১৪

২. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খন্ড, প্রথম সং- পৃ:১০৪

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িক মনোভাবজাত সিলেবাসের বিলুপ্তি সাধন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর ইয়াহিয়া খানের সশস্ত্র সামরিক আক্রমণের মাত্র কিছুকাল আগে "পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি" নামক একটি স্কুলপাঠ্য বইয়ের বিরুদ্ধে বিরাট ছাত্র-আন্দোলন হয়। এই বইয়ের বিরুদ্ধে সেদিন যে আন্দোলন হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানবাদের বিরোধিতা। এর মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদেরও একধাপ অগ্রগতি হয়।

বস্তুত ভাষা-আন্দোলনের সময়েই তথাকথিত পাকিস্তানী সংস্কৃতির প্রতি পূর্ববাংলার শিক্ষিত জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব পরিপক্বতা লাভ করে এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বেড়ে যেতে থাকে। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্য, মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের সাহিত্য, নববর্ষ ও ঋতু- উৎসব উদযাপন ইত্যাদির প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রভাবেও হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর সময় আইয়ুব সরকার বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে যাতে পূর্ববাংলায় তা পালিত না হয়। পাকিস্তানবাদীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে বহু আক্রমণাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারের এ নীতির প্রতিক্রিয়ায় প্রায় একটি বিরাট গণ-আন্দোলনের উত্তেজনা নিয়ে পূর্ববাংলার শিক্ষিত জনগণ শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপন করে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষের সময় আইয়ুব সরকার ঘটনার বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করে। পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশকে সরকার তখন ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়। সংঘর্ষের পর আইয়ুব সরকার এক ঘোষণায় ভারত থেকে পুস্তক আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয় এবং মোনেম-সরকার এক অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ করে দেয়। এ ফলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের সঙ্গে পূর্ববাংলার জনগণের সংযোগ ব্যাহত হয়। এই সরকারী নীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা ও শিক্ষিত সমাজ জোর আন্দোলন করে। কিন্তু সরকার তা গ্রাহ্য করেনি। এই সময় ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক সাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-দীনবন্ধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী পূর্ববাংলায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তা ছাড়া আরও আধুনিক পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকদের রচনারও বহু ফুটপাত-সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১]

জনগণের দাবির ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার অবশ্য সংঘর্ষের পরে পুনরায় শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালে জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন ঘোষণা করেন যে, জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার করা হবে না। ১৯৬৭ সালের ২৪শে জুনে দৈনিক পাকিস্তানের তৃতীয় পৃষ্ঠায় "রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার করা হবে না"– এই শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। খবরে বলা হয়েছিল, "কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেয়া হবে"। রাজশাহী থেকে

---

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম (১ম পর্ব), ঢা. বি., পৃ: ১৭

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব মুজিবর রহমান চৌধুরীর এক অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে খাজা শাহাবুদ্দীন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।[১]

এর পরদিনই অর্থাৎ ২৫শে জুন ১৯৬৭, দৈনিক পাকিস্তানের প্রথম পৃষ্ঠায় "রবীন্দ্রসঙ্গীত –১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি"এই শিরোনামে নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় :

স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৪শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।[২]

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ড. কাজী মোতাহার হোসেনসহ দেশের প্রগতিশীল লেখক ও বুদ্ধিজীবী। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই এই বিবৃতির রচয়িতা ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। বিবৃতিটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে খাজা শাহাবুদ্দীনের ঘোষণা ও সরকারী নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়, বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা হতে থাকে — গণমিছিলও বের হয় ঢাকা শহরে। কিন্তু এসবের খবর সংবাদপত্রে আর প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত তখন সংবাদপত্রের উপর খবর ছাপা সম্পর্কে যেভাবে গোপন নির্দেশ দেয়া হতো, সেভাবেই কোন গোপন নির্দেশ দিয়ে এই সব সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তবে এর পরপরই সরকারী নীতির সমর্থনে আরো দু'টি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল এবং জাতীয় পরিষদে এ-ব্যাপারে আরো অনেক আলোচনা হয়েছিল। দু'টি বিবৃতিই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ২৯শে জুন।

৪০ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতিতে সরকারী নীতি সমর্থন করে বলা হয় :

"পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে ঘোষিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উক্তির প্রতিবাদ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে, এই উক্তি স্বীকার করে নিলে পাকিস্তানী ও ভারতীয় সংস্কৃতি যে এক এবং অবিচ্ছেদ্য, একথাই মেনে নেয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি — যে সংস্কৃতির মূল কথা হলো : 'শক হুন দল পাঠান মোঘল এক দেহে হল লীন।' এবং যে-সংস্কৃতি এই উপ-মহাদেশের মুসলমানদের অভিহিত করে 'হিন্দু-মুসলমান' বলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁর এক প্রবন্ধে এই উপ-মহাদেশের মুসলমানদের 'হিন্দু-মুসলমান' বলে অভিহিত করেন।

---

১. দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে জুন, ১৯৬৭
২. দৈনিক পাকিস্তান, ২৯শে জুন, ১৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধারণা এর সাথে পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক ধারণার আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এবং বলা যেতে পারে একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। এই কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতির বিরোধী বলেও মনে করি।"

পাকিস্তানবাদী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক বাঙালী বুদ্ধিজীবীও সব সময়েই সহযোগিতা করেছে। আর সরকার বুদ্ধিজীবীদের কিনে নেয়ার জন্য অত্যন্ত ধূর্ত কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সরকারী তথ্য বিভাগ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পাকিস্তান কাউন্সিল, নজরুল একাডেমী ও আরও অনেক সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার লেখকদের বিপথগামী করার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করেছে।[১]

গণ-আন্দোলনের ভয়ে খাজা শাহাবুদ্দীন ৪ঠা জুলাই তারিখে জাতীয় পরিষদে বলেন, সংবাদপত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের ভুল বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকারান্তরে এই রকম একটা কৌশল অবলম্বন করে সেদিন সরকারকে বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।[২]

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনসমূহকে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো সবসময়ই সহযোগিতা করেছে। তার ফলে ভাষা-আন্দোলনের সময় যে আন্দোলন আপাত দৃষ্টিতে ছিল মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন, দুই দশক পরে এটি পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

ভাষা-আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে "পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি" নামক কুলপাঠ্য বই-বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনই ছিল বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার এক নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন। আর এই আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ পাকিস্তানবাদী সাম্প্রদায়িক চক্রের পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু দানের অপচেষ্টারই ফল। এতে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব কাল দীর্ঘ না হয়ে বরং হ্রস্বই হয়েছে। স্বাভাবিক পথ ধরে অগ্রসর হলে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণতির জন্য আরো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো, তা পরিণতিতে পৌঁছে গেছে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পূর্ববাংলার মুক্তি-আন্দোলনে অর্থনৈতিক বঞ্চনার বোধই সবচেয়ে বড় উত্তেজক হিসেবে কাজ করেছে। একথা খুবই যথার্থ যে "এই প্রবঞ্চনার সত্যটি যখন উদঘাটিত হলো, তখন অন্য কোন লাভের আফিম খাইয়ে বাঙালীকে আর ঘুম পাড়িয়ে রাখা গেল না। অর্থের প্রশ্নটি যখন সামনে এসে দাঁড়ালো, ধর্মের বাঁধন তখন গেল টুঁটে, এক জাতি, এক প্রাণ, একতার মোহটাকে ভেঙে নব জাতীয়তার মোক্ষ সন্ধান করল বাঙালী। উদ্দীপ্ত হল বাঙলার মুক্তি-আন্দোলন।[৩]

১৯৪৭ সালে কারাচীতে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপিত হয়। এর উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয় ২০০ কোটি টাকা। পরে আইয়ুব খান রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ইসলামাবাদে এবং এর

---

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম (১ম পর্ব), ঢা. বি., পৃ: ২৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ: ২২
৩. মতিলাল পাল, বাংলাদেশ : অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত, পৃ: ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের জন্য খরচ হয় ২০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী বলে খ্যাত ঢাকার উন্নয়নের জন্য খরচ হয় মাত্র ২ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কার্যালয়, দেশরক্ষা সদর দফতর ও শিক্ষায়তন, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা, ন্যাশনাল ব্যাংক, বীমা, করপোরেশনসমূহ, বৈদেশিক দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইত্যাদির ন্যায় সকল সরকারী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কেন্দ্রগুলি অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে এক অংশের উপর অপর অংশ সুপরিকল্পিতভাবে প্রভুত্ব করে আসছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৭ - ৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮ - '৬৯ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের খতিয়ানে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানী স্কুল বয়সী ছাত্রসংখ্যা কিছুটা বেশি ও এক সচেতন নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। অথচ উপরোক্ত একই সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে শিশুদের স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৫০ ভাগ। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ সেই ক্ষেত্রে ২০ বছরে ছাত্র-সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে বেড়েছে পাঁচ গুণ আর পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়েছে ত্রিশগুণ।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিক পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে নেমে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পনেরো বছর পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব ঘাটতি ৬০ কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত হয় ৩৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি ও অর্থনীতিক পরিকল্পনাই প্রধানত এর জন্য দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের সুপরিকল্পিত নীতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। ফলে এ অঞ্চলের অর্থনীতিক উন্নয়নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যাপারে কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩টি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। কলম্বো প্ল্যান, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, কমনওয়েলথ সাহায্য ইত্যাদির অধীনে বিদেশে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য যেই সব বৃত্তি দেয়া হয় তার অধিকাংশ গিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে।

বেসামরিক, সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরি ও নিয়োগের ব্যাপারে এই বৈষম্য যে আরো ব্যাপক ছিল নিম্নের তালিকা থেকে তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য :

		প. পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
১.	কেন্দ্রীয় বেসামরিক চাকুরি	৮৪%	১৬%
২.	বৈদেশিক চাকুরি	৮৫%	১৫%
৩.	স্থল বাহিনী	৯৫%	৫%
৪.	নৌবাহিনী (কারিগরি)	৮১%	১৯%
৫.	নৌবাহিনী (অকারিগরি)	৯১%	৯%
৬.	বিমানবাহিনীর বৈমানিক	৯১%	৯%
৭.	সশস্ত্র বাহিনী (সংখ্যায়)	৫০.০০০	২০,০০
৮.	পাকিস্তান এয়ার লাইনস্ (সংখ্যায়)	৭,০০০	২৮০

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ-কল্যাণের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা উন্নততর ছিল না :

		প. পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
১.	জনসংখ্যা	৫ কোটি ৫০ লক্ষ	৭ কোটি ৫০ লক্ষ
২.	ডাক্তারের সংখ্যা	১২,৪০০	৭,৬০০
৩.	হাসপাতাল বেড সংখ্যা	১৬,০০০	৬,০০০
৪.	পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩২৫	৮৮
৫.	শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১	৫২

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের হিসেব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যাদি ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। আর পাকিস্তান সরকার সব সময়ই প্রকৃত তথ্য চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। তবু যতদূর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সূত্র থেকে আইয়ুব শাসনে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যের যে চিত্র উদঘাটিত হয়েছে তার নমুনা নিম্নরূপ :

উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ[১]

বিষয়	প. পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা	৮০%	২০%
বৈদেশিক সাহায্য (মার্কিন সাহায্য ছাড়া)	৯৬%	৪%
মার্কিন সাহায্য	৬৫%	৩৫%
পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন	৫৮%	৪২%
পাকিস্তান শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন	৮০%	২০%
শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক	৭৬%	২৪%
গৃহ নির্মাণ	৮৮%	১২%

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অংশের তুলনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ করবার তথ্যটি নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়। অর্থনৈতিক এবং আর্থিক নীতিগুলি এমনভাবে প্রণয়ন হতো যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পোন্নত করা যায়। এক পরিসংখ্যানের হিসেবে জানা যায়, ১৯৪৮-৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প-পণ্যের জন্য একটি অধীন ও স্থায়ী বাজার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

দুই অঞ্চলের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্যের মধ্যে এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রক্রিয়া প্রকাশ পায়। ১৯৫৯ - ৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ছিল শতকরা ৩২ ভাগ। দশ বৎসর পর ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ৬১ ভাগ বেশি। আইয়ুব-শাসনের এই উন্নয়ন দশক স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানীদের

---

১. ডক্টর মু. আ. রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪র্থ সং, ১৯৯২, পৃ: ৫৫০

Dhaka University Institutional Repository

কাছে করুণ উপহাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই উন্নয়ন দশকের উৎসব আইয়ুবের পক্ষে মারাত্মক পরিণতির সূচনা করে। উন্নয়ন দশকের এই প্রবঞ্চনার সত্যটি প্রকাশিত হবার পর পূর্ব পাকিস্তানীদের ঘুম ভাঙে। তারা তখন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন ছেড়ে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়। আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলন শুরু হলে মওলানা ভাসানী এই আন্দোলনে শরীক হন। তিনি আইয়ুব সরকারের বিরোধিতা করা জনগণের নৈতিক কর্তব্য বলে মত প্রকাশ করেন। যেহেতু সরকার জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়েছে সেইজন্যে তিনি আইয়ুব খানের পদত্যাগ দাবি করেন। তিনি সরকারকে পূর্ব বাংলার সার্বজনীন দাবি স্বায়ত্তশাসনসহ রাজবন্দীদের মুক্তি, সংবাদপত্রের জরুরি আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। দেশের বুদ্ধিজীবীরাও সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করে এবং জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে।[১]

১৯৬৮ এর ১৮ই নভেম্বর ছাত্ররা প্রদেশব্যাপী প্রতীক প্রতিবাদ দিবস পালন করে। ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সেখানে আইয়ুবের সুদীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনমত ও তরুণ সমাজ বিক্ষুব্ধ ছিল। আন্দোলনের নেতা ছিলেন আইয়ুব কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের যুব শক্তিকে সংহত করে আইয়ুব বিরোধী "পিপলস পার্টি" গঠন করেন। ভুট্টোকে গ্রেফতার ও তার সভা-মিছিলের উপর গুলি বর্ষণের ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতাও বিক্ষুব্ধ হয়। তারা ১৯শে নভেম্বর বিক্ষোভ মিছিল করে। এই সময় সর্বদলীয় ছাত্র সমাজ আইয়ুব সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য সকল বিরোধী রাজনীতিক দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানায়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এই ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দেয়। তারা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি নামে একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে। ক্রমে এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু এই গণ-আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এই ফ্রন্টের ছিল না। মওলানা ভাসানী এই সময় পল্টনের এক জনসভায় শাসক গোষ্ঠিকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তারা যেন "লাহোর প্রস্তাবের" প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বীকার করে। এই দাবির প্রতি উপেক্ষা প্রর্দশন চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠন করবে।

৭ই ডিসেম্বর রিক্সাচালকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হয়। হরতাল পালনকারীদের উপর সরকার নির্মমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে মওলানা ভাসানীর আহ্বানে পুনরায় হরতাল পালন করা হয়। এই সময় মওলানা ভাসানী অত্যাচারী গর্ভনর মোনেম খানের বিরুদ্ধে জনগণকে ঘেরাও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। সর্বত্র ঘেরাও আন্দোলন শুরু হয় এবং সামরিক আইন জারীর পূর্ব পর্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলন চলতে থাকে। ১৩ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের যৌথ উদ্যোগে দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়। সারা ডিসেম্বর মাস প্রদেশব্যাপী মিছিল, প্রতিবাদ ও হরতাল চলতে থাকে।

ইতোমধ্যে আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ ৮-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন ((Democartic Action Committee — সংক্ষেপে 'ডাক') এই সংগ্রাম পরিষদ দেশের

---

১. ড. মু. আ. রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ: ৫৫১

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দু'টি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্যে এই সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফার সঙ্গে আওয়ামী লীগের ৬-দফা সম্মিলিত হয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তি সনদরূপে পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে।

এই ১১-দফার দাবিতে ১৮ই জানুয়ারি থেকে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। এই দিকে পুলিশী নির্যাতনও পূর্ণ মাত্রায় চলতে থাকে ২০শে জানুয়ারি ছাত্র-বিক্ষোভের তৃতীয় দিনে। ঐ দিন ঢাকার ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের জুলুম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ছাত্রদের এক মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হন। ক্রমান্বয়ে এই ছাত্র-আন্দোলন একটি গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এই সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়। এই গণ-বিক্ষোভ দমন করার জন্য শাসকশ্রেণী বিভিন্ন স্থানে গুলি চালিয়ে জনগণের এই দুর্বার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে আইয়ুব বাধ্য হয়ে ফেব্রুয়ারিতে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। তিনি 'ডাকের' নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমস্যা আলোচনার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তখনও আগরতলা মামলায় আটক। সুতরাং তাঁকে ছাড়া আলোচনা-বৈঠক নিরর্থক। এই দিকে মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। শেখ মুজিব প্যারোলে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন। ইতোমধ্যে গণ-আন্দোলন আরও তীব্র হয়। আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ই ফেব্রুয়ারি বন্দী-অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে হত্যা করা হয়। সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়ে যায়। জনতা সেইদিন এতই ক্ষিপ্ত হয় যে, তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র প্রধান বিচারকের বাড়িসহ কয়েকজন মন্ত্রীর বাড়ি, গাড়ি ও গণস্বার্থ বিরোধী পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়। পরদিন খবর পাওয়া যায় যে, সৈন্যরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ও রসায়ণ বিভাগের রীডার ড. শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তিনি তখন বিক্ষোভকারী ছাত্রদেরকে শান্ত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই সংবাদে সারা দেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। অবস্থা আয়ত্তে আনা ও জনগণকে শান্ত করার জন্য তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। গণদাবিতে প্রথমে তিনি পূর্ব বাংলার ধিকৃত গভর্ণর মোনেম খানকে বরখাস্ত করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ড. এম. এন. হুদাকে তাঁর জায়গায় নিয়োগ করেন। শীঘ্রই তিনি দেশের জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অতঃপর জনগণের রোষ হ্রাস করার জন্য ২১ শে ফেব্রয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা করেন যে, তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিবকে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র পক্ষ থেকে রমনার রেসকোর্স ময়দানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি এক গণ-সংবর্ধনা দেয়া হয়। 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় শেখ মুজিবকে বংলার নিপীড়িত জনগণের জন্য তাঁর ত্যাগ ও ভালাবাসার নির্দশনস্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতায়

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকে তিনি অংশগ্রহণ করে দেশবাসীর অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবেন। ছাত্রদের ১১-দফা ও আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে তিনি সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। যদি তাঁর উত্থাপিত দাবি অগ্রাহ্য হয় তা হলে তিনি দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সকল আলোচনা ব্যর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে গণঐক্য ফ্রন্টও ভেঙে যায়। ইতোমধ্যে গণ-আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অরাজনৈতিক কার্যকলাপ ও হত্যাকান্ড শুরু হয়। আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার শরণাপন্ন হন। ২৫শে মার্চ তিনি সমস্ত ক্ষমতা ইয়াহিয়া খানের নিকট হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ রাতে সারাদেশে দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক আইন জারী করেন। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ও জাতীয় পরিষদ বাতিল ঘোষিত হয়। তৎসঙ্গে দীর্ঘ দশ বৎসরের একনায়কত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১] ২৬শে মার্চ প্রধান সামরিক প্রশাসক ইয়াহিয়া খান অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁর ঘোষণায় বলেন : "দেশের রাজনীতিক ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে অনতিকালের মধ্যে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের দ্বারা গণ-সমর্থিত একটি সরকার গঠন করা যায়। জনগণ-ইয়াহিয়ার বক্তব্যকে সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করে।"[২] আওয়ামী লীগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২৮শে নভেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৯৭০ সালের অক্টোবরে সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে গণ-পরিষদ গঠিত হবে। ইতোমধ্যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে 'এক ইউনিট' বাতিল ঘোষণা করেন এবং প্রদেশগুলিকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৭০ সালের প্রথম থেকে তিনি দেশে রাজনীতিক কার্যকলাপ বিধি ঘোষণা করেন ও মার্চ মাসের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নূতন শাসনতন্ত্রের মূলনীতি রচনা পদ্ধতি 'লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' (এল. এফ. ও) ঘোষণা করেন। নির্বাচিত গণ-পরিষদের উপর আদেশ থাকে যে, অধিবেশনে বসার ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনার কাজ শেষ করতে হবে এবং এতে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিতে হবে। অন্যথায় সংবিধান শুদ্ধ হবে না এবং নব নির্বাচিত গণ-পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে এবং দেশে সামরিক শাসন বলবৎ থাকবে। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ নেতাই এল. এফ. ও-র অগণতান্ত্রিক ও বাধ্যতামূলক এই বিধি সম্বন্ধে আপত্তি করেন। তারা নির্বাচিত গণ-পরিষদের সার্বভৌমত্বের দাবি করেন।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তাঁদের ৬-দফার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন। ঐতিহাসিক ছয় দফার রূপরেখা ছিলো নিম্নরূপ :

পাকিস্তান হবে একটি যৌথ রাষ্ট্র এবং ছয় দফা ফর্মুলার ভিত্তিতে এই যৌথ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

---

১ ডঃ মু. আ. রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ: ৫৫৫

২ ঐ, পৃ: ৫৫৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দফা :

সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে যৌথরাষ্ট্রীয় ও পারিষদিক পদ্ধতির; তাতে যৌথরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন জনসংখ্যার ভিত্তিতে হবে।

দ্বিতীয় দফা :

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় এবং তৃতীয় দফায় ব্যবস্থিত শর্তসাপেক্ষ বিষয়।

তৃতীয় দফা :

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি পৃথক মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময় করা চলবে। অথবা এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটিমাত্র মুদ্রা চালু থাকতে পারে এই শর্তে যে, একটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে; যার অধীনে দুই অঞ্চলে দু'টি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তাতে এমন বিধান থাকতে হবে যেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর কিংবা মূলধন পাচার হতে না পারে।

চতুর্থ দফা :

রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের যোগান দেয়া হবে। শাসনতন্ত্রে নির্দেশিত বিধানের ফলে রাজস্বের এই নির্ধারিত অংশ স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা হয়ে যাবে। এহেন শাসনতান্ত্রিক বিধানে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারটি এমন একটি লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে যেন রাজস্বনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে থাকে।

পঞ্চম দফা :

যৌথরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে সেই অঙ্গরাজ্যের সরকার যাতে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে তার পৃথক হিসেব রাখতে পারে শাসনতন্ত্রে সেরূপ বিধান থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে, শাসনতন্ত্রে নির্দেশিত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে তা আদায় করা হবে। শাসনতন্ত্রের বিধানুযায়ী দেশের বৈদেশিক নীতির কাঠামোর মধ্যে, তার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে থাকতে হবে।

ষষ্ঠ দফা :

ফলপ্রসূভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে মিলিশিয়া কিংবা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ উপর্যুক্ত ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফার ভিত্তিতে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে তাঁরা কোন নির্বাচনী জোট গঠনে উৎসাহ দেখাননি। নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের ভেতরে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। অন্যান্য দল, বিশেষত মস্কোপন্থী ন্যাপ, আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্যফ্রন্ট গঠনে বিশেষ আগ্রহী ছিল। কিন্তু ভাসানী পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে প্রথম থেকে নির্বাচন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সপক্ষে রায় দেয়। ইতোমধ্যে দক্ষিণপন্থী দলগুলি একত্রিত হয়ে 'ইসলামপছন্দ' নির্বাচনী ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে।

৫ই অক্টোবর নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। ইতোমধ্যে দেশে বন্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় অক্টোবরে নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর সরকার নির্বাচনের নতুন তারিখ স্থির করেন ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের। এল.এফ.ও-র মূলনীতির সঙ্গে আওয়ামী লীগের ৬-দফার বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক দলগুলি আওয়ামী লীগের প্রচারকার্যে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি, কারণ তাদের ধারণা ছিল আওয়ামী লীগ কোনো অবস্থাতেই পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না। তাদের ধারণা ছিল যে, বিভিন্ন পার্টি কিছু কিছু আসন লাভ করবে, যার ফলে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কার্যকর হবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানী দলগুলির ইচ্ছানুযায়ী শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ থাকবে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আগেই ১২ই নভেম্বর রাতে পূর্ববাংলার সমুদ্র-উপকূলে মানবেতিহাসের বৃহত্তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এই ভয়াবহ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আনুমানিক দশ পনের লক্ষ লোকের সলিল সমাধি হয়। তৎসঙ্গে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিরও ক্ষতি সাধিত হয়। আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার জনসাধারণকে রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজনীয় সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উদ্যোগ নেয়নি। প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে তার বিলি-ব্যবস্থার মতো মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান সরকারের ঔদাসীন্য, অবিশ্বাস্য নিষ্ক্রিয়তা ও সদিচ্ছার অভাবের ফলে পূর্ববাংলার জনগণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, পাকিস্তানী শাসক ও শোষক শ্রেণী পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনের কোন মূল্য দেয় না। তারা এই দেশকে 'কলোনী' হিসেবেই গণ্য করে। সুতরাং পাকিস্তানের দুই অংশ কোন অবস্থাতেই এক থাকতে পারে না। তাদের ধর্ম-ভিত্তিক একজাতিতত্ত্বের ফক্কা গেরো একেবারে শিথিল হয়ে গেল। সেইজন্য ১২ই নভেম্বর আমাদের জাতীয় ইতিহাসের আত্মচেতনা ও আত্মোপলব্ধিতে বাঙালী মানসে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো।[১]

দেশের এই ভয়ানক পরিস্থিতির কারণে আসন্ন নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য কোন কোন দলের পক্ষ থেকে দাবি উঠলেও আওয়ামী লীগ আর এক মুহূর্তের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক শ্রেণীকে বরদাস্ত করতে রাজি হলো না। অবশেষে ৭ই ডিসেম্বর বহুদিনের প্রতীক্ষিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সারা বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে । জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন তারা লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদেও নির্বাচকমন্ডলী এই দল সম্পর্কে অনুরূপ রায় দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে জয়লাভ করলো ভুট্টোর পিপলস পার্টি। তারা ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসনে জয়যুক্ত হয়। দুটি দলই আঞ্চলিক প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভ করে। ভুট্টো নিজেকে সারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি বলে

---

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ: ৫৫৭

Dhaka University Institutional Repository

দাবি করে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তার দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে অস্বীকার করে আওয়ামী লীগ-এর দাবি সংশোধন না করলে তিনি জাতীয় পরিষদ বর্জন করবেন বলে ঔদ্ধত্য ও ভয় দেখান। এদিকে শেখ মুজিব ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে অটল রইলেন, কারণ জনগণ তাকে ৬-দফা কর্মসূচীর সপক্ষে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন। ইতোমধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর দীর্ঘ আলোচনা হয়। সম্ভবত সেইখানে চক্রান্তের নীলনক্সা প্রস্তুত হয়। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক হয়। বৈঠকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে ১৪ই জানুয়ারি ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বলে অভিহিত করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। কিন্তু জাতীয় পরিষদের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে তিনি অসম্মত হন। অতঃপর অনেক টালবাহানার পর ১৩ই ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এর পরই ইয়াহিয়া -ভুট্টোর একাধিক গোপন বৈঠক ও ভোজ শুরু হয়। এদিকে লাহোরে ভারতীয় বিমান 'গঙ্গা' হাইজ্যাক ও ঢাকায় পরিকল্পনা অনুসারে সরকারী ও আধা সরকারী অফিসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, এতে অজুহাত দেখানো সহজ হয় যে, দেশের পরিস্থিতি সঙ্কটময় এবং ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার মতো পরিবেশ নেই। ইতোমধ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ভুট্টোর দাবি অনুযায়ী পরদিন ১লা মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকবে।

ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৬৯ সালের মতো গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়। ঢাকা মহানগরী মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। এইবার স্বাধিকার বা সমঝোতা নয়, স্বাধীনতার সংগ্রাম। শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ইয়াহিয়া খানের একতরফা হঠকারি ঘোষণার তীব্র নিন্দা করেন। সেইদিন তিনি জনগণকে নতুন কর্মসূচী দিলেন। ২রা ও ৩রা মার্চ হরতাল। ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। এই ঐতিহাসিক জনসভায় শেখ মুজিব জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। শেখ মুজিবের হরতালকে নস্যাৎ করার জন্য সামরিক প্রশাসক শহরে কারফিউ জারি করে। কিন্তু উত্তেজিত জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে। সামরিক বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। বহুলোক হতাহত হয়। ঐদিন (২রা মার্চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে এক বিরাট ছাত্রসভা হয়। এই সভাতেই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভাতেই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ান হয়।[১]

সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপ আদেশ জারি হয়। ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনগণকে এক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সেইদিনই ইয়াহিয়া খান ১০ই মার্চ শাসনতান্ত্রিক সংকট ও অচল অবস্থা নিরসনের জন্য ঢাকায় এক নেতৃসম্মেলন আহ্বান করেন। পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগপ্রধান ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে বলেন, "আমরা গণ-হত্যাকারীদের সঙ্গে বসতে চাই না। তিনি সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। অতঃপর ৬ই মার্চ ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। ঐদিন লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার নতুন গভর্ণর নিযুক্ত করা

---

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ: ৫৫৯

Dhaka University Institutional Repository

হয়। কিন্তু হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তার শপথ গ্রহণ পরিচালনায় অস্বীকৃতি জানালে গভর্নর পদ শূন্য থাকে। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলার জনগণকে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৫ই মার্চ শেখ মুজিব বাংলাদেশে অসামরিক প্রশাসন চালু করবার জন্য ৩৫টি বিধি জারি করেন। ঐদিন ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১০ দিন ধরে আলোচনার নামে চলে কালক্ষেপণ ও প্রহসন। ভুট্টো এই ষড়যন্ত্রে শরিক হন। বলা বাহুল্য, এই সময় সামরিক বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অতঃপর প্রস্তুতি পর্ব সমাধা হবার পর ২৫শে মার্চ রাত্রে ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং মধ্যরাত্রি থেকে শুরু হয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্মম ও জঘন্য গণহত্যা অভিযান, এই হত্যাভিযানের প্রধান শিকার হয় ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, বাঙালী পুলিশ ও ইপিআর। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে আওয়ামী লীগকে 'নিষিদ্ধ' ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিযুক্ত করেন। অতঃপর ২৫ শে মার্চ থেকে পরবর্তী নয় মাস স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামের ইতিহাস স্বাধীনতার সপক্ষে চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক গৌরবদীপ্ত ইতিহাস।

২৬শে মার্চ স্বাধীনতাকামী বাঙালী জাতি সকল নির্যাতন ও শৃঙ্খল-বন্ধন চূড়ান্তভাবে ছিন্ন করার সংকল্প নিয়ে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে আটক রাখা হলো। সারা বাংলাদেশে প্রতিরোধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার হয়ে ওঠে। ১৭ই এপ্রিল মুক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের আম্রবাগানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত হয় এবং মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এরপর গণযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত সর্বাত্মক সমর্থন ও সাহায্য দেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন বাঙালীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করে এবং পাকিস্তান সরকারকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার রাজনীতিক সমাধানের জন্য চাপ দেয়। বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানী বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় এবং প্রায় এক কোটি লোক উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়।

বিশ্ববিবেক এই জঘন্য গণহত্যার তীব্র নিন্দা করে। ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে পাকিস্তানী হত্যাযজ্ঞ আর মুক্তিবাহিনীর তীব্র প্রতিরোধ ও সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে সম্মিলিত কমান্ড বা 'মিত্র বাহিনী' গঠিত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকিস্তান আত্মসমর্পন করে। বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম নতুন রাষ্ট্র — বাংলাদেশ।

সাহিত্য-প্রয়াস

শিল্প-সাহিত্যের যে কোন ধারার বিকাশের সঙ্গে সামাজিক রূপান্তরের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই হোক না কেন রাজনৈতিক-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ একে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বিভাগোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও এটি লক্ষণীয়। দেশকাল নির্বিশেষে যে কোন কবি-চৈতন্য বিশেষ এক সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অনুশাসনকে মেনে নিয়ে অথবা রূপান্তরিত করে গড়ে তোলে তার নিজস্ব চেতনালোক।

Dhaka University Institutional Repository

সাতচল্লিশের ভারত-বিভক্তির পূর্বে উনিশ শতকের শুরু থেকে যে বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী বিকাশ লাভ করছিল, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৃষ্টিতে স্বভাবতই তারা উল্লসিত বোধ করে। কেননা, ওই শতাব্দীতে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তার প্রধান রূপকার ছিল প্রধানত নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে ও শিল্পে তাই শুরু হলো উদ্দীপনা ও সংঘবদ্ধ প্রকাশের নতুন এক অভিযান। কিন্তু দেশবিভাগের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তেই পূর্ববাংলার বিকাশোন্মুখ পুঁজিবাদী শ্রেণী এবং এর পরোক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠা স্ফীতকায় মানবতাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুভব করলো তার আত্মসংকটের স্বরূপ। অবাঙালী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি, আমলা ও পুঁজিপতি শ্রেণী জন্মলগ্ন থেকেই নিয়ন্ত্রণ ও কুক্ষিগত করতে শুরু করেছিলো পূর্ব বাঙলার রাষ্ট্রক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো।

প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার লক্ষ্যে পাকিস্তান গণ-পরিষদে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতে উল্লেখ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ইসলাম এবং রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। লাহোর প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার জন্য যে স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখা হয়েছিল তাও এবার অস্বীকৃত হলো। স্বভাবতই পূর্ববাংলার রাজনৈতিকমহল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের পাশাপাশি আওয়ামী-মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠির কাছে সাধারণ জন-মানুষের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত করা হলো বিকল্প একটি শাসনতন্ত্র। কিন্তু এই সময়ে গণ-পরিষদ বাতিল হয়ে গেলে শাসনতন্ত্র রচনার পদক্ষেপটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে ঘোষিত হয় সাধারণ নির্বাচন কিন্তু ইতোমধ্যে পূর্ববাংলায় শুরু হয়ে গেছে একধরনের অর্থনৈতিক অস্থিরতা।

দেশ-বিভাগের পর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও বিদেশ থেকে আমদানিকৃত জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশে উৎপাদিত কৃষিজাত কাঁচা মালের মূল্য কমে যায়। সারা দেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। পূর্ববাংলার জমিদার শ্রেণীর বিলোপের জন্যে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হলো ঠিকই, কিন্তু তার স্থলে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর ওপর চেপে থাকা জোতদারি বা মহাজনি প্রথাকে উচ্ছেদ করা হলো না। ফলে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হতে থাকে একধরনের অসন্তোষ। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পেশাজীবী শ্রেণী সংগঠিত করে নানা ধরনের আন্দোলন ও বিক্ষোভ। ১৯৫৪ সালে নির্বাচন ঘোষিত হলে ওই নির্বাচনকে সামনে রেখে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালে গঠিত হয় চারদলীয় এক 'যুক্তফ্রন্ট'। এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বাঙালী কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যথাযথ আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হওয়ায় ওই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু নির্বাচনী এই বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এতোদিন ধরে ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের মধ্যে বাঙালীদের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় নতুন এক প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র। পূর্ববাংলার নানা স্থানে শ্রমিক-দাঙ্গা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে ভেঙে দেয়া হয় 'যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা'। আবার প্রণয়ন করা হলো "ইসলামি প্রজাতন্ত্র" সংবলিত একটি শাসনতন্ত্র, সেটি চালু হয় ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ। এই শাসনতন্ত্রের অধীনে কেন্দ্রে যেমন নির্বাচন ছাড়াই সরকার গঠনের প্রহসন চলতে থাকে, তেমনি প্রাদেশিক সরকার গঠন নিয়েও পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক ওলট-পালট ঘটতে থাকলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। বিশেষত কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এর সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার অভিযোগ তুলে পঞ্চাশের শেষের দিকে ১৯৫৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করলেন পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাবহিনী-প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান। আপাত দৃষ্টিতে সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতাই হয়তো

Dhaka University Institutional Repository

এই অভ্যুত্থানের কারণ। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, জনমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদ, আমলা ও সামরিক বাহিনী এই ত্রয়ী শক্তির অবৈধ উপায়ে দেশ-শাসনের এক দীর্ঘস্থায়ী গোপন অভিলাষের অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে এই অভ্যুত্থান। ফলে জেনারেল আইয়ুব ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় দমননীতি ও মৌলিক অধিকার হরণের নানা প্রক্রিয়া। আর এ সবকিছুরই লক্ষ্য ছিল মূলত পূর্ববাংলাকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে সুকৌশলে বঞ্চিত রাখা। কেননা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই দেশী সামন্তশোষণ শিল্পপুঁজি, কাঁচামাল ও বাজারের লোভে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ক্রীড়নক হিসেবে বাংলাকে গড়ে তোলা হচ্ছিল আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজরূপে।[১] অর্থনৈতিক বিকাশের চারটি ক্ষেত্র যেমন আঞ্চলিক উন্নয়ন, অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যথাযথ ব্যয়, প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণের ব্যবহার ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন বা সরকারী উদ্যোগে শিল্প বিকাশের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি করে পূর্ববাংলার অর্থনীতিকে সেই পঞ্চাশের দশক থেকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। যেমন এই সময়পর্বে পূর্ববাংলার উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র ২৪ শতাংশ অর্থ। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ ছিল এক বিপুল পরিমাণ সম্পদ।[২] পূর্ব বাংলার বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় পঞ্চাশের দশকে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ২ শতাংশের তুলনায় মাত্র ০.৩ শতাংশ।[৩] অথচ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের ৬০% অর্জন করে আসছিল এই বাংলাদেশ।[৪] ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ববাংলাকে নানাভাবে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। একে শুরু থেকে ব্যবহার করা হয়েছে একটি আধা-উপনিবেশ হিসেবে আর শিল্পোন্নয়নে যেহেতু মনোযোগ দেয়া হয়নি ফলে এর সামন্ত-কাঠামোকেও জিইয়ে রাখা হলো পরোক্ষ ভাবে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই সময় সৃষ্টি হয় একধরনের দ্বান্দ্বিক বিচলন। পাকিস্তান সৃষ্টির ঈষৎ পূর্ব থেকে যাঁরা সামন্ত মূল্যবোধ লালন করে আসছিলেন তারা সদ্য স্বাধীনরাষ্ট্রে সেই মূল্যবোধকেই নতুন উদ্দীপনায় গ্রহণ করলেন তাঁদের জীবনাদর্শে। এখন এদের মূল লক্ষ্য হলো আবহমান বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য, প্রবহমানতা ও মানবিকতাকে খণ্ডিত করে সংকীর্ণ ইসলামী অর্থে পুথিসাহিত্যের আদলে গ্রহণ করা। এই সময়-পর্বে চল্লিশের অন্যতম প্রধান কবি সৈয়দ আলী আহসান সমকালীন দু'টি পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে এই ধরনের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন বিশেষভাবে। 'পূর্বতন সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন' হয়ে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির কথা বললেন তিনি।[৫] স্বাভাবিক কারণেই দেখা দিল একধরনের পশ্চাৎপদতা। সমকালীন একজন তরুণ কবি লক্ষ্য করলেন : স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুষঙ্গী হিসেবে যা শুরু হয়েছিল এবং দেশী বিদেশী শাসনমুক্ত হওয়ার পরও যাকে কৃত্রিমভাবে অসম্ভব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পিত শক্তির চাপই সৃষ্টির ক্ষতিসাধন করেছে বেশি আর তা হল সাহিত্যের ওপরে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শের অতিরেক।[৬] বস্তুত, এদের প্ররোচনায় রবীন্দ্র-সাহিত্যকে অস্বীকার ও বাংলা ভাষাকে বিকৃত বা সংশোধনের পরিকল্পনা নেয়া হলো প্রায় একই সময়ে। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যেসব বুদ্ধিজীবী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে পাকিস্তান-উত্তর

---

১ সৈয়দ আকরম হোসেন, কথামালা এবং পূর্ব বাংলার কবি ও কবিতা, বাঙলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ: ৩৬

২. A. M. A. Muhit, Evolution of A Colony, Bangladesh : Emergence of A Nation PP: 77-79

৩. P. C. Verma, Economic Stagnation of Bangladesh, P-56

৪. A. M. A. Muhit, Ibid, P-87

৫. পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা, মাহে নও, আগষ্ট, ১৯৫১

৬. আলাউদ্দিন আল আজাদ, শিল্পীর সাধনা, পৃ:১৩

Dhaka University Institutional Repository

পর্বে আবির্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চেতনাগত ব্যবধান ছিল প্রায় মেরুপ্রমাণ। কালের দিক থেকে শেষোক্ত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে কেবল ইউরোপীয় মানবতার আদর্শে তাঁদের নিজস্ব চেতনালোক গড়ে নিয়েছিলেন তাই নয়, বিভাগ পূর্বকাল থেকেই দায়বদ্ধ চেতনায় 'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের' দ্বারাও উদ্দীপিত হয়ে উঠছিলেন তাঁরা। পাকিস্তান-পরবর্তীকালে এই সংঘের তৎপরতা প্রায় বন্ধ হয়ে গেলেও চেতনার দিক থেকে তাঁরা তখনো ছিলেন বুর্জোয়া মানবতাবাদ বা প্রগতিশীল চেতনার ধারক। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল একধরনের মতদ্বৈতের। পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে আসায় একদিকে পুনরুজ্জীবন ঘটানো হলো সামন্ত মূল্যবোধের, অন্য দিকে বুর্জোয়া মানবতাবাদ কিংবা প্রগতিশীল চেতনায় দীক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এই অধোগতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন প্রায় সম্মিলিতভাবে। এর অনিবার্য পরিণাম হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালে সংঘটিত হলো রক্ষক্ষয়ী আন্দোলন, যা স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু অশক্ত বাঙালী বেনিয়া পুঁজি ও সদ্য গড়ে-ওঠা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দুর্বল প্রতিরোধের মুখে সম্পূর্ণ সফল হলো না সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে মেরুকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল তা আরো তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামন্ত মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ সূত্রে পাকিস্তান বা ইসলামী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নানা সময়ে সংগঠিত হলেন "পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ", 'তমদ্দুন মজলিস', 'রওনক সাহিত্য সংস্থা', 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংস্থায়। পক্ষান্তরে প্রগতিশীল মানবতাবাদীরা সম্মিলিত হলেন 'সংস্কৃতি সংসদ', 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' ইত্যাদি প্রগতিবাদী সংগঠনে। ফলে একধরনের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এই পঞ্চাশের দশকে। সামন্ত-জীবনাগ্রহ যেহেতু তখনো নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, বরং সরকারী আনুকূল্য পেয়েছে, ফলে সামন্ত মূল্যবোধে লালিত বিভাগ-পূর্ববর্তীকালের প্রতিষ্ঠিত কবিকুল এই পর্বেও অর্জন করে নিয়েছেন একধরনের প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে যারা বুর্জোয়া মানবতাবাদ বিংবা দায়বদ্ধ চেতনায় সমর্পিত ছিলেন তাঁদের সামনে খোলা ছিল তিনটি পথ — পাক-শাসকচক্রের সঙ্গে আপোষের; কিংবা বিপ্লবের, অথবা সমাজ-জীবন ও ইতিহাস-পথচ্যুত হয়ে আত্মবিবরে পলায়নে। কাব্য-জীবনের প্রাথমিক পর্বে, বিশেষত সামরিক শাসন জারির (১৯৫৮) পূর্ব পর্যন্ত নতুন প্রজন্মের কবিরা কিন্তু প্রতিরোধ বা সংঘাতের পথকে গ্রহণ করেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন মানবিকতায়। আবহমান বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা সাহিত্যের গতিপথ নির্ণয় করবার চেষ্টা করছিলেন তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার পরিকল্পনা নিয়েই সৃষ্টি হয় "পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।" যেহেতু পরিবর্তিত দেশকালের পটভূমিতে "প্রগতি লেখক সংঘের" পুনরুজ্জীবন ছিল অসম্ভব, ফলে সাম্যবাদ ও বুর্জোয়া মানবতাবাদে বিশ্বাসী কবি-সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই এই সংগঠনের ছত্রচ্ছায়ায় সংগঠিত হলেন নতুনভাবে। এই সংসদেরই উদ্যোগে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় একুশের ঐতিহাসিক সংকলন "একুশে ফেব্রুয়ারী" (১৯৫৩)। শুধু সংকলন নয়, এই সময়ে আবহমান বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকা ও একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও দেশের অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত হয় বেশ কয়েকটি সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক সম্মেলন। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের দ্বারা চাপিয়ে দেয়া নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি ও ভাষা-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত এই সমস্ত সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতিকে রক্ষা করার পাশাপাশি এসব সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে প্রবহমান ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, 'সকল রকম বিকৃতি কুসংস্কার কূপমন্ডুকতা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরীভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখা' এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা।[১] অবশ্য এইসব তৎপরতার অর্থ এই নয় যে, ঐতিহ্যচ্যুত, সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে উজ্জীবিত কবিসম্প্রদায় তাঁদের পথ থেকে সরে এসেছে খুব সহজেই। এটা যে ঘটেনি তার বড় প্রমাণ ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ঢাকায় আয়োজন করা হয় একটি "ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন"। এই সম্মেলনে বলা হয়েছিল ইসলামের মৌলিক জীবনাদর্শের ওপর ভিত্তি করে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের কথা, যে প্রক্রিয়া চলে আসছিল অনেক আগে থেকেই। সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন প্রশ্নে তারা বললো, রাষ্ট্র, জীবন ও শিল্পে ইসলামী সভ্যতার রূপদানই এখন একমাত্র কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে তারা একান্ত কৃত্রিমভাবে গদ্যে ও পদ্যে অজস্র আরবী-ফারসী শব্দ আমদানি করতে লাগলো। সেই সঙ্গে নেহাৎ ব্যক্তিগত মানসিক আবেগকেও আরব্য-পারস্য ইতিহাস-উপাখ্যানের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলন করবার একটা ব্যাপক চেষ্টা চলল। এই দলের একজন মুখপাত্র লিখলেন, ' প্রয়োজন হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিতে হবে। আর এই মানসিকতার চরম প্রকাশ আরবী হরফে বাংলা লেখা এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার মধ্যে।[২] এমনকি যারা ইউরোপীয় মতবাদ কিংবা সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদেরও সমালোচনা করা হয়েছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায়। ১৯৫৪ সালের পর যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ এবং ১৯৫৮ সালের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ আরো তীব্রতা পায়। 'পাকিস্তানী-আদর্শে বিশ্বাসী' লেখক-শিল্পীদের এই সম্মেলনে বলা হয়, প্রগতিশীল চেতনায় অনুপ্রাণিত ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ধারণা ত্যাগ করে পাকিস্তানী আদর্শে সাহিত্য সাধনা করতে হবে, কারণ, 'এখন আমি আর বাঙালী নই। আমি মুসলমান এবং আমি পূর্ব পাকিস্তানী'।[৩] এইসব বাদ-প্রতিবাদের পাশাপাশি অবশ্য কোন কোন তরুণ কবি বেছে নিয়েছিলেন একধরনের পাশ্চাত্যমুখী মধ্যপন্থা। এদের একজন বলেছিলেন, ইসলামী ধারা ও আবহমান বাংলা সাহিত্যের সার্থক সমন্বয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এদেশের সাহিত্যের সামগ্রিক মুক্তি।[৪] তবে স্পষ্টতই সমন্বয়ের এই ভাবনা সত্ত্বেও মধ্যপন্থী লেখক-সম্প্রদায়ের দুর্বলতা ছিল মানবতাবাদী আদর্শের প্রতি। অর্থাৎ সব মিলিয়ে পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার কবিতা চেতনাগত দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে প্রধানত দু'টি ধারায় —

এক. পাকিস্তানী বা ইসলামী ধারায় এবং
দুই. মানবতাবাদী বা দায়বদ্ধ ধারায়

প্রথমোক্ত ধারার অনুসারী ছিলেন প্রধানত চল্লিশের দু'জন কবি সৈয়দ আলী আহসান এবং ফররুখ আহমদ এবং শেষোক্ত স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিলেন পঞ্চাশের নতুন প্রজন্মের প্রায় অধিকাংশ কবি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে হিন্দু-পুনর্জাগরণের ভাবনায় যেমন কোন কোন লেখক অবহেলা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পটভূমি, অনেকটা যেন তারই বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল এই পর্বে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ দিয়ে ঐতিহ্যের সমস্ত প্রেক্ষাপট ভুলে বাংলা কবিতার সীমাকে সংকুচিত করে তুলতে চাইলেন প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবিরা। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা অনিবার্য ভ্রান্তি হলো কবিতার সীমা যেমন এতে সংকীর্ণ হয়ে আসে, তেমনি বৃহত্তর মানব-মুক্তিকেও তা অস্বীকার করে। ফলে পঞ্চাশের কবিরা নিজস্ব জাতিসত্তাকে মেনে নিয়ে পূর্বসুরীর এই ভ্রান্তিকে মূলত অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। কেননা, এখন সাহিত্যের লক্ষ্য মানুষের মুক্তি।

---

১. প্রচারপত্র, পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ১ম সংখ্যা, ১৯৫৪
২. আলাউদ্দিন আল আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪
৩. সম্পাদকীয়, সাহিত্য সংখ্যা, মাসিক মোহাম্মদী, ১৯৫৮
৪. Z. R. siddiquee, Quality and Deficiencies of Poetry in E. Pakistan

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত পক্ষে ঝর্নার মূল উৎস মানবতা। আর সেজন্যেই জাতিতত্ত্বের সংকীর্ণতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর।[১] অর্থাৎ মানবমুক্তির লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের কবিরা তাঁদের কবিতাকে একটি অখন্ড সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সৃষ্টি করে নিতে চেয়েছেন এবং এক্ষেত্রে কোনরকম বিভেদ নয়, অসাম্প্রদায়িক মিলনকামী পন্থাকেই শ্রেয় বলে নির্দেশ করেছেন তাঁরা। কেননা তাঁদের মতে এই ধারাই 'সবচেয়ে প্রগতিসম্ভব ও ব্যাপক প্রতিনিধিত্বশীল'। অবশ্য এসব উক্তির তাৎপর্য এই নয় যে, পঞ্চাশের কবিদের হাতেই সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিকতার এই ধারা। বরং চল্লিশের দশকে বিভাগ-পূর্ব কলকাতায় আহসান হাবীব ও আবুল হোসেনের কবিতায় অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিকতার যে অভিষেক হয়েছিল, সেই কাব্যসংস্কারকেই বিভাগ-পরবর্তী কালে বহন করে এনেছেন এই নতুন প্রজন্মের কবিরা। একে দিয়েছেন দৃঢ়মূল তাত্ত্বিক এক ভিত্তি। অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের কবিকুল যেমন অসাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তেমনি চল্লিশেরই কোন কোন কবি আবার ইসলামী পুনর্জাগরণকেই গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাব্যাদর্শ হিসেবে। কাব্যচর্চার দিক থেকে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ — এই তিন দশকের প্রজন্মের কবিদের দ্বারা মুখরিত হয়ে আছে ষাটের সময়-পর্বটি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন তেমনি জীবনদৃষ্টি বা আঙ্গিকের দিক থেকেও তাঁদের কবিতায় পাওয়া যাবে ভিন্ন ভিন্ন মনোভঙ্গি এবং বিন্যাস-পদ্ধতির ব্যক্তিক পরিচয়। প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে তা হলো, এই তিন প্রজন্মের কবিতাই প্রধানত মানবিক, দ্বিতীয়ত দেশচেতনায় সমৃদ্ধ। শিল্পের জন্য শিল্প বা ব্যক্তিগত কবিতার চর্চা এই পর্বে দু'একজন কবি ছাড়া আর কারো কবিতায় তেমন চোখে পড়ে না। বরং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের পরিবর্তে দেশকালগত বৈরী পরিবেশ বা মানবিকতার অবমাননায় তাঁরা বোধ করেছেন তীব্র আত্মসংকট, খুঁজে পেতে চেয়েছেন আত্মমুক্তির পথ। কিন্তু কবিতায় এই প্রসঙ্গটি রূপায়ণের প্রশ্নে ঘটে গেছে মৌলিক পরিবর্তন। চল্লিশের কবিকুল নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন কবিতায়, পঞ্চাশের কবিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাবে এই নৈর্ব্যক্তিকতার ধরন। কিন্তু ষাটের কবিতা পুরোপুরি আত্মজৈবনিক-স্বীকারোক্তিমূলক রীতিতে বিন্যস্ত। আত্মজৈবনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল পশ্চিম বাংলার পঞ্চাশের দশকে এটা যেমন সত্য, তেমনি বাংলাদেশে ষাটের কবিরাই তাকে নানাভাবে করে তুলেছেন অনেক বেশি অগ্রসর ও গ্রহণযোগ্য। তবে এই তিন প্রজন্মের কবিদের রচনার মর্মেই নিহিত আছে স্বদেশচেতনা, আত্মসংকট এবং অস্তিত্বের নিবিড় অনুধ্যান — যা এই তরঙ্গসংকুল সমাজ থেকেই আহৃত। প্রায় সব কবির কবিতায় পাওয়া যাবে সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতময় ঘটনাবহুল চিত্রের রূপায়ণ। শুধু বিষয়বস্তুতেই নয় ভাষাভঙ্গি বা আঙ্গিকের দিক থেকেও ঘটনাবহুল সমাজচিত্রের এই ধারাবাহিকতা অনুধাবনযোগ্য।

---

১. আলাউদ্দিন আল আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবি-জীবন ও কাব্য পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহসান হাবীব (১৯১৭ – ১৯৮৫)

বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার শংকরপাশা গ্রামে আহসান হাবীব জন্ম গ্রহণ করেন ১৯১৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি। ১৯৩৫ সালে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে প্রায় দেড় বছর আই. এ. পড়েন। আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। পিতা হামিজউদ্দীন হাওলাদার কৃষিকাজ করতেন, পরবর্তীকালে 'কবিরাজ' হিসেবে নাম করেছিলেন।

কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৩৭ সালে প্রথম চাকুরী কলকাতায় ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পাদিত 'দৈনিক তকবীর'-এ সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তখন তাঁর বেতন ছিল মাত্র সতের টাকা। কলকাতায় থাকাকালীন বিভিন্ন সময়ে তিনি দৈনিক আজাদ, দৈনিক কৃষক, দৈনিক ইত্তেহাদ, শিশু সওগাত, মাসিক সওগাত ও আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে চাকুরী করেন। ঢাকা এসে প্রথম চাকুরী নেন দৈনিক আজাদ ও মাসিক মোহাম্মদীতে। এরপর দৈনিক ইত্তেহাদ, সাপ্তাহিক প্রবাহ ও ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস-এও তিনি চাকুরী করেন। আহসান হাবীবের সর্বশেষ চাকুরী 'দৈনিক বাংলার' সাহিত্য পৃষ্ঠার সম্পাদনা। সুদীর্ঘ বিশ বছরেরও বেশি সময় তিনি এই চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন।

বাল্যকালে পড়বার উপযোগী কিছু কিছু বই বাড়িতে পেয়েছিলেন — সেগুলোর মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের পুথি ও মীর মশাররফ হোসেনের বই তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। এ থেকে সাহিত্য চর্চার দিকে ঝোঁক আসে। পিরোজপুর হাইস্কুলে পড়াকালীন প্রথম কবিতা "মায়ের কবর পাশে কিশোর" স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। স্কুল ম্যাগাজিনের বাইরে প্রথম কবিতা "প্রদীপ" প্রকাশিত হয় 'শরীয়তে এসলাম' পত্রিকায়। এ সময়ে তিনি স্কুলের সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। কিশোর বয়সে লিখতেন 'হাবীব' নামে, পরে কলকাতায় গিয়ে নাম পরিবর্তন করেন 'আহসান হাবীব'-এ। এ নামেই লিখে এসেছেন গল্প কবিতা উপন্যাস ও কিশোর সাহিত্য। বিভাগপূর্ব ও পাকিস্তান আমলের কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ — 'রাত্রিশেষ' (১৯৪৭) 'ছায়া হরিণ' (১৯৬২) 'সারা দুপুর' (১৯৬৪) 'আশায় বসতি' (১৯৭৪) 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' (১৯৭৬) 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর' (১৯৮০) ও সর্বশেষ 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' (১৯৮৫)। এছাড়া রয়েছে উপন্যাস, অনুবাদ এবং শিশুতোষ রচনা।

কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্যে তিনি নানা সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), অনুবাদের জন্যে ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬০-৬১), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), একুশের পদক (১৯৮২), পদাবলী পুরস্কার (১৯৮২), আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০), বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পদক (১৯৮১) ও আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪)।[১]

রাত্রিশেষ (১৯৪৭) : মোট আটাশটি কবিতা নিয়ে আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় কমরেড পাবলিশার্স, কলকাতা থেকে।[২] জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'প্রহর', 'প্রান্তিক', 'প্রতিভাস' এবং 'পদক্ষেপ' এই চার শ্রেণীতে এ গ্রন্থের কবিতাগুলো বিন্যস্ত। কবিতার বিষয় হিসেবে এসেছে বিভাগপূর্বকালের যুদ্ধ, মহামারী, দাঙ্গা ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় আলোড়িত বাংলাদেশ। ফলে

---

১. পদাবলীর সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের ব্রোশিউর এবং আহসান হাবীব স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদক -মোকনুজ্জামান খান, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৭ [আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি]

২. রাত্রিশেষ কাব্যের দ্বিতীয় মুদ্রণ (১৯৫৫ ইনল্যান্ড প্রেস, ঢাকা থেকে। তৃতীয় মুদ্রণ (১৯৮০) মুক্তধারা ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমদিকের কবিতাগুলি নিদারুণ নৈরাশ্যাচ্ছন্ন ও অবসাদগ্রস্ত। তবে একথা স্পষ্ট যে, মধ্যবিত্ত মানসের সংগ্রামী চেতনা এবং যুগযন্ত্রণার কথা তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে; কখনো তা অপেক্ষাকৃত চড়া সুরে, কখনো বা ব্যঙ্গ-কৌতুকী ভঙ্গিতে।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই মাসিক মোহাম্মদী-তে আবদুল হক এর সমালোচনায় বলেন, "আহসান হাবীবের কবিতায় কোথাও অস্পষ্টতার কুয়াশা নেই, যা এ যুগের কবিতার বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতায় আগের যুগের কবিতা এ বইয়ে আছে, এবং সমাজ সচেতন যুগের কবিতাও আছে। স্বাভাবিক পরিণতির মধ্য দিয়ে এক যুগের কবিতা থেকে তিনি আরেক যুগের কবিতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।"[১] মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "তিনি তাঁর স্বকাল, স্বসমাজ ও স্বদেশকে অধ্যয়ন করেছেন বর্তমানেরই পটে। তাই ইতিহাসের আশ্রয় তাঁর কবিতায় যতখানি না ব্যাপ্ত হয়েছে, তার চেয়েও অনেক বেশী প্রাধান্য পেয়েছে নিকট-বাস্তব এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার প্রথম পর্যায়ের কবিতায় যে বৈশিষ্ট্যটুকু নজরে পড়ে তা হলো এই যে, বাস্তবজীবনের সংকট সমস্যার এবং তা থেকে উত্তরণের আকুতি জানাতে গিয়েও আহসান হাবীব তাঁর রোমান্টিক মানসপ্রবণতা, স্বপ্ন-সৌন্দর্যের অনুভূতি বিসর্জন দেননি। কবিতার ভাষায়, বক্তব্যের উচ্চারণে সর্বত্রই এর পরিচয় স্পষ্ট।"[২]

এ কাব্যের বিশ্লেষণে আতোয়ার রহমান বলেন, "হাবীব সমাজ সচেতন কবি বলেই সমসাময়িক কালের দ্বন্দ্ব ও সমাস্যাকে অকপটে কাব্যে রূপায়িত করেছেন। ..... গভীর ও জটিল সমাজ-সমস্যা তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন কঠিন বিদ্রুপের মাধ্যমে"।[৩] 'আধুনিক কবিতা' সংকলনের ভূমিকায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "যে আবেগ থেকে আহসান হাবীবের 'রাত্রিশেষের' অনেকগুলি কবিতা উৎসারিত তা হলো সমাজ সম্পৃক্ত বোধ, ত্রিশোত্তর কবিতার যা একটি প্রধান ধারা"।[৪]

আহসান হাবীব আত্মমগ্ন নির্জনতার কবি নন। তাঁর কবিতায় রয়েছে ব্যাপক গণসংযোগ। এই গণ-সংযোগ তাঁর কবিতায় এমন ভাবে আশ্রয় করে আছে যে, আহসান হাবীবের কবিতাকে কেবল প্রতিবাদের কবিতা বলে চিহ্নিত করা যাবে না। রাত্রিশেষ অনেক ক্ষেত্রে যেমন সংশয়ের তেমনি জাগরণের। অর্থাৎ সমস্ত হতাশার উপরে জীবনের অর্থময় পূর্ণতার দিকে তিনি দৃষ্টিকে স্থির রেখেছেন। 'রাত্রিশেষ' কাব্যের পেছনের প্রচ্ছদে যে দাবি ছিলো তা অমূলক নয় — "বাংলা কবিতা যখন সমাজ সম্পৃক্ত এক নতুন সংজ্ঞায় নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হচ্ছে.... নতুন কাব্য পরীক্ষার সেই দুঃসাহসী সমাবেশে যোগ স্থাপনে রাত্রিশেষ একেবারে অক্ষম হয়নি"।[৫]

হারাহরিণ (১৯৬২) : ঢাকার কথাবিতান থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার চৌদ্দ বছর পরে। ফলে এ কাব্যের কবিতাগুলোর রচনাকালের ব্যাপ্তি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত বিস্তৃত। মোট ৪৭টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ কাব্যের মূল সুর আশাবাদ। তবে সমসাময়িক যুগ ও যুগযন্ত্রণার বিষাক্ত ছোবলের চিহ্নও পাওয়া যায় এর কোন কোন কবিতায়। বিশেষত, এই কবিতাগুলো সেইসময়ের রচনা যখন সুকুমার মূল্যবোধের উপর রক্তাক্ত হাত রেখেছে বণিক সভ্যতা। অবক্ষয়ে, ঐশ্বর্যের আস্ফালনে, জোতদারের শোষণে ক্লেদে ও কদর্যতায় সমাজ ছিলো আবিল। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ও নবতর স্বাধীনতার পর নানাবিধ জটিলতা, কাব্যচেতনায় স্বাক্ষর রেখেছিলো — এ কাব্যের

---

১. 'মাসিক মোহাম্মদী' ২০ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩৫৪।
২. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, 'পঁচিশ বছরের কবিতা', উত্তরাধিকার, শহীদ দিবস সংখ্যা ১৯৭৪।
৩. আতোয়ার রহমান, 'আহসান হাবীব : রাত্রি শেষের কবি' দৈনিক সংবাদ, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫২।
৪. ড. রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭১।
৫. আহসান হাবীব, রাত্রিশেষ, প্রথম সংস্করণ, কমরেড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাগুলো সেই অস্থির সময়ের জীবনভাষ্য। এ গ্রন্থের কবিতা সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান বলেন, "আহসান হাবীবের ক্ষোভ আছে, বিক্ষোভ নেই, সংক্রান্তি আছে, সেই সঙ্গে আপোষও আছে আর আছে উত্তরণের আশা।"১ ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "'ছায়াহরিণ' সংকলনটিতে কবির আবেগ বিনা ভূমিকায় অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। .... জীবনকে তিনি যতটুকু দেখেছেন এবং যেভাবে দেখেছেন তার পরিচয় তিনি কবিতায় সহজ ও সাবলীল ভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।"২ তরুণ গবেষক তুষার দাশের মন্তব্য, "ছায়া ও হরিণ প্রকৃতিরই অংশ বিশেষ এবং এ দুটিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে কবির আশাবাদের ইমারত। কবির এই আশাবাদের পাশাপাশি দেশপ্রেম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনা (যা বড় কবির একটি বৈশিষ্ট্য) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে 'তালেবালি' 'হুজুত সর্দার'দের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিদ্রোহ জীবনের পাশাপাশি মৃত্যুচিন্তাও 'ছায়াহরিণ' কাব্যটিকে ঋদ্ধ করেছে।"৩ এ কাব্যের বিশ্লেষণে শফিউল আলমের বক্তব্য — "আহসান হাবীবের কবিতার মধ্যে বাংলা কবিতার একটা সুস্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন বিবর্তনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাসমাজের আলোড়ন, ক্রান্তি, অবসাদ এবং তার আকাঙক্ষা, বিদ্রোহ, উদ্যোগ এবং তার অন্তর্গত স্বরূপের প্রতিফলনে এই ধারা পুষ্ট হয়ে চলেছে। আহসান হাবীবের কাব্য এই ধারার এমন এক যুগচিহ্নকে রূপায়িত করার প্রয়াসে উন্মুখ যখন সংকট, স্বার্থ, বিরোধিতা, আশা, আস্থা, আর বিদীর্ণ হতাশা একই সঙ্গে বাংলা সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছে।"৪

এ কাব্যের সমালোচনায় আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, "স্পষ্টভাবে নয় তবু হার্দ্য গুণাবলী 'ছায়াহরিণের' শারীর রেখায় প্রতীয়মান।"৫ ফলত, এ কাব্যের কবিতায় যেমন খুঁজে পাওয়া যায় স্বদেশ, স্বকাল ও জীবনের প্রতিচ্ছবি তেমনি ইতিহাস-লাবণ্যের কিছু আভা পাওয়া যায় টের। সে ইতিহাস ঐতিহ্যের ইতিহাস — মৃতকল্প জীবনের ইতিহাস নয়। ইতিহাসের ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে যে নবজীবন নির্মাণের পরিকল্পনা এবং নবতর আশা — স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে একাব্যে।

সারা দুপুর ১৯৬৪ : মোট ২৬টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় কথাবিতান, ঢাকা থেকে। সাধারণ ভাবে সমাজ-অন্তর্গত মানুষ, তার দুঃখ-বেদনা ভালোবাসা-ব্যর্থতা এবং স্বপ্ন-সম্ভাবনাই এ কাব্যের বিষয়। বর্তমান সময়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দুর্গ-প্রাকারে মানুষের আত্মা যে অর্থ-সম্পদের কলুষে বিবেকবর্জিত — তার নির্মম রূপটিও প্রতীকায়িত হয়েছে একাব্যের কোন কোন কবিতায়। যুগের অনিবার্যতা, জীবনের সুখ-অসুখ এবং দেশের নানাবিধ সংকটের চিত্র থাকলেও এ-কাব্যগ্রন্থ থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছে সমাজ-সম্পৃক্তি ছেড়ে শিল্পের জগতের দিকে। ফলে কবি এ কাব্যে হয়ে উঠেছেন নিমগ্ন, কিছুটা আত্মমুখী, কিছুটা গভীর। বলা যায়, এ গ্রন্থে কবির এক বিশেষ চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে, কখনো নিরাশায় মুক্তি-ব্যাকুলতায়, কখনো বা আশার উজ্জ্বল আলোকে অবগাহন প্রচেষ্টায়। তবে এ পর্যায়ের কবিতা আবেগ-উচ্ছ্বাসমণ্ডিত নয়, বরং অন্তরাশ্রয়ী।

এ গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন কবি শামসুর রাহমান — "বইটির নাম যদিও 'সারা দুপুর' তবু গ্রন্থের সমস্তটা জুড়ে একটা অপরাহ্নের ছাপ বেশ গাঢ় বলেই মনে হয়েছে আমার।"৬ এ প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর মন্তব্য, "কাব্যের বেদনার আমেজ কখনও দ্বিপ্রহরের অতলান্ত শব্দহীন

---

১. হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭২।
২. ড. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত আধুনিক কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১।
৩. তুষার দাশ, নিরন্তর বন্ধু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫।
৪. শফিউল আলম, দৈনিক সংবাদ, ১৬ই শ্রাবণ-১৩৭২।
৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ছায়াহরিণ' আহসান হাবীব, সমকাল কবিতাসংখ্যা, অষ্টম বর্ষ-১৩৭১।
৬. শামসুর রাহমান, 'সারা দুপুর', অধুনা-কার্তিক, ১৩৭১।

Dhaka University Institutional Repository

গভীরতাকে স্পর্শ করে, কখনও তার উত্তাল হাওয়ায় মর্মরিত পত্রের হাহাকারকে মূর্ত করে তোলে।"[১] হতে পারে বহির্জাগতিক আনন্দ ও আশ্বাসহীনতায় কবি বারবার বেদনাবিদ্ধ হয়েছেন। দুঃখের দাবদাহে ঝলসে গেছে মন ও মনন। ফলে অন্তর্লোকে নির্বাসিত হওয়া ছাড়া নিরাময় কোথায়। নিজের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন মুক্ত আলো-বাতাসে জীবন ধারণ করতে পারে — এই কামনায় তিনি তাদের জন্যে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যেতে চান ব্যবসা-বাণিজ্য বা কলকারখানা নয়, বরং কিছু মহৎ বাণী ও ফুলের উজ্জ্বলতা — যার আলোতে লোহা বা ডালের আড়তে যাবার সময় তারা হৃদয়ের অস্তিত্বকে অনুভব করবে। এ গ্রন্থের কবিতা প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার গবেষক ড. মধুসূদন চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ, " এই একই চেতনার একই ভাবনা কামনার অভিব্যক্তি নিরাশা থেকে মুক্তি-ব্যাকুলতার আকাঙ্ক্ষা। ... জীবনকে তার সংগ্রামকে তার বিচিত্র রূপকে জেনেছেন চিনেছেন, প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই দিক দিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে সমাজ-সম্পৃক্ত — মানুষ, মাটি, মন থেকে পিছিয়ে থাকতে পারেননি।"[২]

---

১. মুনীর চৌধুরী, মাসিক পূবালী, পৃঃ ১২৪-১২৫।
২. ডঃ মধুসূদন চক্রবর্তী, বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ধারা, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ফররুখ আহমদ (১৯১৮—১৯৭৪)

যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে ১৯১৮ সালের ১০ই জুন ফররুখ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ হাতেম আলী একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি 'খান বাহাদুর' খেতাব পেয়েছিলেন। দেড় বছর বয়সে মাতৃহারা হয়ে ফররুখ আহমদ তাঁর দাদীর নিকট প্রতিপালিত হন। দাদীর প্রিয় পুথি তাজকেরাতুল আউলিয়া ও কাসাসুল আম্বিয়া থেকে নানা কাহিনী তিনি শিশু ফররুখকে শোনাতেন যা কবির পরবর্তী জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। "বাল্যকালে ফারসী জানা এক মহিলা ফররুখকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন।"[১]

গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি ১৯২৭ সালে কলকাতায় বড়ভাই সিদ্দিক আহমদের কর্মক্ষেত্রে চলে যান। সেখানে যাদবপুরের নিজস্ব বাড়ি 'অলকাপুরী'তে থেকে তালতলা মডেল স্কুলে তিনি পড়াশোনা করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে বালিগঞ্জ হাইস্কুলে পড়াশোনা করলেও অসুস্থতার জন্যে পরীক্ষা দিতে পারেননি। ১৯৩৭ সালে খুলনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। এরপর তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন ও সেন্টপল কলেজে ইংরেজী অনার্সে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু অনার্স পাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ফররুখ আহমদ 'সৈয়দ' পদবী ব্যবহার করেননি। এ বিষয়ে তার স্মৃতিচারণ, "সৈয়দের গোষ্ঠীর মধ্যে থাকলে সত্যিকারের মানুষের গোষ্ঠীর বাইরে থাকতে হবে। ... ফালতু লেজটা কেটে বাদ দিয়ে দিলাম।"[২]

ছাত্রাবস্থায় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রেডিক্যাল হিউম্যানিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু অচিরেই তাঁর চেতনার জগতে পরিবর্তন আসে। "টেইলর হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফুরফুরার পীর সাহেবের খলিফা আবদুল খালেকের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের পর ফররুখ আহমদ ইসলামী আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েন।"[৩]

পারিবারিকভাবেই তিনি সাহিত্যচর্চার পরিবেশ পেয়েছিলেন। তাঁর চাচা কাশেম আলী সাহিত্য চর্চা করতেন, বড় ভাই সিদ্দিক আহমদ গান বাঁধতে পারতেন। আর ছোট ভাইয়ের আকর্ষণ ছিলো চিত্র অংকনের দিকে। ফররুখ আহমদ কলেজে পড়াকালীন অবস্থায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। কবিতা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, মেধাবী ছাত্র হয়েও প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার দিকে বেশি দূর এগোতে পারেননি।

সরকারী চাকুরে হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৪৩ সালে। প্রথমে আই.জি. প্রিজন অফিসে ও পরে সিভিল সাপ্লাই বিভাগে তিনি কাজ করেন। পরে অবশ্য তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। মাসিক মোহাম্মাদী পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিয়ে এক সময়ে এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে তিনি সে চাকুরী ছেড়ে দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ঢাকা চলে আসেন ও ঢাকা বেতারে যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি ঢাকা বেতারেই কর্মরত ছিলেন। "বাংলাদেশের

---

১. সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু, আব্বাকে যেমন দেখেছি, ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি (সম্পাদনা শাহাবুদ্দীন আহমদ, ই.ফা:: ১৩৯০ পৃঃ২৮০।

২. কামরুল হাসান, 'ফররুখ ভাই', ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি, পৃঃ৫১।

৩. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি, পৃঃ ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন না করার জন্যে ১৯৭১-এর পর বেশ কিছুদিন তাঁর চাকুরী ছিল না। পরে অবশ্য তিনি বকেয়া বেতনসহ চাকুরী ফিরে পেয়েছিলেন।"[১]

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাতসাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। ১৯৫২ সালে সিরাজুম মুনীরা এবং নৌফেল ও হাতেম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। এরপর মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩) পাখীর বাসা (১৯৬৫) হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬) নতুন লেখা (১৯৬৯) এবং হরফের ছড়া (১৯৭০) ছড়ার আসর (১৯৭০) ফররুখ আহমদের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৭৫) প্রকাশিত হয়।

কবি হিসেবে অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড ফর পারফরমেন্স' ও 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' ১৯৬৬ সালে, হাতেমতায়ী গ্রন্থের জন্যে আদমজী পুরস্কার এবং 'পাখীর বাসা' গ্রন্থের জন্যে ইউনেস্কো পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন।

১৯৭৪ সালে ১৯শে অক্টোবর ইস্কাটন গার্ডেনের সরকারী বাড়িতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে। এ কাব্যে সংকলিত চারটি সনেটসহ মোট ১৯টি কবিতার রচনাকাল ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সাল। এই সময়ে মুসলমান সমাজে যে স্বাধিকার চেতনার উন্মেষ দেখা দিয়েছিল — সেই আদর্শগত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে এ কাব্যে। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিনগুলিতে মুসলিম শক্তি অমিতবিক্রমে বিশাল ভূখন্ডে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো। প্রাক-পাকিস্তান আমলে দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে সেই গৌরবময় যুগে প্রত্যাবর্তন করার জন্য এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় কবি আহ্বান জানিয়েছেন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবেই কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার, দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশে'। উৎসর্গ পত্রের সনেটটিতে কবি ভারতীয় মুসলমানদের নবজাগরণে ইকবালের অতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে নিজ কাব্যাদর্শেরও একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

একাব্যে কবি যেমন অতীতের জীবন-ঐশ্বর্য ও মহিমার অনুধ্যান করেছেন, লক্ষ্য করেছেন পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে ধাবিত মানবযাত্রীর বিচিত্র অবস্থা, তেমনি বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার শোষণের রূপ অবলোকন করেছেন, আর্ত-মানতার দুর্দশায় সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। কোন কোন কবিতায় কবির ঐতিহ্য ভাবনা, প্রেমভাবনা ও জীবনভাবনার দেশজ-জীবন সূত্রের স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। বলা যায়, কবির অতীত ভাবনা বর্তমান জীবন ভাবনার সমসূত্রে এসে নবমূল্যে উদ্ভাসিত হয়েছে।

একাব্যের বিশ্লেষণে সুনীলকুমার মুখোপধ্যায় বলেন, "সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অধিকাংশ কবিতায়ই কবির ঐতিহ্য-প্রীতি ও ইসলামী ধর্মাদর্শের মহত্ত্বে অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও অনুরাগের পরিচয় পরিস্ফুট। এ ঐতিহ্য ও ধর্মাদর্শের আলোতে তিনি আধুনিক মুসলমানদের জীবন-সমস্যা সমাধানের পথ যেমন খুঁজেছেন, তেমনি প্রাণের একটি অপরূপ সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য পিপাসা নিবৃত্ত করার চেষ্টা পেয়েছেন।"[২]

---

১. ফজল-এ-খোদা, "তাঁর তুলনা তিনি নিজেই", ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি, প্রঃ ২৩৯।
২. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি ফররুখ আহমদ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য, " 'সাত সাগরের মাঝির' মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর একটা রোমান্টিক ভাবাবহ নির্মিত হয়েছে। তিনি প্রাথমিক যুগের ইসলামের উদ্দীপনা, সচলতা, আগ্রহ এবং অনেক দূরে চিত্তকে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। .... দুর্গম পথযাত্রায় তৃপ্তি, সমুদ্রপথে নতুন দ্বীপভূমি আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা, রাত্রির অন্ধকার এবং বিভীষিকা অতিক্রম করে একটি স্বপ্ন-রাজ্যে উপস্থিত হবার কল্পনা — এ সমস্ত কিছুই রোমান্টিক আবহ নির্মাণের সহায়ক।"[১]

হাসান হাফিজুর রহমানের বিশ্লেষণ, "একাব্যে ঐতিহ্যের স্বপ্ন যতখানি লাবণ্যে উদ্ভাসিত, জীবনের দ্বান্দ্বিক অবশ্যম্ভাবিতা ততখানি উজ্জ্বল নয়। ...বিশেষত জীবন ধারণার সঙ্গে আদর্শের যোগ স্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রতীক ও রূপক দ্যোতনার মাধ্যমে। তাই ফররুখ আহমদের ঐতিহ্য ব্যবহার জীবন-রসে নয়, প্রতীক রসে সিঞ্চিত।"[২]

আজাদ করো পাকিস্তান (১৯৪৬) প্রথম প্রকাশিত হয় মৃত্তিকা গ্রন্থনী বিভাগ, কলকাতা থেকে। বিভাগ পূর্বকালে রচিত মোট ১০টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ কাব্যে কবি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আদর্শ, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্যে যে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল কবি তাতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কবিতাগুলি লেখেন। পাকিস্তান বলতে তিনি শুধুমাত্র একখন্ড ভূমিকেই বোঝেননি, বরং পাকিস্তানকে তিনি অনুভব করেছেন স্বপ্ন ও আদর্শের লালনাগার হিসেবে। কাব্যের পরিচিতিমূলক বক্তব্যেও তিনি পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে তাঁর মতামত রেখেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "স্বাধীন হয়ে বাঁচবার অধিকার মানুষ মাত্রেরই। নিজের চরবার মাঠে নিজের সম্পূর্ণ অধিকার দাবি অযৌক্তিক নয়। এদিক দিয়ে পাকিস্তান দাবি খাদ্যাখাদ্যের মতো বিবেচিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য। খাদ্যাখাদ্যের বিচার জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের, পশুর নয় এবং মানুষ যখন বাঁচে স্বাধীন হয়েই বাঁচে"।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না। অত্যাচার জুলুম থাকবে না, অর্থাৎ একটা আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান গড়ে উঠবে বলে কবি বিশ্বাস করতেন। বর্তমান শোষক-শাসকরা হটে গিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানে নিরন্ন মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে কবি যে মনোভাব পোষণ করতেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়।

মুসলমানদের নতুন ভূখন্ড পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে, শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না, হযরত মোহাম্মদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পাকিস্তানীরা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশও সাধন করবে — কবি এই কল্পনাকেও কাব্যরূপ দিয়েছেন কোন কোন কবিতায়।

সিরাজুম মুনীরা (১৯৫২) প্রথম প্রকাশিত হয় তমুদ্দন প্রেস, ঢাকা থেকে। উৎসর্গপত্রের সনেটটিকে বাদ দিলে নয়টি সনেটসহ মোট ১৯টি কবিতা সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'তৌহিদী মশাল বহি চলে গেছে' যারা সেই কাফেলার নিঃসংশয় অভিযাত্রী, কবির দীক্ষাগুরু 'আলহাজ্ব মৌলানা 'আবদুল খালেক' সাহেবকে।

এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় উপজীব্য হযরত মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সত্যসন্ধানী, মানবমুখী ও সংগ্রামী জীবনের পুণ্যকাহিনী। এসব কবিতায় কবি মহৎ-জীবনাদর্শের আলোকে মানব-পথিকের

---

১. সৈয়দ আলী আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা-১৯৭০, পৃঃ১০৬।
২. হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৩, পৃঃ ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পথ নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছেন। অপরদিকে ইসলামী জীবনাদর্শ, ঐতিহ্য ও ধর্মাদর্শের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রকাশ পেয়েছে বেশ ক'টি কবিতায়। রোমান্টিক আত্মভাবনা ও বিশুদ্ধ হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'মন' , 'প্রেমপন্থী', 'অশ্রুবিন্দু' এই তিনটি কবিতায়। অর্থাৎ এ কাব্যে একদিকে ইসলাম ধর্মসাধক মহাপুরুষদের জীবনের মধ্যে ব্যক্তি জীবনে তথা জাতীয় জীবনে সে আদর্শ রূপায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজের বিশ্বাস, সে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও তার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যাবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন। বস্তুত 'সাত সাগরের' 'অভিযাত্রী' কবি 'সিরাজুম মুনীরা'য় সামাজিকের কর্তব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আদর্শ-পন্থানুসরণে মুসলিম পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষাটিকে রূপায়নের চেষ্টা পেয়েছেন। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "সিরাজুম মুনীরা'কে 'সাত সাগরের মাঝি'র স্বপ্ন-ভাবনার একটি যথার্থ আদর্শ সম্মত বাস্তব উপসংহার বলা চলে।"[১]

একাব্যের সমালোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "সিরাজুম মুনীরা'য় কবির অভিজ্ঞতা ইসলামের গৌরবময় যুগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সিরাজুম মুনীরায় জ্যোতির্লেখা যুক্ত ঝরোকায় তৌহিদী মশাল বহন করে যে যাত্রীদল চলে গেছেন তাদের পথেই কবির বিচরণ।"[২]

একাব্যে অতীত জীবন-ঐশ্বর্যের দূরায়ত কোন স্বপ্ন নয়, মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্যই কাব্যরূপ লাভ করেছে। কবি এখানে সাত সাগরের অপরূপ ঐশ্বর্যের জগতের স্বপ্নটি সামনে রেখে মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার আলোকে আধুনিক মুসলিম জীবনের পুনর্গঠন আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১) প্রথম প্রকাশিত হয় পাকিস্তান লেখক সংঘ, ঢাকা থেকে। তিন অংকে চৌদ্দ দৃশ্যে বিভক্ত এই কাব্যনাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে 'মাহে নও' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মানবতার নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত মুসলিম রাষ্ট্র গঠন তথা ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্ভব — এই সত্যটি কবি উক্ত কাব্যনাটকের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। 'কাব্য নয়', 'গান নয়', 'শিল্প নয়', 'ঘুমন্ত' সকল মানুষকে জাগাতে পারে নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী কর্মী সেবাব্রতী — একথাই ধ্বনিত হয়েছে কাব্যনাট্যের সমাপ্তিতে শায়েরের কণ্ঠে।

এ গ্রন্থের সমালোচনায় হায়াৎ সাইফ বলেন, "নৌফেল ও হাতেমে'র কাহিনী মূলত হাতেমের বীরত্ব, দানশীলতা ও সুনামের প্রতি নৌফেলের ঈর্ষা বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। হাতেম বাদশাহজাদা কিন্তু রোমান্টিক মানসিকতার অধিকারী, মধ্যযুগীয় রোমান্স কাব্যের তিনি মহৎ নায়ক। ... নৌফেল চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে হীন মানসিকতার অধিকারী অন্ধ দেশপ্রেমের পূজারী অপরিচ্ছন্ন রাজনীতির পাটোয়ারী ও এদেশের মুনাফাখোর ব্যবসায়ী রাজনৈতিক কর্মীর মনোভাব। এখানে মুসাফির সাচ্চা সচেতন নাগরিক, বৃদ্ধ সৎ নাগরিক আর মুর্শিদ প্রজ্ঞার প্রতীক। ভাঁড় চরিত্রের পরিকল্পনায় ফররুখ আহমদ সচেতন ছিলেন মনে হয়। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে গুপ্তচরটির মধ্যে সমকালীনতার আভাস আছে।"[৩]

---

১. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি ফররুক আহমদ, পৃ: ১১০
২. ড. রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭১, পৃ: ৩০।
৩. হায়াৎ সাইফ, পূর্বমেঘ, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে ফররুখ আহমদ স্বপ্নের, আদর্শের ও তত্ত্ব ভাবনার জগৎ থেকে অনেকটাই যেন সমাজকর্মীর বাস্তব ভাবনার জগতে নেমে এসেছেন। তবু মানবিক শ্রেয় ও কল্যাণের আদর্শে সুদৃঢ় আস্থাই এ কাব্যনাট্যের প্রাণবায়ু যুগিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।"[১]

ইসলামী নবজাগরণের যে স্বপ্ন কবি লালন করতেন, সে স্বপ্নের সার্থক রূপায়নের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার পরিপূরক হিসেবে এই কাব্যনাট্যের রচনা। ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে হাতেমের মতো নিঃস্বার্থ ও সেবাব্রতী মুসলমান কর্মী পুরুষের প্রয়োজন — একথাই কবি বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন। আদর্শ মানুষের প্রতি কবির আস্থা স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে এই কাব্যনাটকের শেষ ক'টি চরণে।

মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩) প্রথম প্রকাশিত হয় বার্ডস এ্যান্ড বুকস, ঢাকা থেকে। মোট একশতটি সনেট সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। পূর্বোক্ত কাব্যগুলোর মতো এ কাব্যের সনেটগুলোর মধ্যে অনেকক্ষেত্রে অতীতের প্রতি মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি, ঐতিহ্যবোধ ও আদর্শপ্রীতির উপস্থিতি সত্ত্বেও বিষয়-বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। সমকালীন যুগ, জীবন ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সুতীব্র চেতনার প্রকাশ যেমন ঘটেছে তেমনি বিশুদ্ধ হৃদয়ানুভূতির প্রকাশও ঘটেছে কোন কোন কবিতায়। এছাড়া নিসর্গ-ভাবনা, প্রেম, স্বদেশচিন্তা, ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে বেশকিছু সনেটে।

এগ্রন্থের সমালোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, " মুহূর্তের কবিতায় ফররুখ আহমদ রূপকথা আর ইতিহাসের রাজ্য থেকে কিছুকালের জন্যে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। এই সনেট সংকলনের অনেকগুলি সনেটে পরিচিত পৃথিবী পরিপার্শ্ব এমনকি বাংলার প্রকৃতিও উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।"[২]

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "এই সনেট-সংকলনের মাধ্যমে 'পাক-বাংলা' সাহিত্যের ঐতিহ্য নির্মাণ ও নির্দেশের চেষ্টা হয়েছে। 'মুহূর্তের কবিতা' পাঠে স্বাভাবিকভাবেই যে অনুভূতিটি আমাদের স্পর্শ করে তা হল এই, আদর্শানুগত্য এবং ঐতিহ্যলগ্ন হয়ে থেকে ফররুখ আহমদ যে কবি মানসটিকে গড়ে তুলেছেন মুহূর্তের জন্যে তা চরিত্রভ্রষ্ট হয়নি। ... ঐতিহ্য বোধের যে বিকাশ ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝিতে লক্ষণীয়, মুহূর্তের কবিতায় তা ব্যাপকতায় সমৃদ্ধমান।"[৩]

হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬) দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় বাংলা একাডেমী থেকে। যে জীবনাদর্শের কথা তিনি বিভিন্ন রচনায় স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে বলে আসছিলেন, হাতেম তা'য়ীর চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে তা এক সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে। কাব্যের কাহিনী নেয়া হয়েছে দোভাষী পুথি থেকে। কিন্তু প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা হয়েছে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে বহু যুগের সাধনায় যাঁরা আমাদের সাহিত্য ভান্ডার ঐতিহ্যবাহী চলতি ভাষার পুথিকে সমৃদ্ধ করেছেন সেই প্রাচীন পুথি রচয়িতাদের। এ কাব্যের প্রধান আকর্ষণ হাতেম তায়ীর চরিত্র। কাহিনী নির্মাণে কোন জটিলতা নেই। খোরাসানের খ্যাতনামা সওদাগরের কন্যা হুসনাবানু প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তার সাতটি প্রশ্নের জবাবদানকারীকে সে বিয়ে করবে। বিভিন্ন দেশের সওদাগর পুত্র, বাদশাহের পুত্ররা প্রশ্নের উত্তর দিতে এসে বিফল হয়ে অনেকেই ফিরে গেল। খরজমের শাহজাদা

---

১. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি ফররুখ আহমদ, পৃ: ১৫২।
২. ড. রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, প:ঃ ৩।
৩. মো. মাহফুজউল্লাহ, পৃ: ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর শামী হাতেমতাঈর সহায়তায় প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে হুসনাবানুকে বিয়ে করে এবং মুসাফির হাতেম তাঈ আবার পথে বের হয়ে আসে।

এমনি ঈমানের দীপ্ত শিখা ধারণ করে হাতেম তাঈ বেরিয়ে পড়ে বিশাল পৃথিবীকে সেবা করার প্রত্যয়ে। ঊর্ধ্ব পথের যাত্রী হাতেমতাঈর দুর্লভ চরিত্রের গুণাগুণ অর্জন করে যে কোন সময়ের মানুষই বীরত্ব, ত্যাগ, মানব প্রেম, সত্যানুসন্ধান, প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হতে পারে। কবি তৎকালীন যুগের মানুষের কাছে হাতেম তাঈ হিসেবে গড়ে ওঠার আহবান জানিয়েছেন। হাতেমতাঈর মতো আদর্শবাদী মানুষ দলে দলে জন্মগ্রহণ করবে বলে কবি বিশ্বাস করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯–১৯৭৫)

খুলনা জেলার সাতক্ষীরার তেঁতুলিয়া গ্রামে সিকান্দার আবু জাফর জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৯ সালের ৩১শে মার্চ। কবির পুরো নাম ছিলো সৈয়দ সিকান্দার আবু জাফর হাশেমী বখত। কবির পূর্বপুরুষ ছিলেন পেশোয়ারের অধিবাসী। পিতামহই প্রথমে পেশোয়ার থেকে খুলনায় এসে বসবাস করতে থাকেন এবং তিনি সেখানকার জমিদারের মসজিদে ইমাম নিযুক্ত হন। পিতা মঈনউদ্দীন হাশেমী খুলনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং জমিজমা দেখাশোনা করেন। দুই পিতৃব্য মূলত কলকাতায় বসবাস করেন। এদের মধ্যে জালালউদ্দীন হাশেমী ভারতীয় কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য ছিলেন। দেশবিভাগের পূর্বে তিনি ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার। তিনি বাস করতেন ১৪ নম্বর কড়েয়া রোডে। সিকান্দার আবু জাফর পিতৃব্যের সান্নিধ্যে এলে প্রগতিশীল চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হন, ফলে তিনি তাঁর নামের পদবীটুকু খসিয়ে সিকান্দার আবু জাফরে পরিণত হন।

শিক্ষার হাতেখড়ি খুলনার বি.ডি. উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শুরু হয়ে স্কুল জীবন এখানেই শেষ হয়। অতঃপর কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে এ কলেজেই বি.এ. পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেন।"[১] কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৪২ সালের দিকে তিনি কিছুদিন কলকাতার একটি সরকারী সংস্থায় চাকুরী করেন। এরপরে ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'দৈনিক নবযুগ' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। একই সময়ে তিনি 'সেনটেড কোকোনাট অয়েল' নামে নারিকেল তেলের ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ব্যবসাটি লাভজনক হয়নি। এরপর বিভিন্ন সময়ে তিনি আরো কয়েকবার বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে ষ্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরীতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এ সময়ে সৈয়দ আলী আহসানও ঐ একই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও দৈনিক সংবাদ ও ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় বিভাগে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষাআন্দোলনের উত্তাল সময়ে ঢাকাতেই তাঁর দিনগুলি কাটে। এই সময়ে তিনি 'দৈনিক মিল্লাতের' সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'সমকাল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। এই 'সমকাল' পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে 'সমকাল মুদ্রায়ণ' ও 'সমকাল প্রকাশনী' গড়ে ওঠে। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সমকাল অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হয় এবং সেকালের পূর্ববাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাসিকরূপে পরিচিতি লাভ করে। স্বাধীনতার পর সাহিত্যাঙ্গনে তিনি বেশি সক্রিয় ছিলেন না। প্রাক-স্বাধীনতা কালের কবিতা নিয়ে কয়েকটি কাব্য-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন। সে সময় ১৯৭৫ সালের ৪ঠা আগষ্ট হাঁপানী রোগে পি.জি. হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর প্রকাশিত কবিতা সংকলন হচ্ছে — 'প্রসন্ন প্রহর' (১৯৬৪), 'তিমিরান্তিক' (১৯৬৫) 'বৈরী বৃষ্টিতে' (১৯৬৫), 'কবিতা ১৩৭২' (১৯৬৮), 'বৃশ্চিক লগ্ন' (১৯৭১); এছাড়া মুদ্রিত কিন্তু অপ্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা ১৩৭৪', 'বাংলা ছাড়ো' রয়েছে। ছাত্রজীবনে প্রকাশিত হয়েছে চারটি উপন্যাস — 'মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), 'জয়ের পথে' ((১৯৪৩), 'পূরবী' (১৯৪৪), এবং 'নতুন সকাল' (১৯৪৬)। এছাড়া পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নবীকাহিনী (১৯৫১) ও আওয়ার ওয়েলথ

---

১. সিকান্দার আবু জাফর স্মৃতি সংখ্যা 'সমকাল'-এর তথ্যানুযায়ী কবি রিপন কলেজের ছাত্র ছিলেন; পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা গ্রন্থে সাঈদ উর রহমান (কবির জীবনী অংশে, পৃঃ ২৬) কবি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মিসেস জাফর জানান তিনি বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। বি.এ পরীক্ষা দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৫১), নাটক ও অনুবাদগ্রন্থ রয়েছে। সাহিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬৬ সালে নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান।

প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয় সমকাল প্রকাশনী ঢাকা থেকে। একাব্যের কবিতাসমূহ রচিত হয়েছে ১৩৪৬ থেকে ১৩৫০ সালের মধ্যে অর্থাৎ প্রাক-পাকিস্তান যুগে। মোট ২৯টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ সংকলনের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, 'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি মাটিতে শিকড় মেলে দাঁড়াতেই বেশী ভরসা পাই। সমাজের একজন মানুষ হিসেবে সেই সমাজের আর দশজনের সঙ্গে কথা বলাতেই আমার বেশী আনন্দ। অবশ্য সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের যা কিছু সাফল্য আমি তার গৌরবের অংশভাগী। কৃষ্টি-সভ্যতা-শিল্প ক্ষেত্রে মানুষের যা কিছু অবদান আমি তার অসংকোচ উত্তরাধিকারী।'

এই ক'টি কথাতেই কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। তিনি মাটির কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলেন, হতে চেয়েছিলেন সহৃদয় সামাজিক কবি। সম্ভবত, এ কারণেই সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজের নানা অসংগতি, অভিক্ষেপ ও অসন্তোষের পাশাপাশি সামাজিক মানুষের একটি আশা ও আশ্বাসের আভাসও মূর্ত হয়ে উঠেছে এ কাব্যে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তথা ব্যাপক অর্থেই পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধেই কবির তীব্র মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। এছাড়া আশাবাদ এবং নৈরাজ্যমূলক কবিতাও যেমন স্থান পেয়েছে একাব্যে তেমনি কবির অন্তর্মুখী প্রেমচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কোন কোন কবিতায়। এ গ্রন্থের সমালোচনায় বশীর আল হেলাল বলেন,"সিকান্দার আবু জাফর উচ্চকণ্ঠ কবি। তাঁর বক্তব্য ও ভাষা দুই বড় ধ্বনিময় এবং বলিষ্ঠ। ঋজু ও সাবলীল কবিতায় তিনি আপন জীবনের যত বৃত্তান্ত শোনান। জীবনকে তিনি ভালোবাসেন, কিন্তু কৃপণের ধনের মতো নয়। ভেঙে-চুরে আনন্দে-সুখে-বৈরাগ্যে তাকে ভোগ করেন। কখনো ভোগে ব্যর্থ হন। তখন বেদনা সোচ্চার বেদনা ও আর্তি তাঁর কবিতায় বার বার দেখা দেয়। তিনি পূর্ণকণ্ঠে সবকিছু বলেন এবং পূর্ণচক্ষে সবকিছু দেখেন।'[১] এ সম্পর্কে ড. মধুসূদনের মন্তব্য, 'সিকান্দার আবু জাফর তাঁর কবিতায় একালের জীবন চেতনার বলিষ্ঠ রূপদান করেছেন। ভাবাবেগ দ্বারা তাঁর কাব্য চালিত হয়নি। সাম্প্রতিক জীবনধারার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।'[২] সমালোচক আবদুল হাফিজের মন্তব্য, 'আশ্চর্য হতে হবে একথা ভেবে যে, কবি সিকান্দার আবু জাফর একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন যা চল্লিশের একজন মুসলিম কবির কাছে আশা করা যেত না। তবু চল্লিশের দশকে এরকম মুসলিম কণ্ঠস্বর ছিল, আর তাদের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফর কবিতায় ও কর্মে তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন বিশ্বস্তভাবে।'[৩]

তিমিরান্তিক (১৯৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয় সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। ১৩৫৪ সাল থেকে ১৩৬০ সালের মধ্যে রচিত মোট ৩৪টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। সমসাময়িক জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, গ্লানি, হতাশা, দিনযাপনের দুঃখ-ক্লেশ, ক্লান্তি, সমাজে ধনী-দরিদ্রের অবস্থানগত ব্যবধান, বৈষম্য, শোষকের নগ্নমূর্তি — এসবই এ কাব্যের উপজীব্য। গ্রন্থের শেষ কবিতাটি ৫২'এর ভাষা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হলেও একই সঙ্গে পরাধীন অবিভক্ত ভারতের সমস্ত হত্যাকান্ডকে স্মরণ করেছেন একুশের হত্যাকান্ডের সঙ্গে তার তুলনা করার জন্যে। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে রচিত একটি ভিন্নধর্মী কবিতায় এদেশের শাসক ও শোষিতের অভিব্যক্তি ভাষারূপ পেয়েছে। তবে সর্বহারা,

---

১. বশীর আল হেলাল, সাম্প্রতিক কবি সাম্প্রতিক কবিতা, পৃঃ ১৮
২. ড. মধুসূদন চক্রবর্তী, বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ধারা, পৃষ্ঠা-১৫২
৩. আবদুল হাফিজ, আধুনিক সাহিত্য: বিবেচনাসমূহ, পৃঃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository

নিঃস্ব মানুষের হতাশা ব্যক্ত হয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কশাঘাতে। এছাড়া কবির প্রেম ও প্রকৃতি-চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। বলা যায়, 'প্রসন্ন প্রহর' -এর মতোই এ গ্রন্থে কবির বিভিন্ন ধারার কবিতা থাকলেও পূর্বোক্ত সাম্যবাদী ধারাটি এখানে আরো পরিপূর্ণ ও পুষ্ট হয়েছে। এ সম্পর্কে কবি আবদুল গনি হাজারীর মন্তব্য, 'প্রসন্ন প্রহরে' তাঁর কবিচেতনা যে বিক্ষোভের রাত্রি উজিয়ে চলেছে, 'তিমিরান্তিক' ক্লিষ্ট নিরালোক সন্তরণ এক পরিসমাপ্তির প্রারম্ভে উপনীত।'[১] একাব্যের সমালোচনায় আবদুল হাফিজ বলেন, "প্রসন্ন প্রহরে' সবকিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নিস্পৃহ হয়ে, 'তিমিরান্তিকে' তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠলো বিদ্রূপাত্মক, বক্তব্য হলো ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ। ধীরে ধীরে তিনি জনতার সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন।"[২]

বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয় সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মোট ৯ বছরের রচনা থেকে ৩৬টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এ কাব্য। 'বৈরী বৃষ্টিতে' নামকরণের মধ্যেই গ্রন্থের মূলসুরের কিছুটা পরিচয় বিধৃত। বৃষ্টি সবসময় যে ফলপ্রসূ নয়; কখনো কখনো তা বৈরী বার্তাও বহন করে আনে — তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। তবে বৈরী বৃষ্টিতে নামকরণের মধ্য দিয়ে যে হতাশার পরিচয় পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে ততটা আশাহীন কবি নন তিনি। পূর্বোক্ত কাব্যের মতো এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় কবির প্রবল আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। তবে হতাশাব্যঞ্জক কবিতাও স্থান পেয়েছে এ কাব্যে। এছাড়া সমসাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করে গণমানুষের সঙ্গে কবির সম্পৃক্ততা আরো বেড়েছে এখানে। রাজনীতির নীতিহীনতা এবং সমাজ-জীবনের অসংগতি নিয়ে রচিত বিভিন্ন কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সঙ্গে কবির ব্যাপক আন্তরিকতা এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে একাব্যে। ঈশ্বর ভাবনা এবং প্রেম বিষয়ক কবিতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়ে রচিত কঙ্গোর মহান নেতা লুমুম্বা সম্পর্কে একটি কবিতাও রয়েছে একাব্যে। বলা যায়, একাব্যে দরিদ্র গণমানুষের প্রতি কবির সহানুভূতি যেমন হৃদয় মথিত করে উত্থিত হয়েছে তেমনি নতুন আবাসভূমি পাকিস্তান সম্পর্কেও তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, নির্যাতন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবির বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। এ গ্রন্থের সমালোচনায়, আবদুল হাফিজ বলেন, "বৈরী বৃষ্টিতে' কবির অভিজ্ঞতা আরো নতুন সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের প্রতিবেশী হয়েছে সিকান্দার আবু জাফরের বিশাল আন্তরিকতা।'[৩] এ সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য, "কালচিহ্নের দিক দিয়ে সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় একান্ত উচ্ছ্রিতি এই বর্তমান থেকে, যে বর্তমান আমাদের আজকের পটভূমির বিন্যাস মেনেছে। স্বকালচৈতন্যে উদ্যত তাঁর কবিতা উপপ্লবে সমাধান হেঁকে যায়, এবং তাঁর ধারণা কালপ্রয়োগ ঢুকিয়ে দেওয়া কবিতার একটি অবশ্য কাজ, আর তাই তাঁর কবিতার শিকড় স্বদেশে প্রোথিত, তাই তাঁর কবিতার শিকড় স্বকালে উড্ডীন।"[৪]

কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয় সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। ১৩৬৪ সাল থেকে ১৩৭২ সাল পযর্ন্ত রচিত মোট ৩২টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। একাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম সাতটির রচনাকাল ১৯৬৪ সাল আর বাকিগুলি ১৯৬৫ সালে রচিত। এগুলোর মধ্যে

---

১. আব্দুল গনি হাজারী, 'সিকান্দার আবু জাফর-কালায়নের কবি', বই (জ্যৈষ্ঠ্য - আসাঢ়-১৩৭৭), পৃ: ৯২।
২. আব্দুল হাফিজ, আধুনিক সাহিত্য : বিবেচনাসমূহ, পৃ: ২১।
৩. আবদুল হাফিজ, আধুনিক সাহিত্য: বিবেচনাসমূহ, ঢাকা ১৯৮১, প:ঃ ২২।
৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বই, ৪র্থ সংখ্যা জুন-জুলাই ১৯৭০, পৃ: ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম ২৪টির তারিখ কবি ইংরেজী সাল অনুযায়ী লিখেছেন, বাকি ৮টির তারিখ সংযোজন করেছেন বাংলা সাল অনুযায়ী। বাংলা সালের অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'কবিতা ১৩৭২'।

একাব্যে কবির সমসাময়িক জীবনবোধ, দৈনন্দিন ঘটনাবলী, বৃহৎ জনগণের প্রতি তাঁর গভীর দরদ এবং সহানুভূতি পূর্বোক্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করলেও কবির অনুভূতিসমূহ অনেকবেশি প্রগাঢ় অভিব্যক্তি পেয়েছে এতে। একাব্যে কবির প্রবল আশাবাদ জনতার সংগ্রামে রূপ নিয়েছে। এ সংগ্রামে কবি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার আকাঙক্ষা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ জনতার কবি হিসেবে সিকান্দার আবু জাফর একাব্যে অনেকবেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। সমসাময়িক নগরজীবনের রাজনৈতিক শঠতা, ধূর্ততা ও স্বার্থপরতার চিত্র, কখনো গ্রামীণ জীবনের কুটিল রাজনীতির আবর্তে পীড়িত নিঃস্ব, দরিদ্র জনসাধারণের জীবন যাত্রার অনুপুঙ্খ বর্ণনা একাব্যের সামাজচিত্র মূলক কবিতার উপজীব্য হয়েছে। রূপকধর্মী কবিতা ছাড়া কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে বেশ ক'টি কবিতা। ব্যক্তিগত তীব্র ক্ষোভ, ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, অসহায়ত্ব-প্রতিফলিত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক বেশ ক'টি কবিতা স্থান পেয়েছে একাব্যে। একাব্যের সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় বর্তমান-মনস্কতা, সমকালীন পরিবেশ চেতনা এবং দেশজ পটভূমির প্রতি জাগ্রত দৃষ্টি প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।"[১]

---

১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সমকাল, অষ্টাদশ বর্ষ, নবপর্যায় ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৮, পৃষ্ঠা: ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হোসেন (জ: ১৯২২)

খুলনা জেলার বেলফুলিয়া দেয়াড়া গ্রামে আবুল হোসেন জন্মগ্রহণ করেন ১৯২২ সালের ১৫ই আগষ্ট। পিতা এস. এম. ইসমাইল হোসেন পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। ছেলেবেলা কেটেছে কৃষ্ণনগরে, প্রথম যৌবন কলকাতায়। পড়াশোনা অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে কলেজিয়েট ও কুষ্টিয়া হাইস্কুলে, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থনীতিতে অনার্স, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে অর্থনীতির সঙ্গে পড়েছেন সমাজ বিজ্ঞান। ছাত্র বয়সে সম্পাদক ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, রবীন্দ্র পরিষদের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও বেঙ্গলী ইনষ্টিটিউট অব সোসিওলজীর গবেষণা ফেলো। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, কবিদের সংগঠন 'পদাবলী'র সভাপতি, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সংলাপ'-এর সম্পাদক (ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে) বাংলা একাডেমীর ফেলো — এদেশের শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

কর্মজীবন শুরু হয় রেডিও পাকিস্তানের কর্মসূচী নিয়ামক হিসেবে। এরপরে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন বেশকিছুকাল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের গণসংযোগ দপ্তরের পরিচালক পদে নিয়োজিত। বেশ কিছু কাল তিনি ডায়েবেটিস হাসপাতালে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারী চাকুরী সূত্রে তিনি ইউরোপ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেন বিভিন্ন সময়ে। অল্প বয়সেই লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং 'কবিতা', চতুরঙ্গ', 'নিরুক্ত', 'পূর্বাশা', 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'অরণি', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'নবযুগ', 'মাসপয়লা', 'পাঠশালা', 'রবিবার', প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রচুর লিখেছেন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নবযুগ' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। এরপর পার্বত্য পথে (ভ্রমণ বৃত্তান্ত-১৯৪৬), ইকবালের কবিতা (কাব্যানুবাদ, ১৯৫২), জ্যাক লন্ডনের 'অরণ্যের ডাক' (অনুবাদ, ১৯৫৪) বিরস সংলাপ' (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৬৯) রসুল গামজাতভের আমার জন্মভূমি (কাব্যানুবাদ, ১৯৭৮), 'হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস' (১৯৮২) 'দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে' (১৯৮৫) এবং সর্বশেষ Selected Poems of Abul Hussain (১৯৮৬) প্রকাশিত হয়।

লেখক হিসেবে বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত 'বাই অ্যানিয়েল ইন্টারন্যাশনাল অব পোয়েট্রি'তে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন ১৯৬০ সালে। ১৯৬১ তে পাক-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পাকিস্তান দলের সদস্য, ১৯৭৩ -এ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৮৩ সালে যুগোশ্লোভিয়ায় ষ্ট্রগা কবিতা উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে অতিথি-লেখক হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। ষাটের দশকে ইকবাল একাডেমীর আমন্ত্রণে একাধিকবার করাচীতে অনুষ্ঠিত ইকবালের জন্মদিনে অতিথি বক্তা ছিলেন।

সরকারী কর্মকর্তা হিসেবেও ১৯৭৪ সালে সিঙ্গাপুরে কলম্বো প্ল্যান কনসালটেটিভ কনফারেন্সে বাংলাদেশ দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে কলম্বোতে আই পি পি এফের আঞ্চলিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেণ। ১৯৮১ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশের পরিবার-পরিকল্পনা দলের

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব দেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে একাধিকবার সভা সম্মেলনে যোগ দেন।

সাহিত্যে অবদানের জন্যে দেশ ও সমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। ১৯৬৩ সালে পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার। এছাড়া সুন্দরবন স্বর্ণপদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক, একুশে পদক, পদাবলী পুরস্কার এবং জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার পেয়েছেন।[১]

নববসন্ত (১৯৪০) প্রথম প্রকাশিত হয় বুলবুল হাউজ, ২৩ ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রীট কলকাতা থেকে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরম শ্রদ্ধাস্পদকে'। একটি চমৎকার চতুর্দশপদী লিখে এই নৈবেদ্য। কবিতাটি পাঠ করলেই জানা যায় রবীন্দ্রনাথ এই তরুণ কবির রচনার সঙ্গে শুধু পরিচিত ছিলেন না, সেই তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাও লাভ করেছিলেন;

নিঃশব্দে সন্ধ্যায় বসি ধীরে তুমি করেছিলে পাঠ
প্রসাধনহীন মোর চিত্তের সে গুরু অপরাধ,
মৃদু হাসি হয়তো বা লীলাচ্ছলে, হে কবি সম্রাট
সেদিন পাঠিয়েছিলে মোরে তব স্নেহ-আশীর্বাদ। ....

মোট ৩৪টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত একাব্যে বিভাগপূর্ব-কালের জনজীবন, তার দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশা, প্রেম-প্রীতি স্বাধিকার ও সংগ্রামের চিত্র অধিকাংশ কবিতার বিষয়। কবির রোমান্টিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে কোনো কোনো কবিতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের চমৎকার প্রতিফলন ঘটেছে একটি কবিতায়। এই উপ-মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কর্ণধার স্বদেশী, বিদেশী প্রভুরা কিভাবে আমাদের দেশকে শোষণ করেছে, কারখানায় আসুরিক উৎপাদন তবু ক্ষুধার্ত শ্রমিক, মুমূর্ষু দেশের লোক কিভাবে শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে — তার আলোকেও রচিত হয়েছে একাব্যের বহু কবিতা। দীর্ঘকাল সমুদ্রের বুকে ভাসমান নাবিকের ঘরে ফেরার আকূতি নিয়ে রচিত হয়েছে একটি কবিতা।

এ গ্রন্থটি প্রকাশের পর এর সমালোচনায় গোলাম কুদ্দুস বলেন, " নববসন্তের আবুল হোসেন রোমান্টিক কবি। নব রাজন্য অনুগ্রহপুষ্ট-সমাজই হয়ত তার জন্যে কিছুটা দায়ী। কিন্তু সে সমাজের কঙ্কালসার দেহ-দর্শনে-ঋষিদৃষ্টি তো লাগে না। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির অন্ধতাই তাঁকে রোমান্টিক-সুলভ কোমলতা, এমন নরম মোহনীয় আত্মরতি এবং এমন নিরঙ্কুশ প্রেমের কুয়াশা করেছে আচ্ছন্ন" (সওগাত শ্রাবণ ১৩৫০)।[২২] এই মন্তব্যের প্রতিবাদে গ্রন্থের অপর একটি আলোচনায় রশীদ করীম বলেন, "নববসন্তের আসল মূল্য সেই আধুনিকতায় যা আবুল হোসেনের কাছে পৌঁছেছে অনেকটাই তিরিশের কবিদের কাছ থেকে; কিছুটা সরাসরি পশ্চিম থেকে। আবুল হোসেনই যে আমাদের সমাজে আধুনিক মানসিকতার প্রথম কবি, তাঁর মুষ্টি থেকে এই কৃতিত্ব ও আনন্দটুকু কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।"[৩]

---

১. তথ্য : পদ্মাবলী পুরস্কার ১৯৮৫, প্রদান অনুষ্ঠান ও কবিতা-সন্ধ্যা ব্রোশিউর, এবং কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার
২ গোলাম কুদ্দুস, সওগাত, শ্রাবণ-১৩৫১
৩. রশীদ করীম, ফেলে আসা দিন : আবুল হোসেনের নববসন্ত, উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমী, পৃ : ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বিরস সংলাপ (১৯৬৯) প্রকাশিত হয় স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা থেকে। মোট ৫০টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্থে প্রতিদিনের জীবন-ধারণের গ্লানি, প্রতিকূল ও বিমুখ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার অনাবিল আকাঙক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। রোমান্টিক অনুভবজাত উপলব্ধির কথাও কোনো কোনো কবিতায় প্রগাঢ় হয়েছে। তবে ব্যক্তিমনের পরিচর্যার চেয়ে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা-সংকট ও টানাপোড়েনের ছবি একাব্যে প্রবলভাবে উপস্থিত। মধ্যবিত্ত জীবনের খন্ড খন্ড চলচ্ছবি বেশ কিছু কবিতায় এনেছে নাগরিক জীবনের কৌতূহল ও উত্তেজনা। পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও ধ্বংস অভিযানের চিত্র বিন্যস্ত হয়েছে এখানে। একাব্যে একদিকে যেমন সমসাময়িক জীবনের অর্ন্তগত উপলব্ধির কথা আছে তেমনি দেশ ও সমাজ বাস্তবতার ঊর্ধ্বে সর্বজাতিক সমস্যা-সংকট ও সীমাদ্ধতার কথাও ব্যক্ত হয়েছে। সর্বোপরি একথা বলা যায়, ব্যক্তি প্রতিক্রিয়ায় জাগ্রত সমসাময়িক জীবন তার মনস্তত্ত্ব ও অনুসন্ধিৎসার স্বরূপ উন্মোচনে কবিদৃষ্টি একাব্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এগ্রন্থটি প্রকাশের পর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এর সমালোচনায় বলেন,"তিনি নাগরিক কবি, প্রথমত, তাঁর চিন্তায়, দ্বিতীয়ত, তাঁর ভাষায় ভঙ্গিতে, তাঁর কবিতাগুলি আকারে ছোট, ওজনে হালকা, যুক্তাক্ষর ধ্বনি-গৌরব তিনি যথাসাধ্য বাদ দিয়ে চলেন। তিনি সাম্প্রতিক জীবনের শুষ্কতা, দীনতা ও ফাঁকির কথা ভেবে কখনো বিরক্ত, কখনো একটুখানি তিক্ত, কখনো কখনো বা একটুখানি অবাধ্য।"[১]

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "আবুল হোসেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিরস সংলাপ' এর বিভিন্ন কবিতায় রয়েছে জীবনপ্রীতি। জীবন-প্রেমিক আবুল হোসেন প্রধানত, মধ্যবিত্ত মানসের ও জীবন সমস্যার রূপকার হলেও বৃহত্তর দেশ এবং সমাজ-জীবনের সংকট, সমস্যার চিত্র তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে। এসব সমস্যা সংকট ও জীবন-ধারণের গ্লানি ফুটিয়ে তুলতে গিয়েও তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং ঠাট্টা কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছেন।"[২]

ড. রফিকুল ইসলামের বিশ্লেষণ, "আবুল হোসেন হৃদয়ের আবেগকে কাব্যে রূপান্তরিত করেন কদাচিৎ অধিকাংশ সময়ই তিনি জীবনের গ্লানি আর পরাজয়কে তার খন্ড, ক্ষুদ্র অথচ নিরবচ্ছিন্ন ট্র্যাজেডিকে কবিতায় রূপায়িত করেন।"[৩]

ড. মধুসূদনের মন্তব্য, "তাঁর কবিতার মধ্যে একটি স্বচ্ছ সমাজ-সচেতন মন আমরা অতিসহজেই আবিষ্কার করতে পারি, মানুষের সভ্যতার উত্তরণে তিনি বিশ্বাসী, সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা তাঁর কবিতার মুকুরে ছায়া ফেলে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে তিনি রূপ দিতে চেষ্টা করেন জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণাকে আগামীকালের গর্ভে যে বিজয় নিহিত, সংগ্রাম করে সেই বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে, তার কথা বলেন আবুল হোসেন।"[৪]

---

১. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, পূর্বমেঘ, ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা-১৩৭৭, পৃঃ ৭৮
২. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পঁচিশ বছরের কবিতা, উত্তরাধিকার, পৃঃ ১৯৬।
৩. ড. রফিকুল ইসলাম, কবিতার কথা, পৃঃ ৩৪
৪. ডঃ মধুসূদন চক্রবর্তী, পূর্ববঙ্গের কবি ও কবিতা, পৃঃ ২০২

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম – ১৯২২)

সৈয়দ আলী আহসান ১৯২২ সালের ২৬শে মার্চ যশোর জেলার আলোকদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আলী হামেদ এবং মাতা সৈয়দা কমরুন্নেহার খাতুন পরস্পর চাচাতো ভাই-বোন ছিলেন। পূর্ব-পুরুষ হযরত শাহ আলী বাগদাদী বর্তমান মীরপুর মাজারে সমাধিস্থ। পরিবারে আরবী ও ফারসী ভাষার ব্যাপক চর্চা ছিলো। শিক্ষাজীবন শুরু হয় ধামরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এর কিছুদিন পরে ১৯৩১ সালে ঢাকার আর্মানিটোলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯৩৮ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ পাশ করার পর কলকাতার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা এবং ১৯৪৫ সালে কলকাতা অল ইন্ডিয়া রেডিওর সহকারী কর্মসূচী নিয়ামক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৬ সালে কমর মশতরী বেগমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরই ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এরং ঢাকা বেতারে কিছুকাল কার্যরত থাকেন। ১৯৪৯ সাল থেকে '৫৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত ঢাকায় বাংলা একাডেমীর পরিচালক ও ১৯৬৬ সালে নব প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু পর্যন্ত এই পদেই কর্মরত ছিলেন। ১৯৭২ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ২৮তম পি-ই-এন কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত ২৯তম পি-ই-এন কংগ্রেসে যোগদান শেষে ফিলিপিনস্ সফর করেন এবং ম্যানিলায় ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপিনস-এ বক্তৃতা করেন। ১৯৫৯ সালে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টে অনুষ্ঠিত ৩০তম পি-ই-এন কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালের জুন মাসে বার্লিনে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৬১ সালে ফরেন লীডার প্রোগ্রামে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সেমিনারে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে ডিসেম্বর মাসে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে মে মাসে টোকিওতে অনুষ্ঠিত পুস্তক প্রকাশনা বিষয়ে ইউনেস্কো সেমিনারে ইউনেস্কো কর্তৃক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালের আগষ্ট মাসে এডিনবরায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সম্মেলনে যোগদান করেন।

"১৯৩৭ সালে স্কুল-ম্যাগাজিনে The Rose নামে ইংরেজীতে একটি কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি মতিউল ইসলাম এ কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করে 'চাবুক' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।"[১] প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'চাহার দরবেশ' (১৯৪৫), 'অনেক আকাশ' (১৯৫৯), 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' (১৯৬৪), 'সহসা সচকিত' (১৯৬৫), 'উচ্চারণ' (১৯৬৮), 'আমার প্রতিদিনের শব্দ' (১৯৭৩)। এছাড়া গবেষণা গ্রন্থ : কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ সং-১৯৭৪) কবি মধুসূদন : কাব্যকৃতি ও কাব্যাদর্শ (১৯৭১), নজরুল ইসলাম (১৯৭৬), 'পদ্মাবতী (১৯৬৮), 'মধুসূদনের বীরাঙ্গনা' (১৯৬৯), 'আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০), 'মধুমালতী' (১৯৭১), রবীন্দ্রনাথ: কাব্য বিচারের ভূমিকা (১৯৮৩) কবিতার কথা (১৯৫৭) প্রকাশিত হয়েছে। বেশ ক'টি অনুবাদ গ্রন্থও আছে।

---

[১] সৈয়দ আলী আহসান, সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী, সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ, পৃ: ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৮ সালে। মৌলিক গবেষণার জন্যে দাউদ পুরস্কার (১৯৬৯) পান, এছাড়াও একুশে পদক (১৯৮৩) নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮৫), মাইকেল মধুসূদন কবিতা পুরস্কার (১৯৮৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৭), ইসলামী ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৮) পেয়েছেন।

চাহার দরবেশ (১৯৪৫) কাব্যগ্রন্থে পুথিসাহিত্যের নবরূপায়নের প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চারজন দরবেশের জীবন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত এ গ্রন্থের কবিতাটি ছয় পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব ও শেষ পর্বে চারজন দরবেশ সমস্বরে কথা বলেছেন, মাঝের চারটি পর্বে একজন করে দরবেশের বক্তব্য দেয়া হয়েছে। কবিতার কাহিনী নেয়া হয়েছে দোভাষী পুথি থেকে। তবে কাব্য নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে কাব্যসমগ্রের ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন, "কাব্য নির্মাণ কৌশলের মধ্যে আমি টি. এস. এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর অনুসরণ করেছিলাম। ওয়েষ্ট ল্যান্ড-এ যেমন আরম্ভ থেকে দীর্ঘ যাত্রাপথে উষরতা, রুক্ষতা এবং বন্ধ্যাত্ব এবং পরিশেষে সম্ভাব্য সৃষ্টির অঙ্কুরোদগম, তেমনি চাহার দরবেশ কবিতায় আমি অসহায়তা, বঞ্চনা, এবং হাহাকারের শেষে একটি আশ্বাস এবং সজীব জীবনের পরিচয় আনবার চেষ্টা করেছিলাম। ...একটি রোমান্টিক আবহের মধ্যে আবর্তিত হয়ে শব্দকে ছন্দ ও অলঙ্কারের চাতুর্যে চঞ্চল করেছি, কিন্তু আমার নিজস্ব বক্তব্য মূর্ত করতে পারিনি। তাই এ কবিতাটি আমার বিচারে কোন কাব্যগত সিদ্ধির পরিচয় বহন করে না।"[১]

ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর অনুসণে যে প্রচেষ্টা গ্রহণের কথা কবি ভেবেছিলেন, বলা বাহুল্য, এ কাব্যে তা সফল হয়নি। ব্যর্থতার কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেছেন, "চাহার দরবেশ পুথির কাহিনীকে তিনি অনেকটা রিটোল্ড করেছেন, অর্থাৎ তাঁর হাতে প্রাচীন পুথির কাহিনীটি নতুন কোন প্রতীক বা রূপকার্থ লাভ করেনি — আধুনিক ভাষা ও আঙ্গিকে কাহিনীটি পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে মাত্র।"[২] এ গ্রন্থ সম্পর্কে "আধুনিক কবিতা" সংকলনের ভূমিকায় ড. রফিকুল ইসালম বলেছেন, "এক সময় সৈয়দ আলী আহসান পুথির ঐতিহ্যকে আধুনিক কাব্যকলায় রূপান্তরে উৎসাহী ছিলেন, যে নিরীক্ষার ফল কবির চাহার দরবেশ।"[৩]

অনেক আকাশ (১৯৫৯) প্রথম প্রকাশিত হয় বার্ডস এ্যান্ড বুকস, ঢাকা থেকে। মোট ২৩টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্থে কবির ব্যক্তিগত জীবন-ভাবনা কাব্যরূপ পেয়েছে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভাবানুভূতি, ভাবনা-বেদনা, কামনা-বাসনা, রূপ ও সৌন্দর্য তৃষ্ণা, দেহ-সম্ভোগের বাসনা এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতাও অনেক কবিতার বিষয় হয়েছে। জীবনের অনাবিল, অকৃত্রিম, অনাবৃত যে জৈবিক আবেগ, ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতি সেই আদিম রূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে চর্যাপদের অনুষঙ্গ এসেছে এর কোন কোন কবিতায়। দেহ সম্ভোগের ভেতর দিয়ে মৃত্যু চিন্তার অভিনব প্রকাশও ঘটেছে এ কাব্যের কবিতায়। এ গ্রন্থের সমালোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "অনেক আকাশে' সৈয়দ আলী আহসান জীবনের যে নতুন স্বাদ অন্বেষণ করেছেন যে অভিজ্ঞতার আশ্রয় পেতে চেয়েছেন সে স্বাদ রক্তিম আবেগের ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতির এক উত্তপ্ত চেতনার।"[৪]

---

১. সৈয়দ আলী আহসান, কাব্যসমগ্র, লালন প্রকাশনী, ঢাক, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৭৪, প্রঃ ১৭।
২. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃঃ ২১৬।
৩. ডঃ রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, পৃঃ ৩৫।
৪. আধুনিক কবিতা, পৃ: ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মধুসূদন চক্রবর্তী এ গ্রন্থের সমালোচনায় বলেন, 'অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসান কবি হিসেবে স্বস্তি পাননি — অনেক প্রশ্ন, অনেক দায় এসে গেছে, আত্মসমীক্ষার আয়োজন, অনেক ক্ষেত্রে কবিতাগুলি একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি আবেগ ও বাধা নিষেধের দ্বন্দ্ব-দায় সমাকীর্ণ।'[১]

বলা যায়, এ গ্রন্থের কবিতাগুলির মুখ্য উপজীব্য প্রেম বা প্রেমের শরীরী আবেগ।

একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪) প্রথম প্রকাশিত হয় নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা থেকে। মোট ২৮টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য প্রেম ও প্রকৃতি। প্রকৃতির সংস্পর্শে প্রেমের বস্তুনিষ্ঠ রূপ বা অবয়ব এখানে দেহ থেকে হৃদয়ে, চেতনায়, অনুভূতিতে পরিব্যাপ্ত। নিসর্গ চেতনার পাশাপাশি স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি এ কাব্যে স্বদেশকে আবিষ্কার করেছেন, সৃজন করেছেন নিসর্গ শোভার মধ্যেই। আন্তর্জাতিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতাও প্রতীকায়িত হয়েছে কয়েকটি কবিতায়। বাঙালী মুসলমানের প্রধান উৎসব ঈদ এবং শিল্পের প্রতীক 'রবীন্দ্রনাথকে' স্মরণ করে আরো দু'টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে একাব্যে।

একাব্য সম্পর্কে ড. রফিকুল ইসলামের মন্তব্য, "প্রকৃতিই 'একক সন্ধ্যায় বসন্তে'র একক নায়ক নয়, 'অনেক আকাশে'র রক্তিম আবেগ এখানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আরও বৈচিত্র্য লাভ করলো। সহজ কথায় বলা যায়, প্রথম গ্রন্থের কবিতাগুলোর মুখ্য উপজীব্য প্রেম বা প্রেমের শরীরী আবেগ আর দ্বিতীয় গ্রন্থের আবেগ প্রেম ও প্রকৃতি।"

ডঃ মধুসূদন চক্রবর্তীর মন্তব্য, " 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যে সৈয়দ আলী আহসান অপরূপ স্ফূর্তি লাভ করেছেন, নিজের পথ পেয়ে গেছেন, আশ্চর্য সজীব সুন্দর সাবলীল চিত্র অঙ্কন করেছেন স্বদেশের শ্যামলিমার। নিসর্গ চেতনা প্রেম ও প্রকৃতি ঘিরে আবর্তিত, ধ্বনি ও সুর মূর্ছনায় অনবদ্য, উচ্চকিত; বলতে পারা যায়, 'অনেক আকাশ'-এর জৈবিক আবেগ 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যে প্রকৃতির আশ্রয়ে গ্রহণ করে স্বস্তি পেয়েছে, প্রকৃতি ও প্রেমের স্বাদু মিলন ঘটেছে; দেহ থেকে হৃদয়ে, চেতনার অনুভূতিতে কবির প্রেম প্রসারিত হয়েছে।..... বিষয়, বক্তব্য ও প্রকাশ ভঙ্গির সুন্দর সুষ্ঠু সংগত যোগাযোগ ঘটেছে।"[২]

সহসা সচকিত (১৯৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয় বইঘর, চট্টগ্রাম থেকে। এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়, "যে আমি আমার আমি"– রবীন্দ্রনাথকে। উন্মোচনী কবিতাসহ মোট ৩৩টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্থে কবির অন্তর্মুখী ভাবানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। এখানে পুনরায় দেহ-সম্ভোগের বিচিত্র অনুভূতি কাব্যরূপ পেয়েছে। একটা আবেগ সঞ্চরমান নামহীন কবিতাগুলির মধ্যে বেদনা পরিতৃপ্তি, সংশয় ও বিষাদের বিচিত্র বর্ণের সমারোহ নিয়ে উপস্থিত। তবে তা একান্তই ব্যক্তিনির্ভর। এ কাব্যে তিনি এ বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন যে, দেহবাসনা হারিয়ে নির্বাণ লাভের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জনের কামনা যে করে, সে সুন্দরের বা আনন্দের প্রতিভূ হতে পারে না, বরঞ্চ সর্বক্ষণ আকাঙ্ক্ষা ও কামনার মধ্যে জাগ্রত ও সচল থাকাতেই জীবনের চরিতার্থতা নিহিত। এ গ্রন্থের বিশ্লেষণে ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "সহসা সচকিত' গ্রন্থে কবির যে আবেগ কবির চেতনা আর অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যে আবেগ বেদনার, পরিতৃপ্তির, সংশয়ের বিচিত্র বর্ণে রাঙা। এ আবেগকে কেন্দ্র করেই কবি

---

১ পূর্ববঙ্গের কবি ও কবিতা, পৃ: ১৯৪।
২ পূর্ববঙ্গের কবি ও কবিতা, পৃঃ ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের অর্থ খুঁজেছেন, তাঁর অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ণয় করতে চেয়েছেন।"[১] আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য, "শরীরী সম্ভোগেও তাঁর হৃদয় যে সতত জাগ্রত থাকে, তার প্রমাণ সহসা সচকিতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরিত হয়ে আছে।"[২]

উচ্চারণ (১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয় আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা থেকে। এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'শাহেদ সোহরাওয়ার্দী স্মরণে'। মোট ৮৪টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ কাব্যে কবির নিজস্ব জীবনদর্শন এবং জীবন-জিজ্ঞাসা কাব্যরূপ পেয়েছে। পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থের মতো এ কাব্যেও সমকালীন জীবনের কোন সমস্যা, সংকট, সংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়নি। চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আমাদের জীবন যে সব সমস্যায় জর্জরিত তা আলী আহসানের কবিতায় বিশেষ ছাপ ফেলেনি। স্বদেশ কবির কাব্যে নিসর্গ-সৌন্দর্যেই উদ্দীপিত, রূঢ় বাস্তবের অভিঘাতে নয়। সমকালীন জীবনের সমস্যা বা সংকটকে তিনি কাব্যরূপ কেন দেননি সে সম্পর্কে এ গ্রন্থেই স্পষ্ট ঘোষণা : "আমার চিন্তায় বর্তমান বলে কোন বস্তু নেই।"[৩] (উচ্চারণ-৭)। অর্থাৎ কবি যে নিজস্ব ভাবরাজ্যে বিচরণশীল তা স্থান-কাল-নিরপেক্ষ।

এ গ্রন্থের সমালোচনায়, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, "উচ্চারণ' বর্তমান দশকের একটি শ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক কবিকর্ম। লক্ষ্য করলে ধরা যায় যে, সৈয়দ আলী আহসান 'চাহার দরবেশ' থেকে 'সহসা সচকিত' পর্যন্ত তাঁর সমগ্র কাব্য ধারায় বারবারই আপন কাব্য পরিবেশের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে একটা ভিন্ন পরিমন্ডলে পর্যটন করেছেন, ইকবাল এবং ইভান গল-এর অনুবাদ কর্মে নিবিষ্ট থেকেও আত্মতৃপ্তির ছায়ানুসরণ করেছেন, তিনি নিজেকে প্রবাসীর মত ভেবেছেন সমগ্র পথ-পরিক্রমায়। 'উচ্চারণে' তাঁর অবচেতন মনের সেই সব সূক্ষ্ম চারিত্র্য সমূহের শেষ বর্ণাঢ্য পৃষ্ঠাগুলি যেন ইচ্ছাপূর্বক খুলে দিলেন।"[৪]

---

১ আধুনিক কবিতা, পৃ: ৩৮,৩৯।
২ আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ, পৃ: ২৫৯।
৩ সৈয়দ আলী আহসান, কাব্যসমগ্র, পৃঃ ১৯৩।
৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উচ্চারণ প্রসঙ্গ, সৈ. আ. আ. সংবর্ধনা গ্রন্থ, পৃ: ২৬৪-২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

সানাউল হক (জন্ম: ১৯২৪ – ১৯৯৩)

কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সানাউল হক জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি। পিতা খান বাহাদুর শহুদুল হক ছিলেন খ্যাতনামা আইনজীবী।

সানাউল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থ শাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪৫ সালে। কিছুকাল শিক্ষকতা করে ১৯৪৯ সালে যোগ দেন সিভিল সার্ভিসে এবং ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৭৩ সাল থেকে পরবর্তী তিনবছর তিনি ছিলেন বেলজিয়ামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। শিক্ষার উদ্দেশ্যে ও সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে ঘুরেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। ইংল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, তুরস্ক, ফ্রান্স, ইতালী এবং আরো অনেক দেশে তিনি গিয়েছেন। যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পান 'সিতার-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব।

বেশ কিছুদিন অবসর জীবন যাপন করে বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ হয়ে ১৯৯৩ সালে ইন্তেকাল করেন।

সাহিত্যপ্রীতি তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। আই. এ. পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। কবিত্ব শক্তির স্ফূরণ ঘটে ছাত্রাবস্থায়। পরবর্তীকালে কবিতা-ছড়া, ভ্রমণ কাহিনী, গল্প, অনুবাদ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নদী ও মানুষের কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এরপরে 'সম্ভবা অনন্যা' (১৯৬২), 'সূর্য অন্যতর' (১৯৬৩), 'বিচূর্ণ আর্শিতে' (১৯৬৮) এবং কাব্যানুবাদ 'বরিস পাস্তারনাকের কবিতা' (১৯৬৪) ইভান গলের প্রেমের কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে।

সাহিত্যে পুরস্কার পেয়েছেন একাধিকবার। কবিতার জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৪ সালে। ভ্রমণ কাহিনীর জন্যে ইউনেস্কো পুরস্কার পেয়েছেন ঐ ১৯৬৪ সালেই। ছড়ার জন্যে ১৯৬৮ সালে ইউনাইটেড ব্যাংক পুরস্কার লাভ করেন।

নদী ও মানুষের কবিতা (১৯৫৬) প্রথম প্রকাশিত হয় ওয়াসী বুক সেন্টার, ঢাকা থেকে। বাংলা ১৩৪৬ সাল থেকে ১৩৬০ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতাসমূহ এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। মোট ৩৯টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ কাব্যের কবিদৃষ্টি মূলত মানুষ ও প্রকৃতি প্রেমে আচ্ছন্ন। বিষয় ভিত্তিক একাব্যে দু'ধরনের কবিতা লক্ষ্য করা যায় — প্রথম শ্রেণীর কবিতা ঐ সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে রচিত। দাঙ্গা, মন্বন্তর ও দেশ বিভাগ জনিত কারণে মনুষ্যত্বের অবমাননা এই পর্যায়ের কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা দেশের নির্বিশেষ মানুষ ও প্রকৃতি ভিত্তিক। দেশকে ও দেশের মানুষকে আবিষ্কার করা ও নিজের চেতনায় তাকে অনুভব করার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে এখানে। ছায়া-সুশীতল গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের যে ছবি কবির বাল্যকালের মনে চিরকালের জন্যে স্বপ্নিল আবেশ নিয়ে মুদ্রিত হয়ে গেছে — স্বভাবতই কবি এখানে সেই অন্তর্জগতের বাতায়ন খুলে দিয়েছেন। কবির বাল্য-কৈশোর কেটেছে তিতাসের তীরে-তীরে। নদী যেমন গতি-পথের দু'ধারের জনপদকে শ্যামলতা দান করে, জীবজগৎকে তৃষ্ণার জল জোগায়, কবিও খুঁজছেন নদীর স্বভাব-বিশিষ্ট মানুষকে, যার মন নিত্য সচল, জনজীবনমুখী ও প্রীতিমমতায় স্নিগ্ধ। হাসান হাফিজুর রহমান এ গ্রন্থের সমালোচনায় বলেন, "সানাউল হকের কবিতার উপজীব্য ব্যাপকতর অর্থে স্বদেশ, স্বকাল এবং

Dhaka University Institutional Repository

স্বজাতি।'[১] ড. রফিকুল ইসলামের মন্তব্য, "সানাউল হকের কবিদৃষ্টি মূলত মানুষ ও প্রকৃতি প্রেমে আচ্ছন্ন। সে মানুষ ও প্রকৃতির সত্তা অবিচ্ছিন্ন। সানাউল হককে শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের গীতি-কবিদের আধুনিক সংস্করণ বলা যেতে পারে। ..... নদীর হৃদয় সদৃশ মানুষের সে অন্বেষা কবির প্রথম কাব্য সংকলন 'নদী ও মানুষের কবিতা'য় লক্ষ্য করা যায়।"[২]

সম্ভবা অনন্যা (১৯৬২) প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। মোট ৫০টি সনেট নিয়ে গ্রন্থিত এ সংকলনের উৎসর্গপত্রে বলা হয়, ' সম্ভবা রয়েছে কেউ / তারি জন্যে , হে অনন্যে রাত জেগে রই'। এ গ্রন্থের সবগুলি সনেট কবির পশ্চিম ইউরোপের প্রবাস-জীবনে রচিত। কবি বৈদেশিক কর্ম চাঞ্চল্যের মধ্যেও তার গ্রামবাংলার স্নিগ্ধ রূপের ধারণাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। দূর থেকে দেখায় সৌন্দর্যের যে সামগ্রিকতা আসে, তা এ কাব্যের কোনো কোনো সনেটে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পশ্চিমী ও বাঙালী জীবনের ব্যবধানজনিত যে বেদনা ও যন্ত্রণা অত্যন্ত তাৎক্ষণিক হলেও এ কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্ব প্রকৃতি ও কবিমানসী পরস্পর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে কবি-প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছে। এ দু'য়ের সমবায়ে বিচিত্র প্রকৃতির রূপরাশি ও প্রেয়সীর হৃদয়-ভরা প্রীতি-ভালোবাসা আগামীতে কোনো অনন্যার জন্ম-সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করবে বলেই কবি আশা পোষণ করেন।

এই কাব্যের সমালোচনায় ড. মধুসূদন চক্রবর্তীর মন্তব্য, "সম্ভবা অনন্যা'য় কবি অকৃপণভাবে তাঁর তুলিকায় নানান দৃশ্যের অনুভববেদ্য আল্পনা এঁকেছেন। রোমান্টিক কবি চেয়েছেন দেশ ও বিদেশের ভৌগোলিক বিভাজন দূর হয়ে যাক, শান্তি ও মিলনের সুর ঝংকৃত হোক।"[৩]

সূর্য অন্যতর (১৯৬৩) প্রথম প্রকাশিত হয় সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। মোট ২৫টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। কবিতাগুলি 'প্রকৃতি, প্রেম, পৃথিবী'-এই তিনখন্ডে বিন্যস্ত। স্বদেশের ভূপ্রকৃতি, তার সম্পদ ও সৌন্দর্য, জগৎ ও জীবনের শিরায় শিরায় ষড়ঋতুর বিচিত্র প্রভাব একাব্যের বিভিন্ন কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে তিনি তাঁর মনের অবাধ সঞ্চরণের উপযোগী একটি ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছেন যেটা বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য, যার মধ্যে আবার কবির দেখা তিতাসই প্রধান। ফলে স্মৃতিময় তিতাস নদীর দুই ধারের সচল জীবনধারার বৈচিত্র্য, ষড়ঋতুতে প্রকৃতির নব নব সাজ, প্রকৃতির ক্লান্তিহীন চিত্র-পরম্পরা অঙ্কন করে তিনি স্বদেশকে উপস্থাপিত করেছেন এবং তার মাধ্যমে স্বদেশের প্রাণের সন্ধান করেছেন একাব্যের অধিকাংশ কবিতায়।

প্রকৃতির গুরুত্ব কবির কাছে মূল্যবান হলেও মানুষের গুরুত্ব অধিক। প্রাকৃতিক পৃথিবীতে প্রচুর সমারোহ আছে আকাশে, পাহাড়ে, নদীতে ও পত্রপল্লবে. কিন্তু তারো থেকে মহীয়ান মানুষ, মানুষের মন। মানুষের এই মনকে তিনি আবিষ্কার করেছেন অনেক কবিতায়। এ গ্রন্থের সমালোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'সূর্য অন্যতর' গ্রন্থে কবিমানস তার শৈশবাবধি পরিচিত নদী তিতাসে নিমজ্জিত। রবীন্দ্রনাথের যেমন 'পদ্মা' সানাউল হকের তেমন 'তিতাস'।[৪]

---

১. হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃঃ ২৭৭।
২ আধুনিক কবিতা, পৃঃ ৪৭।
৩. পূর্ববঙ্গের কবি ও কবিতা, পৃ: ১৯০।
৪ আধুনিক কবিতা, পৃঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিচূর্ণ আর্শিতে (১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয় সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। মোট ৪১টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। এ কাব্যে নদীর আবেগকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন কবি। শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের সহজ সরল রূপায়ণ এখানে লক্ষণীয়। এ ছাড়া স্বদেশ, স্বসমাজ তথা মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

একাব্যের সমালোচনায় সৈয়দ আলী আহসান বলেন, "সানাউল হক দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সকল বস্তুকে সর্বাংশে যথাযথভাবে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি অবিকল যে দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যে অনুভূতিতে বিচলিত হয়েছেন, সে দৃষ্টিকে শব্দে নির্ণিমেষ করতে চেয়েছেন এবং সে অনুভূতিকে পাঠকের চিত্তে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।"[১]

ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "বিচূর্ণ আর্শিতে'ও দেখা যায় নদী কবিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।... সানাউল হকের অভিজ্ঞতা স্বদেশ ও প্রবাস যেখান থেকেই উৎসারিত হোক না কেন মূর্ছনার বিদ্যুৎ ছোঁয়ায় তার মধ্যে উচ্ছল প্লাবন সৃষ্টি করেনি। তিতাসের শীতল পার্থিব রূপই কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, কবির তিতাসে ঝড় ওঠেনি কখনো।'[২]

---

১. সৈয়দ আলী আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গ, পৃঃ ১১৫।
২. আধুনিক কবিতা, পৃ, ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল গনি হাজারী (১৯২১–১৯৭৬)

পাবনা জেলার সুজানগর থানার নয়াগ্রামে আবদুল গনি হাজারী জন্মগ্রহণ করেন। 'বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি' গ্রন্থে হাজারীর জন্মসাল বলা হয়েছে ২৯শে জানুয়ারি ১৯২৫ সাল।"[১] কিন্তু হাজারীর মৃত্যুর পর আবদুল মান্নান সৈয়দ রচিত 'আবদুল গনি হাজারী' পুস্তিকায় কবির প্রকৃত জন্ম সাল ১২ই জানুয়ারি ১৯২১ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। যেহেতু লেখক পারিবারিক সূত্র থেকে এ তথ্য দিয়েছেন সেহেতু আবদুল গনি হাজারীর জন্ম তারিখ হিসেবে এটিই নির্ভরযোগ্য। পিতা ইজ্জত উল্লাহ হাজারীর আদি পূর্বপুরুষ দোস্ত মোহাম্মদ। ইনি দিল্লী থেকে এসেছিলেন; বিবাহাদি করে এখানেই তাঁর বংশ বিস্তার ঘটে। আবদুল গনি হাজারীর এক দাদা (পিতামহ) ফজল হাজারী কবিত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বাংলা ও ফারসী মিলিয়ে তাদের বংশপঞ্জিকে বেঁধেছিলেন ছন্দ-মিলে। তাঁর বিবেচনা অনুসারে দিল্লী থেকে প্রাপ্ত এঁদের পাঁচহাজারী মনসবদারী কোনো এক পুরুষের অযোগ্যতায় এক হাজার মনসবদারীতে নেমে আসে। তখন অনেকে পরিহাস করে এঁদের হাজারী বলতেন। এভাবেই তাদের নামের সঙ্গে হাজারী উপাধি যুক্ত হয়।'[২]

নয়া গ্রামেই হাজারীর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল উদয়পুর প্রাইমারী স্কুলে। এরপর পাবনার খলিলপুর হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন ফরিদপুরের হাবাশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই স্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে আই. এ. ভর্তি হন ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে। আই. এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে দর্শনে বি. এ. অনার্স পাশ করেন। এম. এ.-তে ভর্তি হন — কিন্তু মায়ের মৃত্যুর কারণে লেখাপড়া আর শেষ করেননি। বিভাগ-পূর্বকালের নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্রফ্রন্টের উদারনৈতিক দলের সঙ্গে ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।

কলকাতার সাপ্তাহিক 'আলোড়ন'[৩] সম্পাদনা-প্রকাশনার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। হাজারী খুব সম্ভবত, ১৯৪৮ সালে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৪৮ সালেই তিনি ঢাকায় জুবিলী প্রেসে সহকারী ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। তারপর ১৯৪৯ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকায় প্রথমে সহকারী বিজ্ঞাপন ম্যানেজার এবং ১৯৬৪ সালে প্রেস ম্যানেজার হন। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি 'দৈনিক সংবাদ'-এ সহকারী জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন, একই সঙ্গে তিনি সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনাও করতেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ইস্টার্ন নিউজ ট্রাস্ট অব পাকিস্তান-এর ট্রাস্টি অব ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে হাজারী 'পাকিস্তান অবজার্ভার', 'পূর্বদেশ' ও 'চিত্রালীর' ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৬৭ সালে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় চাকুরী ছেড়ে কিছুকাল ব্যবসা করেন। ১৯৬৯ সালে পুনরায় অবজার্ভারে যোগ দেন। এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই কাজে নিয়োজিত থাকেন। স্বাধীনতার পর সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থা ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সাহিত্য ও চিত্রকলা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। "১৯৬৮ সালে সিলোনে, "এশিয়ান নিউজ পেপার কনফারেন্সে", ১৯৭৩ সালে নয়া দিল্লীতে "ওয়ান এশিয়া কনফারেন্স" অব প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া, ১৯৭৪

---

১. বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ: ১৭।

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুল গনি হাজারী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৯, পৃ: ১।

৩. 'আলোড়ন', (পিপলস পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র) প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। ২৩শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার (১৯৪৭) প্রতি সংখ্যা; দুই আনা। সম্পাদক; আবদুল গনি হাজারী। আনওয়ার হোসেন কর্তৃক পিপলস পার্টির পক্ষে আজাদ প্রেস, ৪৯ গার্ডেনার লেন হইতে মুদ্রিত ও ৮৪ বি পার্ক ষ্ট্রীট, কলকাতা হইতে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

সালে টোকিওতে "ইউনেস্কোর" এক্সপার্ট অফ পিরিডিওক্যাল প্রেস ইন এশিয়া বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়াও তিনি ইউ. কে. ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইউ.এস.এ, জাপান, ফিলিপাইন সফরে যান। অবসর সময়ে ছবি তুলতে এবং বাগান করতে ভালবাসতেন।

সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে দেশের উত্তর জনপদ, রাজশাহী থেকে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা 'বার্তা' প্রকাশনার ব্যাপারে জড়িত ছিলেন এবং নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তার মূল্যবান জীবন ৫২ বছর বয়সে ১৯৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অন্তিম শয়নে পতিত হয়।'[১]

তাঁর প্রকাশিত কাব্য সংকলন তিনটি : "সামান্য ধন" (১৯৫৬), "সূর্যের সিঁড়ি" (১৯৬৫), "জাগ্রত প্রদীপ" (১৯৭০)। এছাড়া "কালপেচাঁর ডায়েরী" (১৯৭৬), প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় কাব্যের "কতিপয় আমলার স্ত্রী" কবিতার জন্যে তিনি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্থা পি-ই-এন কর্তৃক পুরস্কৃত হন এবং সামগ্রিকভাবে কবিতার জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৭২ সালে।

সামান্য ধন (১৯৫৯)[১] মোট ২৬টি কবিতা নিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। অর্ধবিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানস সংকট, বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোবেদনা, এবং শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের চিত্র একাব্যের প্রধান উপজীব্য। নগর জীবনের পাশাপাশি তাই বাংলার গ্রামজীবনের নিপীড়িত মানুষের আলেখ্য নির্মাণে কবির অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় মেলে। স্বদেশ চেতনা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশে যুগের জীবন-যন্ত্রণার কথা, হতাশা ও অসহায় অবস্থার কথাও রূপ পেয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। গ্রন্থটির সমালোচনায় হাসান হাফিজুর রহমানের মন্তব্য, "পারিপার্শ্বিক জীবনকে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়ত্ববোধ আর পাশাপাশি সচ্ছল জীবনের নিঃসঙ্গ উচ্ছৃঙ্খলা কবিকে চকিত করেছে। এবং কবি প্রধানত বর্তমান নাগরিক জীবনের অসঙ্গতি অনুধাবন করে তাঁর কাব্যবস্তু আহরণ করেছেন।"[২]

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অপর এক সমালোচনায় বলেন, "আবদুল গনি হাজারী সমকালীন জীবনধারা-সচেতন কবি। তিনি লক্ষ্য করেছেন, নিরন্তর উচ্চাশা ও আকাঙক্ষার সঙ্গে সংগতির অসদ্ভাব এই মধ্যবিত্ত মানসিকতার সমগ্র সমাজদেহ পীড়িত। কবি তাই একদিকে স্বয়ং আর্তকণ্ঠ অন্যদিকে ব্যঙ্গ-প্রখর। সর্বোপরি বিশিষ্ট মনোভঙ্গি বশতই তিনি আশাবাদী।"[৩] ড. মধুসূদন চক্রবর্তী একাব্যের বিশ্লেষণে বলেন, "সংবেদনশীল, তীক্ষ্নদৃষ্টি সম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত এই কবির কবিতা আমাদের মনকে নাড়া দেয়, যুগজীবন ও সমাজচিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে চোখের সামনে, চিত্রধর্মময় তাঁর রচনা, কিন্তু বড় বাস্তব রূঢ় হলেও সত্য কখনও কখনও যেন কড়া চাবুকের আঘাত, অন্তর্জ্বালা, দাহ, বেদনা ও যন্ত্রণার অপূর্ব অনুরণন।"[৪] অর্থাৎ স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের যে সহৃদয় সংবেদনশীল দৃষ্টি সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির আলো ফেলে জীবনের আশা-আকাঙক্ষা স্বপ্ন-ব্যর্থতা দু:খ-বেদনার ক্লেদাক্ত মুহূর্তগুলিকে তিনি আবিষ্কার করেছেন একাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতায়।

---

১. সাকো, আবদুল গনি হাজারী, স্মৃতি সংখ্যা ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. 'সামান্য ধন' গ্রন্থে প্রকাশ কালের উল্লেখ নেই। সমকালে এই গ্রন্থের সমালোচনায় হাসান হাফিজুর রহমান এর প্রকাশকাল ১৯৫৯ বলে উল্লেখ করেছেন।

৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উত্তরণ, কার্তিক -অগ্রহায়ণ ১৩৬৬।

৪. বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ধারা, পৃঃ ২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

সূর্যের সিঁড়ি (১৯৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয় সুপ্রকাশ গ্রন্থ, ঢাকা থেকে। মোট ৪০টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবি ফররুখ আহমদকে। এ গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ তিনটি অংশে বিভক্ত। শিরোনামহীন প্রথমাংশে ১৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ 'নির্জন যখন-এক' এবং 'নির্জন যখন-দুই' শিরোনামে যথাক্রমে ৭টি ও ১৫টি কবিতা বিন্যস্ত হয়েছে। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল। এই সময়ের মধ্যে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা দিন দিন যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছিল জনমনে তার যে ক্ষোভ, হতাশা ও বঞ্চনার বোধ — তাই একাব্যের বিভিন্ন কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের শোষণ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত হয়েছে কোনো কোনো কবিতায়।

দেশের এই পটভূমিতে কবি-মানসের যে বৈশিষ্ট্য 'সামান্য ধন' গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় তা আরো পরিণত আরো স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। এ গ্রন্থের সমালোচনায় আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, "সমাজ আবদুল গনি হাজারীর কবিতার শোভা পটভূমি, কিন্তু লক্ষণীয়, সামাজিক উজ্জীবনে উচ্চকণ্ঠ নন তিনি; এবং এখানেই নজরুল ইসলাম বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে স্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন দৃষ্টির কোণ তাঁর, শুধু সমাজের এলোমেলো স্তরগুলি অবলোকন করে গেছেন তিনি, পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করেননি — যদিচ কার প্রতি তাঁর পরোক্ষ সমর্থন, সেটি একেবারে বিস্পষ্ট নয়; তাঁর কণ্ঠ তাই কখনো ক্ষোভে রুক্ষ নয়, তবে সময়ে সময়ে করুণায় আর্দ্র ও ব্যঙ্গে বিদ্ধ বটে।...গ্রন্থনাম 'সূর্যের সিঁড়ি' হলেও মর্ত্য থেকে উপর্যুক্ত সোপান পরম্পরা উচ্চকল্প সুস্থ তপনের প্রতি গন্তব্যের অঙ্গুলি নির্দেশ লক্ষ্য নয় তাঁর; সূর্যের সিঁড়ি বেয়ে আমরা বরং পৃথিবীতে নামবো" এই ঘোষণা সূর্যসন্তানের পৃথিবীপ্রীতি প্রকাশক।"[১] বলা যায়, পৃথিবীতে শান্তি আসুক, মানুষের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠুক, একাব্যে কবির যেন এই-ই প্রার্থনা। কবির মৃত্যুর পর 'সাঁকো' স্মৃতি সংখ্যায় কবি শামসুর রাহমান এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, " 'সূর্যের সিঁড়ি' প্রকাশিত হওয়ার পরে এই কবির শক্তি সম্পর্কে কারো মনে কোনো দ্বিধা রইলো না। একজন শক্তিশালী বিদগ্ধ কবি হিসেবে আবদুল গনি হাজারী প্রতিষ্ঠিত হলেন পাঠক সমাজে।"[২]

---

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পরিক্রম, অগ্রহায়ন-১৩৭২।
২. শামসুর রাহমান, সাঁকো, আবদুল গনি হাজারী স্মৃতি সংখ্যা ১৯৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

'জাগ্রত প্রদীপ' (১৯৭০) প্রকাশিত হয় নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা থেকে। মোট ৩৪টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্থে কবির দেখার দৃষ্টি যেমন প্রসারিত, বক্তব্যও ততোধিক স্পষ্ট। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের নানাবিধ সঙ্কট, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সমাজের ভাঙ্গাগড়া, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব সর্বোপরি শ্রেণী বৈষম্যের ফলে সমাজদেহে যে পচন — তাই একাব্যের প্রধান বিষয়। গ্রন্থের নামকবিতায় পিতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কবির মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে — তা মৃত্যু-অতীত রহস্যলোকের অন্বেষণে প্রসারিত। নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের আলোতে ফিরে আসার আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে কোনো কোনো কবিতায়। একাব্যের অনেক কবিতায় ধর্মীয় অনুষঙ্গের ব্যবহার লক্ষ্যযোগ্য। বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ-ও ক্ষুরধার করার জন্যে কখনো পরিবেশে নাটকীয়তা আনয়নের জন্যে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষঙ্গের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে কবীর চৌধুরীর মন্তব্য, "স্পষ্টতঃই ধর্মীয় ঐতিহ্য যাদের কবিতার অন্যতম মৌল প্রেরণা, যেমন ফরুখ আহমদের সঙ্গে হাজারীকে এক পংক্তিতে ফেলা যাবে না। অথচ হাজারীর অনেক কবিতায় মুসলিম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত শব্দাবলী, চিত্রকল্প ও উপমা, মাঝে মাঝে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে হুবহু আরবী চরণের সংযোজন লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু তাঁর কাব্যে এই ধর্মীয় অনুষঙ্গের উপস্থিতি পুনরুজ্জীবনবাদী নয়, পুনর্জাগরণবাদীও নয়, তা তির্যক, কখনো কখনো ব্যঙ্গধর্মী, কখনো কখনো ভিন্ন পরিবেশের পাশে বৈরীত্যের চিত্র হিসাবে নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। এক কথায় তা গতানুগতিক, প্রাচীনপন্থী, প্রধানত অনুভূতি আশ্রয়ী নয়, তা নিরীক্ষাধর্মী, আধুনিক এবং প্রধানত বুদ্ধি নির্ভর"।[১] এ গ্রন্থটি প্রকাশের পর পর আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর সমালোচনায় বলেন, "জাগ্রত প্রদীপে" কবিতাগ্রন্থে দিনানুদিনের প্রতিচিত্রণ, মধ্যবিত্ত জীবনের ধূসর নীরসতা আবার সমস্তের মধ্যে দিয়ে আগামী সূর্যের প্রতিভাস" ঝলসে উঠেছে।[২] একাব্যের কবিতায় স্থান ও কালের বিস্তার যেমন লক্ষণীয় তেমনি স্থানের দিক থেকে স্বদেশের ছবিই মুখ্য, গ্রামীণ এবং নাগরিক জীবনের আলেখ্য নির্মাণ করতে গিয়ে কবির অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে নগর জীবনের নানা অসংগতি যেন ধরা পড়েছে বিশেষভাবে।

---

১. কবীর চৌধুরী, প্রবন্ধসংগ্রহ, শিল্পতরু প্রকাশনী, প্রকাশকাল ১৯৯২

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, আ.গ.হা.র কবিতা, সাঁকো, আ.গ.হা. স্মৃতি সংঘ, ১৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

আশরাফ সিদ্দিকী (জন্ম – ১৯২৭)

টাঙ্গাইল জেলার নাগবাড়ী গ্রামে আশরাফ হোসেন সিদ্দিকী জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২৭ সালের ১লা মার্চ। পিতা ডা. আবদুস সাত্তার সিদ্দিকী স্বরাজ আন্দোলনের সময় স্কুল ছেড়ে শেষে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাস করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি স্থানীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন বোর্ড, জুট বোর্ড, ঋণসালিসী বোর্ড-এর সভাপতি এবং মহকুমা লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। মা সমিরুন্নেছা একই গ্রামের জমিদার এবাদৎ উদ্দিন চৌধুরীর কন্যা এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ফুপু এবং সাবেক স্পীকার মরহুম আবদুল হামিদ চৌধুরীর ভগ্নি।

আশরাফ সিদ্দিকীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর নানা এবাদৎ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক পাঠশালায়; এরপরে গ্রামের পাশে বল্লার "মনমোহনের পাঠশালায়" লেখাপড়া করেন। পরে রতনগঞ্জ মাইনর স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুল থেকেই ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ এবং পরে শান্তিনিকেতন থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স কোর্স শেষ করেন। দেশ বিভাগ জনিত কারণে ঢাকায় ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে অনার্স এবং ১৯৫০ সালে এম.এ. পাস করেন। ১৯৬৬ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক-সাহিত্যে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় সরকারী কলেজের বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে। প্রায় বছরকাল ডেপুটেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন পুনরায় সরকারী কলেজে যোগ দেন। ১৯৬৮-৭২ সালে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক। এরপর জেলা গেজেটিয়ারের প্রধান সম্পাদক হিসাবে বেশ কিছুকাল কাজ করে ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রায় সাত বছর এই দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং সবশেষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্থা পি.ই.এন-এর কর্মপরিষদের (১৯৫১-৫৩) এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের তিনি ছিলেন সদস্য। পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৬৩ সালে 'তমঘায়ে ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত করে।

ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি পারিবারিক লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ধরনের বই এবং সেযুগের মাসিক সওগাত, শিশু সওগাত, মোহাম্মদী, আজাদ, কৃষক, ইত্তেহাদ, যুগান্তর ও আনন্দ বাজার ইত্যাদি পত্রিকা পড়তেন। এ সময় থেকেই কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখার প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৩৮ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে প্রথম এবং ১৯৪১ সালে দৈনিক আজাদের মুকুলের মহফিলে তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখা কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তালেম মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। এরপর 'সাতভাই চম্পা' (১৯৫৫) 'বিষকন্যা' (১৯৫৫) ও 'উত্তর আকাশের তারা' (১৯৫৮) প্রকাশিত হয। এ গুলো সমবায়ে রচিত হয়েছে তিরিশ বসন্তের ফুল (১ম খন্ড ১৯৭৫) এর দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে ঐ সময়ের অগ্রন্থিত কবিতাসমূহ। ১৩৫৬ সালে তাঁর ও আবদুর রশীদ খানের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নতুন কবিতা' পূর্ব বাংলার কাব্যান্দোলনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এছাড়া তাঁর গবেষণাগ্রন্থ, গল্প, স্মৃতিকথা, শিশুতোষ রচনাও রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য ও গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৪), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৪) ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬) সুন্দরবন সাহিত্য (১৯৮০) আবুল মনসুর আহমদ (১৯৮০) লেখিকা সংঘ (১৯৮১,৮২) প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন, এছাড়া ইংরেজী 'ভোম্বল দাস' শীর্ষক গ্রন্থের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Children Digest Award পেয়েছেন, ১৯৬৪ সালে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ছাড়াও তিনি ব্লুমিংটন (আমেরিকা) ১৯৫৬ সাল, রেঙ্গন ১৯৬০ সালে, ওয়াশিংটন ডিসি ১৯৬৪ সালে, তেহরান, আঙ্কারা-১৯৭০ সালে, জাপান, যুগশ্লাভিয়া ও ভারতে ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০) একাব্যের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "স্বপ্ন থেকে সংঘাত: বোবামাটির উপর গর্বিত স্ফীতকায় সমাজের মুখোমুখি সংগ্রাম জীবন ও মনে: এবং তারই বাস্তব রূপায়নই তালেব মাষ্টার"। একাব্যে কবির স্বপ্ন, মনের মতো পৃথিবী গড়ার, যেখানে ভালোবাসারই প্রাধান্য থাকবে। তবে 'সংঘাত' অংশে দারিদ্রপীড়িত সমাজের কথা রয়েছে। তেরশ পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে যারা মরেছে, তাদের অতৃপ্ত আত্মার আর্তনাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে একাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতায়। 'সংগ্রাম' অংশে কবি নিজেকে পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের দলের বলে ভেবেছেন এবং শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক ঘটনা হিসেবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস ও তান্ডবকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছ একাব্যের একাধিক কবিতা। এছাড়া প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থের সমালোচনায় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "আশরাফ সিদ্দিকী স্বপ্ন ও বাস্তবের টানা পোড়েনে, ইতিহাস ও ঐতিহ্যবোধের দ্বন্দ্বে এবং সর্বোপরি এক অস্থির আবেগে দোলায়িত। ... তালেব মাষ্টার কাব্যগ্রন্থের কিছু কিছু কবিতায় যে সমাজ চেতনা ও তীব্র অনুভূতির প্রকাশ আছে, পরবর্তীকালের কবিতায় তার পরিচয় খুবই কম। কিছু কিছু খন্ড কবিতায় তিনি সুন্দর রোমান্টিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন।"[১]

সাতভাই চম্পা (১৯৫৫) এগ্রন্থের কবিতাগুলো ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে রচিত। এই কাব্য সম্পর্কে পরবর্তী কাব্য 'বিষকন্যা'র মলাটে পরিচিতি দেয়া হয়েছে যে, 'দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সাতভাই চম্পা'য় দেশের শত সহস্র সোনার টুকরো তরুণদের তিনি দেখেছেন 'ঝড়সাগরে' সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর ভাসাতে — আশাবাদী কবি অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের অপরূপ ছন্দ ও ভাষায়।'

একাব্যের কোনো কোনো কবিতায় এধরনের চিন্তা থাকলেও অধিকাংশই প্রেম ও বাংলার নিসর্গ বিষয়ক। লোক সাহিত্যের প্রেম কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে একাব্যের 'মধুমালা' কবিতাটি। সমাজের বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের পক্ষে যারা এখন বাঁশের বনে, খড়ো ঘরে বাস করে, ছিন্ন কাঁথা গায়ে জড়ায় — তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। নিসর্গপ্রীতির পরিচয় বিধৃত হয়েছে কোনো কোনো কবিতায়। এ গ্রন্থের সমালোচনায় বশীর আল হেলাল বলেন, "আশরাফ সিদ্দিকী স্বপ্নচারী কবি। তিনি উজ্জ্বল রঙের চিত্রময় সব স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাঁর এইসব স্বপ্ন তাঁর জীবনতৃষ্ণারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনের ব্যর্থতা গ্লানি ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রূপকথার রাজ্যে উধাও হয়ে যান। কিন্তু সেখানে গিয়েও তাঁর সেই প্রিয় পরিচিত ব্যথাদীর্ণ মাটির পৃথিবীকেই দেখতে পান"।[২]

---

১ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পঁচিশ বছরের কবিতা, উত্তরাধিকার ১৯৭৪, পৃ. ২০৪

২ বশীর আল হেরাল, সাম্প্রতিক কবি, সাম্প্রতিক কবিতা, ১৯৭৫, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

বিষকন্যা (১৯৫৫) একাব্যের কবিতাগুলো রচিত হয়েছে ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এদেশের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির ধ্বংসের চিত্র এখানে রয়েছে; এছাড়া রয়েছে পরাধীনতামুক্ত সমাজের নবজাগরণের ইঙ্গিত। গ্রামবাংলার চিরায়ত জীবনপ্রবাহ, প্রকৃতির সরল স্নিগ্ধতা ও সাবলীলতা, আবহমান বাংলার ঐতিহ্য একাব্যের উপজীব্য।

এর আলোচনায় ড. মধুসূদন চক্রবর্তী বলেন, "আশরাফ সিদ্দিকীর কবিতায় যুগের প্রতিফলন আছে। ... তাঁর কবিতা পড়তে আমাদের ভালো লাগে, তার প্রধান কারণ, কোথায় যেন তাঁর কবিমানসের সঙ্গে আমাদের একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। ... নিখাদ ও নিখুঁত হয়তো নয় তাঁর কবিতা, হয়তো খুব উঁচুদরের কবিও নন তিনি, জৌলুষ ও আড়ম্বরের দিক থেকেও হয়তো তাঁর কবিতা ততখানি আকৃষ্ট করবে না, কিন্তু আমাদের মনের নিভৃততম প্রদেশে কখনো বেদনা, কখনো অপরূপ মৃদ ব্যঞ্জনা নিয়ে আঘাত করে, সাড়া জাগায়, তাঁর প্রধান কারণ, তিনি আমাদেরই কথা বলেন, আমাদেরই মনের খবর তাঁর কবিতার পংক্তিতে খুঁজে পাই।[১]

উত্তর আকাশের তারা (১৯৫৮) এ কাব্য সংকলনটির কবিতাসমূহ রচিত হয়েছে ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে। একাব্যেও তিনি সমাজ পরিবর্তন আনয়নের কথা বলেছেন। তবে তাঁর চিন্তার সামান্য পরিবর্তন এখানে লক্ষণীয়। বসন্তে, হেমন্তে, শীতে বা শরতে উত্তর আকাশে উজ্জ্বল যে-তারকা থাকে, তা শিল্প সাহিত্য দেবত্ব মনুষ্যত্ব শান্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক বলে কবির কাছে বিবেচিত হয়েছে — এগুলো অর্জনের জন্যে সাধনার কথা তিনি এখানে বলেছেন বিশেষ করে 'উত্তর আকাশের তারা' নাম-কবিতাটিতে। এছাড়া মাটির আঙিনায় প্রাত্যহিক পরিবেশে যে স্বপ্ন এবং যে বাস্তবের মুখোমুখি সংঘাত — তারই আলেখ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে একাব্যের একাধিক কবিতায়। কখনো কখনো হতাশা ও বিষন্নতার সুর পরিলক্ষিত হলেও শেষ পর্যন্ত কবির দুর্বার আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে একাব্যের বেশ ক'টি কবিতায়।

---

১. বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ধারা, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

আতাউর রহমান (জন্ম ১৯২৭)

বগুড়া জেলার আক্কেলপুরে আতাউর রহমান জন্ম গ্রহন করেন ১৯২৭ সালের ৮ই মে। পৈতৃক বাস ঝরঘরিয়া, নওগাঁ। পিতা মোহাম্মদ আলাউদ্দিন সরকার।

আতাউর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন আক্কেলপুর মক্তবে। সোনামুখী হাইস্কুল থেকে ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া থেকে আই.এ. পাশ করেন। অনিয়মিত ছাত্র হিসেবে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন।

কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৫৩ সালে। প্রথমে গফরগাঁও কলেজ, পরে বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ ও পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দুই ঋতু' প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। একই বছর প্রকাশিত হয় 'একদিন প্রতিদিন' (১৯৫৬), 'নিষাদ নগরে আছি' (১৯৭৭), 'ভালোবাসা চিরশত্রু' (১৯৮১) প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রবন্ধগ্রন্থ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৬৩), 'নজরুল কাব্যসমীক্ষা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭২ সালে।

সাহিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেছেন ১৯৭০ সালে। এছাড়া করতোয়া সংসদ স্বর্ণপদক (১৯৬৮) নজরুল স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৫) হিলালী স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৯) পেয়েছেন।

দুইঋতু (১৯৫৬) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে টাউন প্রেস, বগুড়া থেকে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতা থেকে মোট তেত্রিশটি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও জনাব নাছির মন্ডলকে। জনাব নাছির মন্ডল ১৯৪৩-৪৪ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে অবশ্য ন্যাপে যোগদান করেন।

সমকালীন যুগচেতনা এবং সমাজ জীবনের নানা দ্বন্দ্ব সংঘাত, প্রেম, প্রকৃতি একাব্যের উপজীব্য। এছাড়া স্বদেশের অস্থির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবনবোধে হতাশা ও নৈরাজ্যের আলেখ্য নির্মিত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। কবিতাসাহিত্যের দুই প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের স্মরণে রচিত দুটি কবিতা স্থান পেয়েছে একাব্যে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে একাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। গ্রন্থের নাম-কবিতাটি তৎকালীন কৃষক আন্দোলনকে মনে রেখে ১৯৫১ সালে রচিত। উপমহাদেশ বা মধ্য এশিয়া জুড়ে কৃষক-মজুর আন্দোলন তীব্র হওয়ায় কবিরাও মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এই জাতীয় কবিতা রচনায়। বিশেষভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণ' মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেঘ বৃষ্টি ঝড়' নামক কাব্যগ্রন্থ কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। গ্রন্থটি প্রকাশের পর তৎকালীণ দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এ সমালোচনায় বলেন, "কবিতাগুলোর মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রয়েছে। যেন একটি চেতনাকে কবি বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। এই চেতনা কবির সমাজ-সচেতনারই বহিঃপ্রকাশ। মধ্যবিত্ত জীবনের নৈমিত্তিক আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বেই এর উদ্ভব। জীবনের নানা অভিজ্ঞতার স্তর উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র বেদনা কবিকে স্পর্শ করেছে।[১]

---

১. মোঃ মনিরুজ্জামান, ইত্তেহাদ, ১৯৫৭

Dhaka University Institutional Repository

একদিন প্রতিদিন (১৯৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য মঞ্জিল, ঢাকা থেকে। মোট ৪১টি কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত একাব্যটি প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দীর্ঘ ন'বছর পরে প্রকাশিত হয়। সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের জটিলতার পাশাপাশি এক ধরনের নৈরাশ্যবোধ প্রকটিত হয়ে উঠেছে এর বেশ ক'টি কবিতায়। তবে সমাজ চেতনার পাশাপাশি নিসর্গপ্রীতির পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে কোনো কোনো কবিতায়। সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের মঙ্গলচিন্তার পাশাপাশি আরেক শ্রেণীর শঠতা, দালালী আর প্রবঞ্চকের ভূমিকা কবিকে পীড়িত করেছে। ফলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আড়ালে সমাজের শঠতা, প্রবঞ্চনার নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। গ্রন্থটি প্রকাশের পরে 'পরিক্রম' পত্রিকায় এর একটি সমালোচনায় সমালোচক বলেন, 'প্রায় ৪১টি কবিতার এই সংগ্রহে কবি আতাউরকে আমরা বিভিন্ন চিত্ততায় উপস্থিত দেখতে পাই। কখনো তিনি কুটিল সাম্প্রতিক সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখী, কখনো নৈরাশ্যে বিষণ্ন; কখনো বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ, আবার কখনো দেশমাতৃকার হৃদয় সন্ধানে শিশুমন।'[১] অপর এক সমালোচনায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, 'একদিন প্রতিদিন'-এ কবির নিসর্গপ্রীতিকে অতিক্রম করে সাময়িক প্রবলতর হয়েছে। ... কবি আতাউর রহমান জীবনের সুখে দুঃখে, বেদনা ও আনন্দে হতাশায় ও আশায় শিহরিত। হাসি-অশ্রুর চক্রাবর্তে প্রতিদিন যেন একই দিনের প্রতিচ্ছবি তবু একদিন প্রতিদিন নয়।'[২] 'মাসিক পূবালী' পত্রিকায় এ গ্রন্থের একটি সমালোচনা করেছিলেন কথাসাহিত্যিক রাহাত খান। রাহাত খানের সমালোচনা পাঠ করে এর জবাবে আনোয়ার পাশা গ্রন্থটির সমালোচনায় বলেন, "একদিনই ঘুরে ঘুরে প্রতিদিন আত্মপ্রকাশ করছে অর্থাৎ একটি পুনরাবর্তিত দিনের ইতিবৃত্তই সারা জীবনের ইতিবৃত্ত — এমনি একটা ব্যঞ্জনা গ্রন্থের নামকরণের মধ্যে রয়ে গেলেও বস্তুতঃ গ্রন্থখানি কেবলি কোনো এক বৈচিত্র্যহীন জীবনের একঘেঁয়েমির চিত্রই শুধু নয়। বিচিত্র জীবনকে নানা কর্মক্ষেত্রে কবি এখানে উপলব্ধি করেছেন। ... জীবনকে বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে উপলব্ধির চেষ্টা কাব্যখানিকে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে।"[৩]

---

১. পরিক্রম, অগ্রহায়ণ, ১৩৭২, পৃ. ৩৫১
২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'বই' ১৯৬৬
৩. আনোয়ার পাশা, পূবালী ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭২, পৃ. ১০২৬

Dhaka University Institutional Repository

আবদুর রশীদ খান (জন্ম–১৯২৭)

কুমিল্লা জেলায় চাঁদপুর থানার জাফরাবাদ গ্রামে আবদুর রশীদ খান জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারি। পিতা মৌলভী ওয়াজেদ উদ্দীন খান শাহরানপুর মাদ্রাসা থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষায় হাতে খড়ি গ্রামের স্কুল থেকে হলেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন চাঁদপুর নিশিকান্ত এম.ই স্কুলে, গ্রীদ কালিন্দিয়া এম.ই. স্কুলে এবং ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। পববর্তীকারে জামুরকী নবাব স্যার আবদুল গণি হাই স্কুল থেকে ২টা লেটারসহ প্রথমবিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৪৫ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স এবং ১৯৫০ সালে এম.এ পাশ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতেই ১৯৪৪-৪৫ সালে ছাত্রাবস্থায় অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে পার্টটাইম চাকুরী নেন। ১৯৫১-৫২ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ইংরেজী বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫২ সালের ১১ই নভেম্বর ঢাকা কলেজের ইংরেজী বিভাগে প্রভাষক হিসেবেই কাজ করেন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে তৎকালীণ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগে স্পেশাল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীসময়ে সরকারের বাংলা অনুবাদক ও প্রকাশনা রেজিষ্ট্রার হিসাবে কাজ করেন। পরে পদটিকে উন্নীত করে পরিচালক, অনুবাদক ও প্রকাশনা নিবন্ধন পরিদপ্তর করা হয়। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

প্রথম মুদ্রিত লেখা 'হারানো মানিক' (ছোটগল্প, ৭ম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় রচিত এবং কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নক্ষত্র : মানুষ : মন' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। এরপর 'বন্দী মুহূর্ত (১৯৫৯), 'মহুয়া' (১৯৬৫) এবং 'বিম্বিত প্রহর' (১৯৬৮), 'অন্বিষ্ট স্বদেশ' (১৯৭০), প্রকাশিত হয। স্বাধীনতা উত্তরকালে কবির আরো তিনটি কাব্যগ্রন্থ, 'সমস্ত প্রশংসা তাঁর' (১৯৮০), 'তিমির হনন' (১৯৮৮), 'এক অলৌকিক দ্বীপ' (১৯৯১) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সম্পাদিত নতুন কবিতা (১৯৫০) ছাড়া কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থও রয়েছে।

কাব্যে বিশেষ অবদানের জন্যে ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। পেশাগত দক্ষতা ও সাফল্যের জন্যে 'তমঘা-ই-খেদমত' উপাধি পেয়েছিলেন ১৯৬৮ সালে। এছাড়া বাংলা সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (১৯৯১) কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিস পুরস্কার (১৯৯২) পেয়েছেন।

নক্ষত্র : মানুষ : মন (১৯৫১) প্রথম প্রকাশিত হয় পাক বুক সাপ্লাই, চাঁদপুর, ত্রিপুরা থেকে। মোট ২০টি কবিতা আছে এই সংকলনে। দুই-চারটি ছাড়া বাকি সবগুলো কবিতারই অন্তঃসুর প্রেমের। স্থিতিহীন প্রথম যৌবনের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও প্রেমকে নিরীক্ষণ করেছেন। তাই এ সময়ের আশা-নিরাশার সংশয় এবং তার দ্বন্দ্বপীড়িত মনে যে গভীর ক্লান্তিবোধ — তাও মূর্ত হয় উঠেছে বেশ ক'টি কবিতায়। প্রেমের কবিতা ছাড়াও এ গ্রন্থে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা-সংকট, হৃদয়াবেগ, পদ্মা-মেঘনা, সবুজ শস্যক্ষেত সব মিলিয়ে শ্যামল বাংলার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় এর একটি সমালোচনা বেরোয় : "মুসলমান কবিদের মতো ইনি প্রথম গ্রন্থকার হলেও এর কবিতাগুলির মধ্যে একটি বলিষ্ঠ স্বকীয়তা সহজেই নজরে পড়ে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ভাবের গভীরতা 'ইতিহাস' একটি 'ধূসর চিন্তা' ও প্রবাসী কবিতার মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ... আমরা কবিকে বাংলা কাব্য সাহিত্যের আসরে আহ্বান জানাই।"[১] একাব্য সম্পর্কে আবদুল গাফফার চৌধুরীর মন্তব্য, "প্রথমেই আমার ভালো লেগেছে আবদুর রশীদ খানের প্রাণবন্ত প্রেমের কবিতাগুলো। কবিতাকে নির্মুক্ত গতি প্রদান করে পাঠকের হৃদয়গ্রাহ্য করে তোলে প্রেমের কবিতাগুলোয় তা লক্ষণীয়। পড়তে পড়তে একসময় অনুভূতির আচ্ছন্নতা থেকে যে ব্যথিত আনন্দ জাগে, তাই কবি ও তাঁর কবিতার পাঠককে পরস্পর আত্মীয় করে তোলে।"[২] মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নক্ষত্র : মানুষ : মন'-এ তীব্র ব্যথা-বেদনার উপলব্ধির চেয়ে শান্ত মন্থর রসমাধুর্যের স্পর্শ আছে। ... বিচ্ছেদের বেদনা এবং মিলনের আনন্দঘন উল্লাস এই অনুভূতিই তাঁর কবিতায় শুচি-শুভ্রতা বিস্তার করেছে। একারণেই হতাশা, নৈরাশ্য এবং জীবনের প্রতি বীতরাগ তার কবিতায় সংক্রমিত হয়নি।"[৩]

আরো একজন সমালোচকের মন্তব্য, "তাঁর 'নক্ষত্র : মানুষ : মন' কবিতার বইখানা পড়ে মনে হচ্ছে তিনিই একালের একমাত্র কবি যাঁর কবিতায় কল্পনার সংযম আছে। কবি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও সমাজসচেতনতা সম্পর্কে উদাসীন নন।"[৪]

বন্দী মুহূর্ত (১৯৫২) প্রথম প্রকাশিত হয় এশিয়া বুক হাউজ, ঢাকা থেকে। মোট ২৪টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এগ্রন্থে প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্যাদর্শ ও আশাবাদিতা সম্পর্কে কবির চিন্তা-চেতনা কাব্যরূপ লাভ করেছে। সমকালীন জীবনের পারিপার্শ্বিক-চেতনার প্রকাশ থাকলেও একাব্যে সংঘাত ও দ্বন্দ্বমুখর জীবনের প্রভাব ততটা লক্ষিত হয় না। তবে একাব্যে কবি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতির জগৎকে অতিক্রম করে সমাজজীবনের নানাবিধ সমস্যা ও সংকটের কথাও বলেছেন। ঐতিহ্য ও আদর্শের রূপায়নও লক্ষ্য করা যায় কোনো কোনো কবিতায়।

গ্রন্থটি প্রকাশের পরপর 'দেশ' পত্রিকায় একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, আধুনিক বাংলা কাব্যের সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, তা **বন্দী মুহূর্ত** পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায়। সে সঙ্গে এ-ও লক্ষ্য করা যায় যে, কবি চিন্তাক্ষেত্রে নিজস্ব একটি বক্তব্যকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট।"[৫] আর একজন সমালোচক বলেন, "কবি অতি মাত্রায় রোমান্টিক, বস্তু নয় ভাবের কারবারী তিনি। তবে তাঁর কাব্য-ভাবনা জীবনরহিত নয়। তিনি ঐতিহ্যানুসারী কবি। কাব্যে ঐতিহ্যানুসরণের মূল্যবোধে তিনি বিশ্বাসী।"[৬]

---

১. দৈনিক বসুমতী, কলকাতা ১৭ই আগষ্ট ১৯৫২, সংখ্যা
২. আবদুল গাফফার চৌধুরী, দৈনিক মিল্লাত, ২৫শে জৈষ্ঠ, ১৩৫৯
৩. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সমকালীন সাহিত্যের ধারা, ১৯৬৫, পৃ. ৬০
৪. আজাদী, সংখ্যা ৮ই জুন, ১৯৫২
৫. 'দেশ' ১৫ই অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৬০ সাল
৬. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, সওগাত, আষাঢ়, ১৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থ সম্বন্ধে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, " 'বন্দী মুহূর্তে' আবদুর রশীদ খান ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতির জ্ঞানকে অতিক্রম করে সমাজ মানসের অধ্যয়নে ব্রতী হয়েছেন কিন্তু সে অধ্যয়ন গভীর ও নিবিড়ভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে, তাতে অধ্যয়নে অসংগতি স্পষ্ট।"[১]

মহুয়া (১৯৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয় ফেভারিট বুক্স, লক্ষ্মী বাজার, ঢাকা থেকে। মোট ২৯টি সনেট নিয়ে প্রকাশিত এ কাব্য মোমেনশাহী-গীতিকার বিখ্যাত 'মহুয়া' গ্রন্থকে অবলম্বন করে রচিত। গাথা কাহিনীকে উপকরণ করে সনেট-কাব্য রচনার প্রয়াস পরীক্ষামূলক ও নতুন। গ্রন্থটির 'পূর্বলেখ' ভাষণে লেখক বলেছেন, "পাকিস্তান-পূর্বযুগে সাহিত্যে জাতীয় তাহজীব ও তমুদ্দুনের রূপায়ণের জন্য জাতীয় রেনেসাঁ আন্দোলনের যে মহান সম্ভাবনাময় প্রচেষ্ট শুরু হয়, তার উদ্দেশ্য এখনো বিদ্যমান। বরং বলতে গেলে পবিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে সেই উদ্দেশ্য সাধন এখন আরো বেশি জরুরী হয়ে পড়েছে। সেই উদ্দেশ্য রূপায়ণে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও শরীক হবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।"[২]

প্রেমের গরবে গরবিনী 'মহুয়া'র চাওয়া-পাওয়ার আশা-আকঙ্ক্ষার টানাপোড়েনে বেদনা-বিধুর জীবন-নাট্যের এক একটি দৃশ্যপট এক একটি সনেটে কাব্যরূপ পেয়েছে। সমাজের দ্বন্দ্বমুখরসংঘাত, ক্ষুব্ধতা, ব্যক্তিমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-ব্যর্থতা এবং অপরাজেয় প্রেমের মহিমাই প্রতিফলিত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন সনেটে। একাব্যের সমালোচনায় একজন সমালোচক বলেন, "বেদনাবোধের উৎস থেকেই কবি আবদুর রশীদ খানের প্রেমানুভূতির জন্ম। এই কাব্যগ্রন্থে কবির সংবেদনশীল মনের ময়ূর পাখা মেলেছে।"[৩]

বিম্বিত প্রহর (১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয় সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। মোট ২৬টি কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত এ সংকলনে বিভিন্ন স্বাদের কবিতা আছে। তবে পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থের স্বপ্নময় জীবন-চেতনার বদলে এ গ্রন্থে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক যুগ-সমস্যার উপলব্ধি, সেই সঙ্গে বিধৃত হয়েছে আদর্শিক দ্বন্দ্ব এবং ঐতিহ্যবোধের বিপর্যয়ের আলেখ্য। আদর্শবাদী মন ও মানসিকতা এবং সর্বোপরি এক সুন্দর ও স্বপ্নময় পৃথিবীর প্রত্যাশী কবিমন হতাশায় আত্মনিমজ্জিত না হয়ে এই বিরূপ বিশ্বেও আশার আলোকবর্তিকা জ্বেলেছেন। এবং এ কারণেই ভারগ্রস্থ ও সমস্যাপীড়িত মন নিয়েও তিনি রোমান্টিক কবি-কল্পনায় জেগে ওঠেন কোনো কোনো কবিতায়। এ গ্রন্থের কিছু সংখ্যক প্রকৃতি-আশ্রয়ী রোমান্টিক সনেটে স্বপ্নমুগ্ধ, অনুভূতিপ্রবণ ও আর্তি-আকুলতায় সমর্পিত কবিমনের সাক্ষ্য মেলে। আবার নগরজীবনের সংকট, সমস্যা ও বিকৃতি-বিভ্রান্তিকে উপজীব্য করে লেখা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতায় একজন সচেতন ও আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ নাগরিককে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ গ্রন্থটির সমালোচনায় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "শৈশবের রোমান্টিক স্মৃতি-রোমন্থন, শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যময় অতীতে ফিরে যাওয়ার আন্তরিক আর্তি-আকূলতা এবং নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দ এ গ্রন্থের বহু কবিতায় ধরা দিয়েছে। তারি পাশাপাশি রূপায়িত হয়েছে নাগরিক জীবন-যাতনা ও জটিলতার চিত্র এবং সেই সঙ্গে মূল্যবোধ, নীতিজ্ঞান ও ব্যক্তি-মানসের সংকট ও বিপর্যয়ের আলেখ্য।"[৪]

---

১. মোঃ মাহফুজউল্লাহ, সমকালীন সাহিত্যের ধারা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৬৫, পৃ. ৬১
২. 'মহুয়া' (সনেটকাব্য) আবদুর রশীদ খান, ফেভারিট বুক্স, লক্ষ্মী বাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৬৮, পূর্বলেখ অংশ
৩. আনোয়ারুল আজম, 'মহুয়া' (সনেটকাব্য) সৈনিক পাকিস্তান, ১৪ই জানু, ১৯৬৮
৪. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সৈনিক পাকিস্তান, ১৫ই মার্চ ১৯৭০ সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

আবদুস সাত্তার (জন্ম—১৯২৭)

টাঙ্গাইল জেলার গোলারা গ্রামে আবদুস সাত্তার জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২৭ সালের ২০শে জানুয়ারি। পিতা মৌলভী আবদুস সোবহান বাংলা লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, তবে আরবী-উর্দু-ফারসী কিছুটা শিখেছিলেন। বড়ভাই ওল্ড স্কীমের জামাতে উলাপড়া মৌলভী।

আবদুস সাত্তার প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন আইসড়া জুনিয়ার মাদ্রাসা, টাঙ্গাইলে। ১৯৪৭ সালে গোলাপদীঘি কে.পি ইউনিয়ন ইংলিশ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সা'দৎ কলেজ, করটিয়া থেকে আই.এ পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৫১ সালে।

কর্মজীবন শুরু করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা পরিদপ্তরের সহ-সম্পাদক হিসেবে। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ট্রাইবাল কালচারাল ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি-র পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর সম্পাদক হিসেবে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরে ছিলেন ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে উপদেষ্টা, ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমী, ঢাকা। উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, ঢাকা। সদস্য, রয়েল সোসাইটি, লন্ডন। অবসর জীবন যাপন করছেন।

১৯৪৩ সালে দৈনিক আজাদে-র মুকুলের মাহফিলে'র পৃষ্ঠায় প্রথম ছড়া বেরিয়েছিলো। এরপর দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৪৫ সালে, মাসিক 'মোহাম্মাদী'তে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় বৃষ্টি মুখর ১৯৫৯ সালে। এরপর 'অন্তরঙ্গ ধ্বনি' (১৯৭০), 'নামের মৌমাছি' (১৯৭৩), 'আমার ঘর নিজের বাড়ি' (১৯৭১), The Intimate voice (১৯৭৮), 'আমার বসবাস' (১৯৮২), 'বিম্বিত স্বরূপ' (১৯৮৫), 'আমার বাবা মার ক্বাসিদা' (১৯৮৫) আবদুস সাত্তার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯০), Human Portrait (১৯৯০) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধগ্রন্থ, স্মৃতিকথা, জীবনীগ্রন্থ, অনুবাদগ্রন্থ রয়েছে অসংখ্য। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১১৭টি।

সাহিত্যে অবদানের জন্যে দাউদ পুরস্কার পেয়েছেন (১৯৬৬)। কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেছেন ১৯৭৫ সালে। এছাড়া 'লেখিকা সংঘ' পুরস্কার (১৯৮৪), আন্তর্জাতিক পুরস্কার (জাতিসংঘের সৌজন্যে দায়েমী কমপ্লেক্স, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত) ১৯৮৬। টাঙ্গাইল জেলা সমিতি পুরস্কার (১৯৮৬), অরণী সাহিত্য শিল্পী গোষ্ঠী পদক (১৯৬৮)। ঢাকা পৌরসভা পদক (১৯৮৮) আলবার্ট আইনস্টাইন একাডেমী ব্রোঞ্জ পদক, আমেরিকা (১৯৯০) পেয়েছেন।

বৃষ্টি মুখর (১৯৫৯) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে রওনক পাবলিকেশনস, ঢাকা থেকে। মোট ৩৫টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বন্ধুবরেষু'কে। সমকালীন জীবন ও জগতের জটিলতাসমূহ, নগরজীবনের অসঙ্গতি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, স্বদেশের প্রকৃতি এবং প্রেমের বিচিত্র অনুভব ও উপলব্ধি একাব্যের উপজীব্য। তবে এ কাব্যের কবিতার প্রধান প্রেরণা প্রেম ও প্রকৃতি। মোট ৩৫টি কবিতার মধ্যে প্রকৃতির চেয়ে প্রেমের প্রাধান্যই বেশি। এ প্রাধান্য অবশ্য সংখ্যার বিচারে, উৎকর্ষের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি অপেক্ষাকৃত রসোত্তীর্ণ। একাব্যের সমালোচনায় ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মন্তব্য, "কাব্য বিচারে কবির ব্যক্তিগত তথ্যের আরোপ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোতে বিশেষ করে আমেরিকায় আজকাল খুবই চালু হয়েছে। কবির জন্ম টাঙ্গাইলের ছায়াঢাকা পাখিঢাকা গ্রামে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উদার আবেদন যে কবির কাব্যে

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রধান স্থান হয়ে উঠেছে এজন্যে দায়ী তাঁর এই পটভূমি। তারপর নাগরিক কালচার তার সেই মানস পলিমাটিতে নতুন ক্রিসানথিমাম ফুটিয়েছে।"[১]

সাপ্তাহিত 'দেশ' পত্রিকার একটি সমালোচনায় এ কাব্য সম্পর্কে বলা হয়, "বৃষ্টিমুখর" তরুণ কবির কাব্য-সংকলন। নানা ধরনের কবিতা এতে আছে — আধুনিক যুগের যন্ত্রণাময় জীবনচৈতন্যও কয়েকটি কবিতায় বিশেষ রূপ লাভ করেছে। তবু কবি আশাবাদী।"[২] ফজল শাহাবুদ্দীন বলেন, "'বৃষ্টিমুখর' নাম থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে, প্রকৃতির প্রতি কবির একটি বিশেষ পক্ষপাত আছে।"[৩] বলা যায়, কবির প্রকৃতিপ্রীতির অনুষঙ্গ হিসেবে নগরজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি গ্রামজীবনে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। অপর এক সমালোচকের ভাষায় বলা চলে, "আবদুস সাত্তারের কবিতায় রোমান্টিক অনুভূতির সাথে সাম্প্রতি জীবন ও জগতের নানা জটিলতাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মনের এই জটিল গ্রন্থি-উন্মোচনে তিনি অনাবশ্যক তীব্রতা প্রকাশ করেননি বলেই তাঁর কবিতার শরীরে হতাশাবাদ সুস্পষ্ট নয়। নাগরিক জীবনের জটিলতা থেকে মুক্ত হবার বাসনায় তিনি গ্রামজীবনে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাতেও একটি সুস্থ কবিমনের প্রকাশ ঘটেছে। ... বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, 'বৃষ্টিমুখর' আমাদের কাব্যসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।"[৪]

অন্তরঙ্গ ধ্বনি (১৯৭১) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সাকীব ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে। মোট ৪৬টি কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত এ কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে। একাব্যের কবিতায় কবির আত্মগত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ যেমন ঘটেছে তেমনি প্রেম, প্রকৃতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের রূপায়ণ ঘটেছে বিভিন্ন কবিতায়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির নিজস্ব ভাবনার আলোকে মূর্ত হয়ে উঠেছে একাব্যের কবিতাগুলো। সমাজের নানা অসঙ্গতির চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে কোনো কোনো কবিতায়। একাব্য সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য, "অন্তরঙ্গ ধ্বনি"-র কবিতাগুলোতে আবদুস সাত্তারের আত্মগত কবিতার সংযত প্রকরণের সাফল্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে শুদ্ধতার অনুভূতির পরিমিত প্রকাশের উপরেই তাঁর সাফল্য প্রধানত নির্ভর করছে। ... তীব্র অবসাদ কিংবা মরিয়া হতাশার কথা স্পষ্টতই এড়িয়ে গেছেন। আগেই বলেছি, তাঁর স্বভাবেই রয়েছে মূল্যবোধ ও স্থিরতার আদর্শ, যে মনুষ্যত্ব থেকে আমরা ইদানীং নির্বাসিত ও পরিত্যক্ত, মনে হয় আবদুস সাত্তার তাকে তর্কাতীত, নির্দ্বিধায় আত্মস্থ করে নিয়েছেন।"[৫]

অপর এক সমালোচনায় কামালউদ্দীন আকবর বলেন,"In Auntaranga Dhwani the aspirations are most effective as subject for poetry and when they are coupled with an intense personal lyricism. The poet is very conscious of his art and we find him, challenging his own are — in tone the poet is out and out an optimist bursting with vigour and conviction. Most of thepoems are romantic in the classical mould."[৬]

---

১. ড. আশারাফ সিদ্দিকী, 'আগামী' সেপ্টেম্বর ১৯৬০
২. সাপ্তাহিক দেশ, ১২/৯/৫৯ কলকাতা
৩. ফজল শাহাবুদ্দীন, দৈনিক ইত্তেফাক, রবিবার ৬ই ভাদ্র, ১৩৬৬
৪. নজরুল হক, মাসিক মোহাম্মদী, ৩০ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৬৫/৬৬, পৃ. ৮০৮
৫. সিকদার আমিনুল হক, আবদুস সাত্তার, জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৬৩
৬. কামালউদ্দীন আকবর, আবদুস সাত্তার, জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

আমার ঘর নিজের বাড়ি (১৯৭০) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে মুক্তধারা, ঢাকা থেকে। মোট ৪০টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে একাব্যে। স্বদেশ, সমাজ এবং স্বকালকে আত্মস্থ করে একাব্যে কবির আত্মগত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'আমার দেশ' শিরোনামে পাঁচটি খন্ড কবিতায় কবির নিষ্কলুষ দেশপ্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবির নিসর্গপ্রীতির প্রকাশ ঘটেছে বেশ ক'টি কবিতায়। কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে রচিত একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে একাব্যে। বাংলাদেশের প্রকৃতি তথা অরণ্যের শোভা বর্ণনা করে রচিত একটি কবিতাও এতে আছে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব যেমন জীবনে তেমনি কাব্যশিল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে একাব্যের একাধিক কবিতায়। কবির শৈশবস্মৃতি এবং গ্রামে ফিরে যাওয়ার আকূতি নিয়ে রচিত দু'টি কবিতায় কবির বিশেষ জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। একাব্যের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকের মন্তব্য, "আবদুস সাত্তারের কাব্যগ্রন্থ "আমার ঘর নিজের বাড়ি" কবির আত্মগত ভাবনা-চিন্তা, দর্শনের ফসল বলা যায়। আমার দেশ শিরোনামের পাঁচটি খন্ড কবিতায় কবির নিষ্কলুষ দেশপ্রেম ভেসে উঠেছে প্রতিটি ছত্রে-ছত্রে। জন্মভূমির কাছ থেকে জীবন-জন্মের উত্তরাধিকার আত্মস্থ করার প্রচেষ্ট গভীর এখানে। ... শাশ্বত বাংলার অপরূপ শোভায় স্নেহ প্রেম যা জন্মের সাথে, জীবনের সাথে মিশে আছে তার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে এ কবিতাগ্রন্থে।"[১]

---

১. নোমেব শাহরিয়ার, দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে মাঘ, ১৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

শামসুর রাহমান (জন্ম—১৯২৯)

শামসুর রাহমান জন্ম গ্রহণ করেন ২৩শে অক্টোবর, ১৯২৯ সাল বুধবার সকাল দশটায়। ৪৬, মাহুতটুলীর নানার বাড়িতে। পিতা আলহাজ্ব মুখলেসুর রহমান চৌধুরী প্রথম জীবনে পুলিশের চাকুরী করেছেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের পার্টনারশীপ ব্যবসা, পরিশেষে একটি প্রেসের মালিক ছিলেন এবং এর আয় দ্বারা সংসার নির্বাহ করতেন।

শিক্ষাজীবন শুরু হয় ঢাকার পগোজ হাই স্কুলে। এখান থেকেই ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বি.এ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৯৪৭-এ। নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়েও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। কাব্যিকভাবে কয়েক বছর অপচয়ের পর ১৯৫৩-তে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ পাশ করেন। পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পর্ব এম. এ-তে ভর্তি হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পান, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হননি।

প্রথম রচনা একটি গদ্য শোকগাথা। নেহার নামক এক ছোটবোনের মৃত্যুতে ব্যাথিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছিন্নমুকুলের অনুকরণে রচনা করেন এই শোকগাথা। প্রথম কবিতা '১৯৪৯' বেরিয়েছিলো নলিনীকিশোর গুহ কর্তৃক সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলায়'। কলামিষ্ট হিসেবে ছদ্মনাম 'মৈনাক'।

কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকার 'দি মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় দেড়শ ঢাকা মাইনের সাব এডিটর হিসেবে। পরে কিছুকাল রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে কাজ করে ফিরে আসেন আগের কাগজে। ১৯৪৬ সালে 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তাতে যোগ দেন সহকারী সম্পাদক রূপে। ১৯৭৭-এর জানুয়ারি পর্যন্ত সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সম্পাদক পদে উন্নীত হন ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সাংবাদিক হিসেবে ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়া ও ১৯৬৭ সালে তুরস্ক সফর করেছেন। ১৯৮৭ সালে সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রথম সভাপতি।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। এরপর পাকিস্তান আমলে আরো চারটি কাব্য প্রকাশিত হয় রৌদ্র করোটিতে (জুলাই, ১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৩৭৩), নিরালোকে দিব্যরথ (১৩৭৫) এবং নিজবাসভূমে (১৩৭৬)। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত হয় : বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), দুঃসময়ে মুখোমুখি (১৯৭৩), ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি (১৯৭৪), একধরনের অহংকার (১৯৭৫), আমি অনাহারী (১৯৭৬), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৬), শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭), বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭), প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮) এবং আরও অনেক কাব্যগ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ভ্রমণ সাহিত্য-জাতীয় গদ্য রচনাও আছে।

পুরস্কার : রৌদ্রকরোটির জন্যে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৩ সালে। সামগ্রিক কবিকর্মের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৯)। এছাড়া পেয়েছেন জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার (১৯৭৩), একুশে পদক (১৯৭৭), আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮১), নাসির উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্ণপদক (১৯৮১), ভাসানী পুরস্কার (১৯৮২), সাংবাদিকতার জন্য মিৎসুবিশি পুরস্কার (জাপান, ১৯৮২), লেখিকা সংঘ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), পদাবলী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), স্বাধীনাতা পুরস্কার (১৯৯১)।

প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (ফাল্গুন ১৩৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয় বার্ডস অ্যান্ড বুকস, ঢাকা থেকে। কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদে মোট ৩৯টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে একাব্যে। উৎসর্গপত্র রচিত হয়েছে কবিতায় : "আমার খামার নেই, নেই কোনো শস্যকণা/ আছে শুধু একটি আকাশ/ তারই কিছু আলো নীল আজো হে সুদূরতমা/ ভালোবেসে তোমাকে দিলাম।"

এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু সমকালীন জীবন ও জগতের অবক্ষয়, নৈরাজ্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ হতাশা, ব্যর্থতা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার তীব্র সংকট, সুন্দর ও অসুন্দরের বিরোধ। সর্বোপরি মৃত্যুর হাহাকার এবং মৃত্যুস্পৃষ্ট জীবন-ভাবনা।

'উত্তরণ' পত্রিকায় সর্বপ্রথম এ গ্রন্থটির সমালোচনায় মনজুরে মওলা বলেন, "নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সমাজের হাতে আক্রান্ত ভাবার ফলে শামসুর রাহমানের পক্ষে সমাজের স্বরূপ উপলব্ধি সহজ হয়েছে। সমাজের অস্বাস্থ্যকর ও আপাতমনোরম আবহাওয়া বিস্মৃত হতে পারেননি, তিনি দেখেছেন এর কুৎসিত রূপ, দেখেছেন সুন্দরের ছদ্মবেশে অসুন্দরকে।"[১]

'সমকাল' পত্রিকায় এ গ্রন্থ সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান বলেন, "একাব্যগ্রন্থে একদিকে অমৃতের আস্বাদনে এবং খোঁজে মিহিন অনুভবের উল্লাস এবং অপরদিকে তার বিপরীত পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে অমৃতে নিদারুণ নীল বিষের সংক্রমণের সচেতনতা মিশে আছে।"[২] আরো একজন সমালোচক শাহবুদ্দীন আহমদের মন্তব্য, "প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে প্রকাশের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সচেতন প্রতিশ্রুতিশীল একজন কবির জন্ম ঘোষিত হয়েছে। শামসুর রাহমানের বিশেষ মানস-প্রবণতাসমূহ একাব্যে নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করা যায়। নতুন কাব্য সংকলন হিসেবে একাব্য অনির্বচনীয় না হলেও মধুরবচনীয়"।[৩] সম্প্রতিকালে ড. হুমায়ূন আজাদ এ গ্রন্থের বিশ্লেষণে বলেন, "শামসুর রাহমান তার কবিতারাশিতে বাহ্য-জগৎ ও প্রতিবেশকে, তাঁর সমগ্র চরিত্রকে, শুষে নিয়েছেন নিজের অন্তর্লোকে এবং পরিণত করেছেন কবিতায়। তাই তাঁর কবিতা ধ্যান বা স্তব বা গান বা শাশ্বত শ্লোক নয় তা সমকালীন জীবনসৃষ্টি।[৪]

অর্থাৎ যে সমকালীন সমাজে মানুষের জীবন-ধারণের ন্যূনতম নিশ্চয়তা অনুপস্থিত সেখানে একজন কবিকে দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক গতানুগতিকতায় বেঁচে থাকার আকুল চেষ্টা থেকেই কবিতার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। ফলে বিষন্ন জগতের বাসিন্দা হিসেবে একাব্যে এক প্রাণহীন মৃত্যুময় পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন তিনি।

রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩) প্রথম প্রকাশিত হয় পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘ, ঢাকা থেকে। মোট ৪৬টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্থে কবি এক নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত, যে চেতনা বিষাদময় ভাবের

---

১. মনজুরে মওলা, উত্তরণ, ২য় বর্ষ ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, ১৩৬৭, পৃ. ১৫৭
২. হাসান হাফিজুর রহমান, সমকাল, ৪র্থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃ. ৮৯৪
৩. শাহবুদ্দীন আহমদ, মাসিক পূবালী, ১৩৫৯ সাল
৪. ড. হুমায়ূন আজাদ, নিঃসঙ্গ শেরপা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ. ২১, ২২

Dhaka University Institutional Repository

দ্যোতক। বলা যায় কবির অন্তর্মুখী বিষাদের ভাব একাব্যে নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। নিরন্তর দুঃখের উন্মীলন সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যেও এক ধরনের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে এর কোনো কোনো কবিতায়। ঢাকাকেন্দ্রিক পরিবেশে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের তুচ্ছতা, একঘেয়েমি এ কাব্যের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সমসাময়িক জীবন-ধারার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সমাজ সচেতন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে স্পষ্ট। আদর্শ ও মূল্যবোধের পচন, স্রষ্টা সৃষ্টি ও আত্ম সম্পর্কিত কবির অনাস্থার বোধও প্রকটভাবে স্পষ্ট। 'সমকাল' পত্রিকায় একাব্যের সমালোচনায় আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, "চাঁদ-পাখি-গোলাপের এই কবিও ঘৃণায়-বেদনায়-আক্রোশে কখনো কখনো ঠোঁট বেঁকিয়েছেন, তার বঙ্কিম স্বাক্ষর তাঁর এই গ্রন্থে সংকলিত বেশ ক'একটি ব্যঙ্গ কবিতার আয়তনে। তবে ব্যঙ্গ কবিতার জাত আমরা হালকা বলে জানি এবং প্রসঙ্গে মহিমাচ্ছায়ায় শায়িত রচনাবলিতে যে-শামসুর রাহমান ফুটে উঠেছেন তিনি আশা-ভরসা বিশ্বাসী : তার স্বপ্নঘন চোখের ভিতরে করোটিতে রৌদ্র খেলা করে, শবাধারে জ্যোৎস্না, ক্ষত ফল"।[১]

এ গ্রন্থ সম্পর্কে ড. রফিকুল ইসলামের মন্তব্য, "জীবন যতই বিবর্ণ হোক, পৃথিবী যতই প্রাণহীন হোক, এ জীবনেরও একটা অর্থ দ্বিতীয় কাব্যে কবির কাছে স্পষ্ট, বাঁচার আনন্দও ঘোষিত। মৃত্যুময় এক পৃথিবী থেকে জীবনের সম্ভাবনাময় এক পৃথিবীতে কবির উত্তরণ। ... আমাদের ষাটের দশকের সমাজের, আমাদের দেশের প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করেছেন শামসুর রাহমান আশ্চার্য নিপুণতার সঙ্গে। শামসুর রাহমানের এ শ্রেণীর রচনাবলী ঐ সময়ের বিশ্বস্ত দলিল।"[২] ড. হুমায়ুন আজাদের বিশ্লেষণ, "রৌদ্র করোটিতে শামসুর রাহমানের এক বিশাল পদক্ষেপ স্বপ্নলোক থেকে বস্তু-বাস্তব-জীবন পরিপার্শ্বিকের অভিমুখে; এরপরে তিনি যে ভূমিতে পা রাখবেন তার নাম সমকাল।"[৩] অর্থাৎ একাব্যে কবি-মানসের দু'টি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এক, মৃত্যুকে অমোঘ জেনেও এখানে তিনি স্বপ্নের পথে পৃথিবীকে খুঁজছেন বাঁচার আনন্দে। দুই, পৃথিবীর মলিনতার রুক্ষতা সর্বোপরি সমকালীন সমাজ ও নগরজীবনের হতাশা ও অবয়বহীনতা প্রত্যক্ষ করে আশ্রয় নিয়েছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে।

বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৬) প্রকাশিত হয় বইঘর, চট্টগ্রাম থেকে। মোট ৪৫টি কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত একাব্যের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যে সমকাল, তার দাবদাহেই যেন বিধ্বস্ত হয়েছে নীলিমা, নষ্ট হচ্ছে বিশ্বাস, চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে ভীতি, বিনষ্ট হচ্ছে সভ্যতা — এক কথায় এক হিংস্র সময়ের গহ্বরে পরিব্যাপ্ত যে নৈঃসঙ্গ্য ও শূন্যতার বোধ তাকে অঙ্গীকার করেই কবি তাঁর পরিপার্শ্বকে চিত্রায়িত করেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে। এ কাব্যের আলোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "'বিধ্বস্ত নীলিমায়' শামসুর রাহমানের বাস্তববোধ আরও তীক্ষ্ণ আরও তীর্যক যে বোধ ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। কবিতার ভাষাও এ কাব্যে চকচকে, ধারারো, পাঠকের বিবেককে আমূল বিদ্ধ করে।"[৪]

ড. মধুসূদন চক্রবর্তীর মন্তব্য, "পৃথিবীর রূপ কবির চোখে একই থেকে গেছে, জীবনের বোধগুলো হারিয়ে যাবার বেদনা ও যন্ত্রণা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে একটি অস্থির, অসামঞ্জস্যপূর্ণ

---

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, সমকাল, কবিতাসংখ্যা, ৮ম বর্ষ ১৩৭২, পৃ. ৬৩২
২. ড. রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ৬৪, ৬৫
৩. ড. হুমায়ূন আজাদ, নিঃসঙ্গ শেরপা, পৃ. ৫১
৪. আধুনিক কবিতা, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

হতাশাগ্রস্ত সমাজ জীবনকেই তিনি প্রতীকায়িত করেছেন এখানে। তবে শ্যামল পৃথিবীর নীলিমা বিধ্বস্ত হবে জেনেও আশা ও আশ্বাসের সুর একেবারে হারিয়ে যায়নি কবির কণ্ঠ হতে।"[১]

ড. হুমায়ূন আজাদের মন্তব্য, "শামসুর রাহমান তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে নির্মাণ করেছেন সমকাল নামক এক নায়ক-সম্রাটকে এবং তিনি নিজে পরিণত হয়েছেন সে হননপ্রিয় অপরিহার্য দুঃসহ সময়ের নান্দী ও নিন্দামুখর সভাকবিতে। ... অর্থাৎ সমকালের প্রেমে অপ্রেমে স্তবেনিন্দায় বিধ্বস্ত নীলিমা'র কবিতাগুচ্ছ কম্পমান।"[২]

পৃথিবী জুড়ে আজ যে দুঃসময় — ভীতিকর পরিবেশ, বলাবাহুল্য, একাব্যের পটভূমি এ পরিবেশকে বদলানোর ক্ষমতা রাখে না। সেজন্য ক্ষুধার চীৎকার, নর্দমার গন্ধ, দারিদ্র্যের দাঁত ও কিনু গোয়ালার গলি থেকে পালিয়ে শামসুর রাহমান আশ্রয় সন্ধান করেছেন নীলিমায়।

নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয় মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কবি বিষ্ণু দে-কে। মোট ৪৭টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি পূর্ববর্তী কাব্য থেকে অনেকাংশে পৃথক। বিষয়বস্তু হিসেবে আগের কাব্যগুলোর মতোই এখানেও ব্যক্তিক অনুভবজাত নৈঃসঙ্গ্য ও শূন্যতার কথা, ব্যক্তিমানসের অসহায়ত্ব, আর্তনাদ, হাহাকার, স্বপ্ন ও ব্যর্থতার কথা থাকলেও তা ক্রমশ বিলীন হয়ে মৃত্তিকা-সংলগ্নতা, সমষ্টির আবেগের সঙ্গে একাত্মতা স্পষ্ট হয়েছে। পরিবেশ এখনও সহনশীল নয়, একটা চাপা অথচ তীব্র অভিযোগ আগাগোড়া পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ একাব্যে স্বদেশের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা দুর্ভিক্ষ - প্রপীড়িত, পরজাতি-পদানত, হতশ্রী ও গৌরবম্লান। শুধু স্বদেশ নয় আন্তর্জাতিক সংকট ও সমস্যাও একাব্যের কোনো কোনো কবিতার বিষয় হয়েছে। একাব্য সম্পর্কে ড. রফিকুল ইসলামের মন্তব্য, "শামসুর রাহমান একাব্যে জীবনকে নতুনভাবে দেখেছেন, জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছেন, জীবনকে নতুনভাবে বর্ণনা করেছেন। এ জীবন সেই পোড়ো বাড়ির, সেই কবরের নিথর, হিমেল জীবন নয়, এ জীবন বাঁচার আনন্দে, সংগ্রামের মহিমায় উত্তপ্ত জীবন।"[৩]

অর্থাৎ একাব্যের পটভূমি যেহেতু ঊনসত্তরের পূর্ববাংলা — সেহেতু বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করে বৃহত্তর জনজীবনের সমীপবর্তী হওয়ায় কবির রচনাতেও গুণগত পরিবর্তন এসেছে। এ গ্রন্থের বিশ্লেষণে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "নিরালোকে দিব্যরথ-এর কবিতায় কোথাও কোথাও হতাশার সংক্রমণ এবং তজ্জনিত মরবিডিটি লক্ষণীয়। বৃহত্তর সমাজের সাথে একাত্মবোধের আকাঙ্ক্ষা কোথাও কোথাও ব্যাপ্ত কিন্তু নাগরিক সমাজ এবং জীবনের জটিলতা ও সংকট তুলে ধরাতেই যেন তাঁর প্রবণতা।"[৪]

ড. মধুসূদন চক্রবর্তীর মন্তব্য, "নিরালোকে দিব্যরথ গ্রন্থে কবির যে জ্বালা ছিল, অন্তর্দাহ ছিল, তা তীব্র হয়েছে, তিনি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন, মাটির সঙ্গে আরো যেন দৃঢ় সংবদ্ধ হয়েছেন,

---

১. পূর্ববঙ্গের কবি ও কবিতা, পৃ. ২৪১
২. নিঃসঙ্গ শেরপা, পৃ. ৫১
৩. আধুনিক কবিতা, পৃ. ৬৮
৪. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, 'পঁচিশ বছরের কবিতা', উত্তরাধিকার, ২য় বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা ১৯৭৪, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিকারের জন্যে তাঁকে আরো সোচ্চার হতে দেখি, জাড্য কাটিয়ে উঠতে দেখি, বাঙ্ময় ও সক্রিয় হতে দেখি।"[১]

এ কাব্য সম্পর্কে হুমায়ূন আজাদের মন্তব্য, "শামসুর রাহমান একাব্যে আয় করেছেন সকল কালের সফল কবির যা কাম্য, সে পরম গভীরতা-গাঢ়তা, ব্যাপকতা, ফলে "নিরালোকে দিব্যরথ" আত্মনুকরণ, আত্মপরিক্রমার উদাহরণ না হয়ে, হয়ে উঠেছে আত্মসিদ্ধির নমুনা।"[২]

নিজ বাসভূমে (১৯৭০) প্রথম প্রকাশিত হয় আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা থেকে। মোট ৫৮টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'আবহমান বাংলার শহীদদের উদ্দেশে'। একাব্যের অধিকাংশ কবিতার পটভূমি স্বদেশ, স্বসমাজ এবং স্বকাল। সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা সংকট, আন্দোলন-প্রতিআন্দোলন কবির মনে যে আবেগ অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে, তারই আলেখ্য রূপায়িত হয়েছে এখানে। পূর্বোক্ত কাব্যের ব্যক্তিগত বিষাদ একাব্যে পরিণতি পেয়েছে সমষ্টির বিক্ষোভে, বিদ্রোহ ও স্বাধিকার কামনার ভেতর দিয়ে। প্রেম ও শিল্প বিষয় ছাড়াও একাব্যে মাতৃভাষার — দুঃখিনী বর্ণমালার — জন্যে কবির সজল অনুভব ফুটে উঠেছে কোনো কোনো কবিতায়।

এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর-পরই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় এর সমালোচনায় বলেন, "তাঁর কবিতায় যে বাংলা ক্রমাগত স্পষ্টরেখায় ফুঠে উঠেছে তা রূপসী বাংলা নয় — সালাম বরকতের বাংলা, পিতামহ মাতামহের বাংলা, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রমেশ শীলের বাংলা।"[৩]

তবে একথা ঠিক যে, পাকিস্তানী স্বাধীনতা যে সত্যিকার স্বাধীনতা নয় — এই উপলব্ধি দেশবাসীর মনে ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠেছে এই সময়ে। ফলে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের একত্রীভূত হওয়ার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায় একাব্যে। এর হাড্ডিসার কৃষক, মেঘনার মাঝি, চটকলের শ্রমিক, কামার-কুমোর, তাঁতী, কেরানী, ছাত্র, লেখক, সবাই একই উদ্দেশ্য সাধনের প্রত্যয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিছিলে শরীক হয়েছে। এই জনতার সঙ্গে কবিও মিলিত হয়েছেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে শহর-স্বদেশ কাঁপানো শ্লোগানে, শহর শূন্যকরা হরতালে। এসময়ে, অর্থাৎ ষাটের দশকে জনগণের আত্মঅধিকারের প্রশ্ন তো দূরের কথা, মার কাছে শেখা মুখের ভাষা বলবারও উপায় নেই। অন্যায় দখলকারীর চাপে জীবনই মোহ্যমান। শ্বাসরোধকারী হাওয়া প্রকট। মানুষের মুখে এ অসন্তোষের ভাষা স্ফুটনোন্মুখ। কবি সেই ভাষার রূপকার এখানে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে ড. হুমায়ূন আজাদের মন্তব্য, "নিবাড়ূ'র কবিতা রাশিকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব : প্রথম ও প্রধান গুচ্ছে রয়েছে স্বদেশকেন্দ্রিক কবিতাবলি, আর দ্বিতীয় গুচ্ছে রয়েছে অন্যান্য কবিতা, যেগুলোর কোনোটির মধ্যে বাসা বেঁধেছে প্রেম, কোনোটিতে কামনা, আর কোনোটিতে কবিতা নির্মাণকলা।"[৪]

---

১. বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা, পৃ. ২৪২
২. নিঃসঙ্গ শেরপা, পৃ. ৮০
৩. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, পূর্বমেঘ, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭, পৃ. ৮৪
৪. নিঃসঙ্গ শেরপা, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

আজীজুল হক (১৯৩০)

যশোর জেলার তারাউজল গ্রামে আজীজুল হক জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ। পিতা মরহুম জবেদ আলী ছিলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর। বাবার বদলীজনিত চাকুরীর কারণে শৈশবে বিভিন্ন জেলা-মহকুমার স্থলে পড়াশোনা করে ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন শ্রীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে। ১৯৪৯ সালে আই.এ পাশ করেন বাগেরহাটের পি.সি কলেজ থেকে। ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন ১৯৫১ সালে এবং ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে সাতক্ষীরা কলেজ, খুলনায় কর্মরত ছিলেন ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। এরপর যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করে এই কলেজ থেকেই অবসর গ্রহন করেন। বর্তমানে অবসর জীবন-যাপন করেছেন যশোরেই।

শৈশবে পিতাই ছিলেন কবির কাব্যকর্মের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস। তিনি চিত্রাঙ্কনে অনুরাগ দেখে রঙ তুলি ইজেল পুত্রের হাতে তুলে দেন। ছবির জন্য ছন্দোবদ্ধ ক্যাপশন লিখতে গিয়ে ক্ষুদে চিত্রকর আজীজুল হক প্রথম একটি পদ্য রচনা করেন। তিনি তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। এরপর মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত 'মা মরার কাব্য' শিরোনামে তিনি একটি কবিতা লেখেন। এটাই কবির প্রথম কবিতা — ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়েছেলো শিশু সওগাত পত্রিকায়। এর পর থেকে কলকাতার শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কবির লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমকাব্য গ্রন্থ 'ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এরপর 'বিনষ্টের চিৎকার' (১৯৭৬) এবং 'ঘুম ও সোনালি ঈগল' (১৯৮৯) প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ গ্রন্থ 'অস্তিত্ব চেতনা ও আমাদের কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৫ সালে। এছাড়া সম্পাদনা এবং মঞ্চ অভিনয় পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত একুশে ভিত্তিক 'কৃষ্ণচূড়ার তৃষ্ণা' ও নজরুল ইসলামের জীবনভিত্তিক 'অগ্নিবীণা' শীর্ষক দু'টি ছায়ানাট্য বিভিন্ন সময়ে মঞ্চে ও বেতারে অভিনীত ও প্রচারিত হয়েছে। 'কপোতাক্ষ' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন বেশ কিছুদিন। ১৯৬১ সালে প্রচন্ড রবীন্দ্র-বিরোধিতার মুখে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীতে 'চন্ডালিকা' মঞ্চায়ন ছিল তাঁর সাহসী পদক্ষেপ।

সাহিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৮৯ সালে। যশোর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ের পঁচিশ বছরের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সফল নেতৃত্বদানের জন্যে ১৯৮০ সালে আজীজুল হককে বিশেষ পদকে ভূষিত করা হয়।

ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে (১৯৬৯) প্রকাশিত হয় সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। মোট ২২টি কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত একাব্যের নামকরণের মধ্যেই কবির পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকীয় জীবনানুভব প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ঝিনুকের কুন্ডলায়িত অন্তঃগহ্বরে বন্দী সমাজচেতনা প্রবাহের মুক্তির প্রোজ্জ্বল উচ্চাশা ব্যক্ত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। জাতীয় অস্তিত্বের অনুভব সূত্রেই কবির বিশ্বজনীন চেতনা সময়, ইতিহাস ও সভ্যতার অন্তরালবর্তী স্বরূপ-সত্যকেও স্পর্শ করেছে কোনো কোনো কবিতা। সমাজ দেহের নানা অবক্ষয়ের চিত্র রূপায়ণের পাশাপাশি নারী প্রেমের শাশ্বত রূপটি প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে একাধিক কবিতায়। গ্রন্থটি প্রকাশের পরে বিশিষ্ট সমালোচক সন্তোষ গুপ্ত এর আলোচনায় বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"আজীজুল হক আত্মাকে দেখেছেন ঝিনুকের মধ্যে মুক্তোর মতো। কডওয়েলের ভাষায় বলা যেতে[১] পারে, সমাজের ক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকাটা যেন ঝিনুকের ভিতর মুক্তো — সংস্কৃতির ধারাটা তাই। তাকে বিশিষ্ট করতে হলে ঝিনুক থেকে আলাদা করতে হবে নতুবা মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে তা সম্ভব।"[১] বলা যায় তাঁর সমাজমনস্ক কবিদৃষ্টি সময় ও সমাজের যন্ত্রণাকাতর উপলব্ধি থেকে জীবনের যে চলমান প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে তা জীবনের সমগ্র অস্তিত্বের সাথে নিগূঢ় সূত্রে জড়িত।

---

১. সন্তোষ গুপ্ত, দৈনিক সংবাদ, ৩রা আষাঢ় ১৩৮৫ (রোববারের সাময়িকী)

Dhaka University Institutional Repository

হাসান হাফিজুর রহমান (জন্ম ১৯৩২ – মৃত্যু ১৯৮৩)

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে হাসান হাফিজুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩২ সালের ১৪ই জুন। পিতা আবদুর রহমানের স্বপ্ন ছিল তিনি চিকিৎসক হবেন। ১৯১৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তিও হয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তারী পড়াশোনা শেষ হবার আগেই শিক্ষাবিভাগে চাকুরী পেয়ে গেলে আর তাঁর পড়া হয়নি।

হাসান হাফিজুর রহমানের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ঢাকার নবকুমার হাইস্কুলে। এরপর জামালপুর ও বরিশালে কিছুকাল পড়াশোনা করে পরে ১৯৪৬ সালে কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ পাশ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৫১ সালে অনার্স পরীক্ষা না দিয়ে পাস কোর্সে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। পরবর্তীকালে বাংলা নিয়ে এম.এ পাশ করেন ১৯৫৫ সালে।

কর্মজীবন তাঁর বহুবিস্তৃত ও ব্যাপক। শুরুতেই দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে ১৯৫৫-৫৭ পর্যন্ত কাজ করেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করেন ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত। এরপর দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক পদে (১৯৬৫-৭১) কাজ করেন। 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা প্রকল্পে'র পরিচালক ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থেকেছেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সম্পাদক ছিলেন। নিখিল পাকিস্তান আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের সম্পাদক ও পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক (১৯৬৮-৬৯) ছিলেন। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মস্কোর সেন্ট্রাল ক্লিনিক হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল। পরে বাংলার মাটিতেই বনানী কবরস্তানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

হাসানদের বাড়িতে ছিলো একটি পারিবারিক লাইব্রেরী। সেই লাইব্রেরীতে তাঁর বাবার সংগ্রহে যেমন ছিলো বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের বই তেমনি মায়ের সংগ্রহে থাকতো মুসলমান লেখকদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ। উভয় সম্প্রদায়ের লেখকদের বইয়ের সমাহারে বাড়িতে ছিলো একটা ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ। ফলে শুধু পাঠ্যবিষয় হাসান হাফিজুর রহমানকে নির্দিষ্ট গন্ডীতে আটকে রাখতে পারেনি। একটা নিভৃত শিল্পী মন তাঁকে অনুসন্ধিৎসু করেছে সৃষ্টির প্রেরণায়। পাশাপাশি ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে তিনি ফজলুল হক হলের মুসলিম লীগের ছাত্রফ্রন্ট থেকে এ.জি.এস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। এম.এ পড়াকালীন সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত হন। একদিকে বিশ্ববিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলী, অপরদিকে রাজনৈতিক গ্রন্থাবলী তাঁর মননকে উৎকর্ষ দান করেছে, সমৃদ্ধ করেছে।

এই পটভূমিতে হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৫৩ সালে আমাদের সাহিত্যের জন্যে এমন একটি সংকলন উপহার দিলেন যা পরবর্তীকালে একুশ, সাহিত্য ও রাজনৈতিক এক্ষেত্রে একটা মাইল ফলক হয়ে রইলো। কবি সমালোচক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত হয়েছে তিনটি কাব্যগন্থ : 'বিমুখ প্রান্তর' (১৩৭০), 'অন্তিম শরের মতো' (১৩৭৫) ও 'আর্ত শব্দাবলী' (১৩৭৫)। তাঁর আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫) পূর্ববাংলার কবিতার উপর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা গ্রন্থ। তিনি প্রথম একুশের সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৫৩) সম্পাদনা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর আরো ক'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'যখন উদ্যত সঙ্গীন'

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৭২), 'বজ্রে চেরা আঁধার আমার' (১৯৭৬), 'শোকার্ত তরবারী' (১৯৮২), 'আমার ভেতরের বাঘ' (১৯৮৩), 'ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী' (১৯৮৩) ছাড়াও প্রবন্ধগ্রন্থ, ভ্রমন কাহিনী, গল্পগ্রন্থ, পত্র-সাহিত্য-জাতীয় রচনাও রয়েছে।

সাহিত্য শিল্পের অবদানের জন্যে তিনি কয়েকবার পুরস্কৃত হয়েছেন। কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭১ সালে। এছাড়া লেখক সংঘ পুরস্কার (১৯৬৭) আদমজী পুরস্কার (১৯৬৭) সুফী মোতাহার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৬), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১) সওগাত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২)-ও পেয়েছেন।

বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩) প্রথম প্রকাশিত হয় পারাবত প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। মোট ৩৭টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত একাব্যের মূল সুর স্বদেশ-চেতনা। দেশ, মাটি ও মানুষের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত এই কবি সমকালীন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্তি-আকুলতা এবং সংগ্রামী চেতনাকে কাব্য রূপ দিয়েছেন একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। স্বদেশের মাটি ও মানুষের পারিপার্শ্বিকতা তিনি উদগ্র কৌতূহলে প্রত্যক্ষ করেন, সমস্যার জটিল জটাজালের গভীরে প্রবেশ করে এক নিরুচ্চার বোবা-বেদনায় কেবলি অসহায় এবং আর্ত-রব উচ্চারণ করেন। ব্যক্তিগত কিংবা একান্ত মনোগত কোনো বেদনায় তিনি বিপর্যস্ত নন, বিভ্রান্ত নন নিয়তি-নির্ধারিত কোনো বিপর্যয়ে। একাব্যে তাঁর অনুভব ও অধ্যয়ন দেশ-মাটি-মানুষের মর্মমূলে প্রসারিত, চিরচেনা ছবিকে ঘিরে, প্রাত্যহিক জীবনের জটিলতাকে আশ্রয় করে এক আর্তউচ্চারণে বাণীময়। একাব্যের সমালেচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'বিমুখ প্রান্তর' নামের মধ্যে এলিয়টের The waste land-এর সাদৃশ্য কেউ খুঁজতে পারেন। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে দূরত্ব বিস্তর। ... বলা চলে এ প্রান্তর 'আপত বিমুখ', 'আপাত বন্ধ্যা' কারণ এ প্রান্তর 'বন্দিনীর প্রহসনে চিত্রার্পিতা, সর্বোপরি মাটি বোবা নয়, শ্যামলিমা অনুভূতি শূন্য নয়, তাদেরো অবিরাম বিক্ষুব্ধ উৎসমুখ আছে। কিন্তু কোলাহলে তৃপ্ত দেশ, কোলাহলে মগ্ন দেশ, অজান্তে সহজে চলে।"[১]

এ গ্রন্থের অপর এক সমালোচনায় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "স্বদেশের 'বিমুখ প্রান্তর' হাসান হাফিজুর রহমান প্রত্যক্ষ করেছেন; কিন্তু এ -সত্ত্বেও আশাবাদিতা এবং সম্ভাবনার দিগন্ত তাঁর দৃষ্টি থেকে বিলীয়মান হয়ে যায়নি। সবরকম বিপর্যয় ও প্রতিকূল পরিবেশ এবং নৈরাশ্যের মধ্যেও তিনি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল মুখ প্রত্যক্ষ করেন।"[২]

আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয় পুথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। মোট ৩২টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত একাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবি শামসুর রাহমানকে। একাব্যের রচনাকাল ১৯৫৫-৬০। একাব্যের উপজীব্য স্বদেশ এবং সমকালীন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-নিরাশা স্বপ্ন ও ব্যর্থতার চলচ্ছবি। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির যে রূপ-বৈচিত্র্য তা মূর্ত হয়ে উঠেছে কোনো কোনো কবিতায়। শেক্সপিয়রের হ্যামলেট ও ওডেসিউস বিষয়ক দু'টি কবিতাও স্থান পেয়েছে একাব্যে। এছাড়া জগৎ ও জীবন সম্পর্কে রচিত নিজস্ব মনোভঙ্গির তথা চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে বেশ ক'টি কবিতায়।

এই কাব্য সম্পর্কে সমালোচক বশীর আল হেলালের মন্তব্য, "হাসান হাফিজুর রহমানের 'আমি' বস্তু নিরপেক্ষ বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়, বরং তা সচেতন 'আমি'। বিরূপ ব্যভিচারী পারিপার্শ্ব

---

১. আঞ্চলিক কবিতা, পৃ. ৭২,৭৩
২. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পঁচিশ বছরের কবিতা, পৃ. ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে বিব্রত ও হতাশ করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জাগ্রত হন, গভীর আশা ও সম্ভাব্যতায় উত্তীর্ণ ও উজ্জীবিত হন। তিনি প্রধানত জীবনবাদী, গোষ্ঠীচেতনার কবি। সংগ্রামী বস্তুচেতনা তাঁর কাব্যদর্শন।"[১]

অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয় সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। মোট ২৫টি কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত একাব্যের স্বদেশ চেতনার সঙ্গে অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনার সমন্বয় লক্ষণীয়। স্বদেশের আর তার মানুষের প্রকৃত পরিচয়ের জন্যে তিনি কখনো স্বদেশের ইতিহাস আবার কখনো বা তার কিংবদন্তীর রাজ্যে পরিব্রাজক। এছাড়া 'গ্রহণগ্রস্ত নগরী' অনিকেত সমস্যা এবং মৃত্যু চিন্তা বিষয়ক তিনটি কবিতাও স্থান পেয়েছে এখানে। এ গ্রন্থের সমালোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "স্বদেশ আর স্বজাতির বিশ বছরের প্রকৃতি, তাঁর সংগ্রাম, তাঁর পরাজয়, তাঁর আশা আর হতাশা পূর্ববাংলার আর কোনো কবির কবিতায় এমন বিশ্বস্তভাবে ধরা পড়েনি। ... স্বদেশের প্রতিরূপ হাসানের কবিতায় মহিমান্বিত, গৌরবমন্ডিত, কিন্তু দেশবাসীর প্রতারক রূপ খুবই আশাভঙ্গের, এই দুই প্রকৃতির যে সংঘাত তা হাসানের কবিতাকে করেছে প্রাণবন্ত, জ্বালাময়।"[৩]

যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২) প্রথম প্রকাশিত হয় মডার্ন ফাউন্ডার্স, প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ঢাকা থেকে। মোট ৩১টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে হলেও এ অধিকাংশ কবিতা ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে রচিত। এই সময়ে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আশায় পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের যে পটভূমি তৈরি হচ্ছিল, তাঁর প্রভাব কবিতাগুলোতে পড়েছে। 'স্বয়ং মেঘনার ঢল' কবিতায় কবি বাংলার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে দেখেছেন লক্ষ মানুষের মিছিলের মধ্যে। মেঘনার ঢল যেমন সবকিছুকে ভেঙে একাকার করে দেয়। তেমনি মিছিলও কৃত্রিম জীবনযাত্রা ভেঙে দিয়ে শহরকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে একই সমতলে হাজির করে। এই একতার বোধকেই তিনি কাব্যরূপ দিয়েছেন এ কবিতায়। সমসাময়িক জীবনের বাস্তবতা, তাঁর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, স্বদেশের মানচিত্র, পতাকা, শত্রুর লাশ — এসবই কাব্যরূপ লাভ করেছে এগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায়। সম্ভবত একারণেই একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "হাসান হাফিজুর রহমান আমাদের রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনের কবি-ভাষ্যকার।"[২] এ গ্রন্থ সম্পর্কে বশীর আল হেলালের মন্তব্য, "যখন উদ্যত সঙ্গীন নামক গ্রন্থে তাঁর ১৯৭১-৭২ সালে রচিত কবিতা সংকলিত হয়েছে। বিষয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং কবির উচ্চকিত ঘৃণাক্ষুব্ধ বীর্যবন্ত স্বাদেশিক হৃদয়। বাংলাদেশের কবিতায় কী গালাবদল সম্ভব, তার আভাস হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় লাভ করা যায়।"[৪]

---

১. বশীর আল হেলাল, সাম্পাতিক কবি, সাম্প্রাতিক কবিতা, পৃ. ৩২
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. ৭৬
৩. সৈয়দ আলী আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে, পৃ. ১১৮
৪. সাম্প্রতিক কবি, সাম্প্রতিক কবিতা, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্দিন আল আজাদ (জন্ম ১৯৩২)

ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে আলাউদ্দিন আল আজাদ জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩২ সনের ৬ই মে। পিতা গাজী আবদুস সোবহানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নবম শ্রেণী পর্যন্ত। কৃষিকাজের তদারকি ছাড়াও তিনি গ্রামীণ সমবায় সমিতির সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

আলাউদ্দীন আল আজাদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় রামনগর জুনিয়র মাদ্রাসায়। ১৯৪২ সালে তিনি জুনিয়ার মাদ্রাসা পরীক্ষায় পাস করে ১৯৪৩ সালে নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। এবং এম.এ.তেও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ১৯৫৪ সালে। ১৯৭০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন শুরু করেন তোলারাম কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে ১৯৫৫ সালের দিকে। ১৯৫৬-তে তিনি জগন্নাথ কলেজে যোগদান করেন। তবে ১৯৬২ সালে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হওয়ার দরুণ এই কলেজ থেকে চাকুরীচ্যুত হন। তখন পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজে প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে চাকুরী করে বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মে নিয়োজিত আছেন। বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৮৬ সালে যুগোশ্লাভিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কবিতা-উৎসবে তিনি একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সম্মেলন ও সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বুলগেরিয়া (১৯৭৪), জর্জিয়া (১৯৭৮), নেপাল (১৯৮৬), নেপাল (১৯৮৮), জাপান, চীন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন (১৯৮৮) সফর করেন।

এক বছর বয়সে মাতৃহীন এবং শৈশবেই পিতৃহীন বালক আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নিমন্ত্রণ' নামে প্রথম কবিতা 'যুগান্তর' পত্রিকায় ছোটদের পাততাড়ির পাতায় ছাপা হয়। এই সময়ে স্কুলের শিক্ষকরা তাঁকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মানচিত্র' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। এই সময়ে নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে তিনি ঢাকা সেন্ট্রার জেলে কারাবাস ছিলেন। এরপর 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ' (১৯৬৫), 'সূর্যজ্বালার সোপান' (১৯৬৫) এবং 'লেলিহান পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধগ্রন্থ এবং গবেষণা গ্রন্থও রয়েছে তাঁর। প্রধানত তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

সাহিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেছেন। বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৪), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৫), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬) একুশে পদক (১৯৮৬), শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭)।

মানচিত্র (১৯৬১) প্রথম প্রকাশিত হয় কোহিনূর লাইব্রেরী, ঢাকা থেকে। মুখবন্ধসহ মোট ৪৩টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। সমকালীন 'যুগ চেতনা এবং সমাজ বাস্তবতার' রূঢ়তা, শোষণ-শাসন, বৈষম্য, আর বাস্তবের রূঢ় বৈপরীত্য একাব্যের উপজীব্য। বেশ কয়েকটি কবিতায় জীবনকে পূর্ণভাবে চাওয়ার পাশাপাশি বঞ্চনা বৈপরীত্যের সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনের প্রাপ্য অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদির সঙ্গে না পাওয়ার বিরোধ, প্রার্থিত সুন্দরের সঙ্গে বাস্তবের টানাপোড়েন এবং এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন কবিতায়। বলা যায় মধ্যবিত্ত জীবনের বঞ্চনা, হতাশা এবং বস্তির মানুষের জীবনালেখ্যই একাব্যের বিভিন্ন কবিতায় রূপ পেয়েছে। এছাড়া ১৯৫২ 'এর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি নিয়ে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য কবিতাও স্থান পেয়েছে একাব্যে। চীনারীতির একটি কবিতা দশ স্তবকে স্থান পেয়েছে একাব্যে। জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে কবির বিশেষ জীবন উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে দু'টি কবিতায়। গ্রাম্যজীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত কৃষকের দুঃখ ও বঞ্চনার কথাও ভাষারূপ পেয়েছে একটি কবিতায়।

এ গ্রন্থটির সমালোচনায় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "তাঁর সমসাময়িক কবিদের অনেকেই (সেই '৫০ এর দশকে) রোমান্টিক কবিতা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল সমাজ-বাস্তবতার দিকে, যদিও বৃহত্তর সমাজ এবং জীবন নয়, নাগরিক সমাজ ও জীবনই ছিল তাঁর প্রধান উপজীব্য। সমাজ জীবনের বাস্তবতা রূঢ়তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল সমাজ-আলেখ্য রচনায়। ... তাই পৃথিবীর রূপ-সৌন্দর্যের বন্দনায় নয়, আলাউদ্দিন আল আজাদ কবিতাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে।"[১]

ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য ভবন, ঢাকা থেকে। ১৯৬১ সালের মে থেকে নভেম্বর '৬১ পর্যন্ত রচিত কবিতা থেকে নির্বাচিত মোট ২৩টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। একাব্যের পূর্বলেখে গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয় এভাবে, "এই সংগ্রহের কবিতাবলী পাঁচই মে থেকে ঊনত্রিশে নভেম্বর (১৯৬১) পর্যন্ত ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে আমার কারাবাসকালে রচিত। গ্যাগরিন কবিতাটি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের গৌরব পৃথিবীর প্রথম মহাশূন্যযাত্রী য়ুরী গ্যাগরিনের পাকিস্তান সফরের খবর পড়ে লিখিত হয়েছে।"[২]

একাব্যেও সমকালীন সমাজ জীবনের নানা অভিক্ষেপ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ক্লান্তি-হতাশা ছাড়াও একধরনের আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে নিবিড়-নৈকট্য সত্ত্বেও তিনি স্বপ্নরিক্ত কিংবা হতাশ্বাস নন। এছাড়া প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন কবিতায়। আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত হয়েছে একাব্যের একাধিক কবিতা। কবি গ্যেটে স্মরণে এবং ফাউস্টের সংকল্প নামে দু'টি কবিতাও স্থান পেয়েছে এতে। পৌরাণিক ইউসুফ-জুলেখার প্রেম কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে তিন পর্বের একটি কবিতা। একাব্যের বিশ্লেষণে বশীর আল হেলাল বলেন, "বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাদর্শ তার কবিতাকে বিশেষভাবে প্রাণবন্ত করেছে। তাতে একদিকে রয়েছে তাঁর দেশের মাটির গন্ধ, অন্যদিকে বঞ্চনাদীর্ণ শ্রমক্লিষ্ট নিম্নকোটির মানুষের জীবনোল্লাসের ধ্বনি। তিনি জীবনবাদী কবি। মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সংগ্রামে তিনি বিশ্বাসী। এবং মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তিনি সর্বদা দেখেন। সে স্বপ্ন কিছু বেশি রঙিন, কিছু বেশি নাটকীয়, এবং যথেষ্ট বিপ্লবী তো বটেই।"[৩]

সূর্যজ্বালার সোপান (১৯৬৫) প্রকাশিত হয়েছে পারাবত প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। ১৩৭০ সাল থেকে ১৩৭৩ সালের মধ্যে রচিত মোট ৩২টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে একাব্যে। সমকালীন মধ্যবিত্ত

---

১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, 'পঁচিশ বছরের কবিতা, উত্তরাধিকার, ১৯৭৪, পৃ. ২০৭
২. আলাউদ্দিন আল আজাদ, ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ, ভূমিকা ১৯৬২, পৃ. ৫
৩. বশীর আল হেলাল, সাম্প্রতিক কবি, সাম্প্রতিক কবিতা, ১৯৭৫, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের নানা বিক্ষোভ দ্বন্দ্ব সংঘাত স্বদেশের অস্থির পটভূমিতে স্থাপিত হয়েছে। ফলে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনা একাব্যের উপজীব্য হয়েছে। এছাড়া ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতি ও মেকি ভন্ডামির মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে কোনো কোনো কবিতায়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে বেশ কটি কবিতায়। স্বদেশের প্রকৃতি, আরণ্যক শোভা বিভিন্ন কবিতায় নানাভাবে এসেছে। পৌরাণিক প্রেমকাহিনীর নায়ক ইউসুফের আত্মহননের স্মৃতি বিজড়িত একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে এতে। বলা যায়, একাব্যের কবিতায় একটি নির্বাচনিক গতি লক্ষ্য করা যায়, যা শৈল্পিক নির্লিপ্ততা থেকে ক্রমশ শৈল্পিক সচেতনতার দিকে অগ্রসরমান। একাব্যে কবির কাছে বিষয় নয়, বিষয়ের শিল্প সম্মত উপস্থাপনাই বড় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ তাঁর সমাজ চেতনা ও বিপ্লবধর্মী কবিতায় লক্ষ্য করা যায় ক্রমাগ্রসরমান ধারাটি শেষ পর্যন্ত একটা স্পষ্ট মার্ক্সবাদী প্রতীকি থেকে সাধারণভাবে বৃহত্তর মানবতাবাদী চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাহানারা আরজু (জন্ম ১৯৩২)

ঢাকা জেলার (বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলা) জাবরা গ্রামে মাতুলালয়ে জাহানারা আরজু জন্ম গ্রহণ করেন বাংলা ১৩৩৯ সালে ১লা অগ্রহায়ণ। পিতৃনিবাস মানিকগঞ্জ শহরে 'বনশ্রী'। পিতা মরহুম আফিল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী ছিলেন একজন সরকারী কর্মচারী, সুশিক্ষিত ও অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি।

মফস্বল শহর মানিকগঞ্জ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে ঢাকা ইডেন কলেজে আই.এ. ভর্তি হন। আই.এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স (১৯৫৩) এবং এম.এ পাশ করেন ১৯৬৬ সালে। স্কুল জীবনেই তিনি সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় হাতে লেখা 'গুঞ্জরণী' নামে পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এ পত্রিকাটি তৎকালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক প্রাদেশিক প্রদর্শণীতে প্রথম স্থান লাভ করেছিল। ১৯৪৫ সালে বিভাগপূর্ব বাংলার আজাদ পত্রিকায় মুকুলের মাহফিলে তাঁর প্রথম কবিতা 'সোনার ছেলেমেয়ে' প্রকাশিত হয়। পরে মোহাম্মদী, আজাদ, সওগাত, বেগম, ইত্তেহাদ ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় লিখতে থাকেন এবং সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সব পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীলস্বপ্ন' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এর পর 'রৌদ্র ঝরা গান' (১৯৬৪), 'শোনিতাক্ত আখর' (১৯৮০), 'আমার শব্দে আজন্ম আমি' (১৯৮৩), 'ক্রন্দসী ও আত্মজা' (১৯৮৪), 'স্বনির্বাচিত শত কবিতা' (১৯৮৬), 'নির্বাচিত প্রেমের কবিতা' (১৯৮৮), 'বিমুক্ত পংক্তিমালা' (১৯৮৭) এবং 'তৃষ্ণার্ত মাটির চুম্বন' (১৯৯০) প্রকাশিত হয়। এছাড়া শিশুতোষ রচনা ও আত্মজৈবনিক রচনাও রয়েছে।

১৯৫১ সালে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন বিচারপতি এ.কে.এম. নূরুল ইসলাম (প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ; প্রাক্তন মন্ত্রী, আইন ও বিচার বিভাগ; প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সরকার)-এর সঙ্গে। কবিতা লেখার পাশাপাশি সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ১৯৪৯ সালে কবি সুফিয়া কামালের সঙ্গে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের সর্ব প্রথম মহিলা সাপ্তাহিক 'সুলতানা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯৬৫ সালে প্রায় তিনবছর তিনি মরহুম কবি আবদুল গনি হাজারীর সঙ্গে যুগ্মভাবে তদানীন্তন লেখক সংঘের পত্রিকা 'পরিক্রম' সম্পাদনা করেন। ১৯৭০ সালে তিনি মহিলা সাহিত্য ও সমাজ কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী নিযুক্ত হন। দীর্ঘ দিন ওয়ারী মহিলা সমিতির সিনিয়র সহ-সভানেত্রী ছিলেন। শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রায় দুই যুগের উপরে। বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর উইমেন ওয়েলফেয়ার এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিশু পরিষদের সদস্য এবং শিশু-কিশোর মেলার উপদেষ্টা ছাড়াও তিনি 'কবিতাঙ্গন শিল্পী তরঙ্গে'র প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী।

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করেন। সে সময় ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শহীদদের উদ্দেশে রচিত তাঁর কবিতা 'রাজপথ' আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলা সাহিত্যে কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্যে তাঁকে 'নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী স্বর্ণপদক (১৯৭৭) একুশের পদক (১৯৮৭) শেরে বাংলা জাতীয় পুরস্কারে (স্বর্ণ পদক, ১৯৭৬) ভূষিত করা হয। এছাড়াও মানিক মিয়া স্মৃতি পুরস্কার ১৯৮৭, পতাকা সাহিত্য পদক (১৯৮৭), মাইকেল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭) ইকো সাহিত্য পুরস্কার পুরস্কার (১৯৮৭, শিশু সাহিত্যের জন্য), যুবপদক (১৯৮৮), কামরুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০) খোশরোজ কিতাবমহল পুরস্কার (১৯৮৭) এবং সর্বশেষ কমর মুশতরী পুরস্কার (১৯৯২), সাজেদুন্নেসা খাতুন চৌধুরাণী পুরস্কার (১৯৯৩, বাং ১৪০০) পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নীল স্বপ্ন (১৯৬২) প্রথম প্রকাশিত হয় কবিতাঙ্গন : ওয়ারী, ঢাকা থেকে। মোট ৫৩টি কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত হয়েছে এই সংকলন। "একাব্যের বেশিরভাগ কবিতাই ১৯৪৬ সাল থেকে গত ষোল বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও ঢাকা বেতারে পঠিত হয়েছে।"[১] একাব্যে কবি প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে স্মৃতি, ইতিহাস এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য-চেতনাকেও সমন্বিত করেছেন। প্রেমানুভূতির পাশাপাশি স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ, ঈদকে কেন্দ্র করে কবিতা এবং বিশ্ব-নবীকে স্মরণ করেও একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একাব্যে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে স্মরণ করে কবিতাও আছে দু'টি। সমসাময়িক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-ব্যর্থতার চিত্রও মূর্ত হয়ে উঠেছে একাব্যের কোনো কোনো কবিতায় গ্রন্থটির সমালোচনায় ড. মজির উদ্দীন বলেন, "বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে প্রত্যেকটি কবিতা স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে ও মাধুর্যে ভাস্বর। কবির 'নভোচারী পাখীমন' বিশ্বের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ সুষমাকে গভীর অনুভূতি দিয়ে করেছে উপভোগ। রোমান্টিক কবির এই আকাশচারী-মন কিন্তু আকাশেই থাকেনি, সে মাটির পৃথিবীর প্রেম-বেদনার সুরে ভরে তুলেছে আপন কণ্ঠ। তাঁর গানের সুরে রয়েছে সুমহান ব্যাপ্তি, গভীর বেদনা, প্রগাঢ় অনুভূতি। জীবনের তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, খন্ড ঘটনাকে, অনুভূতিকে কবি রসাবেশে করে তুলেছেন জীবন্ত, বর্ণ-সুষম। কবিমনের অনন্ত বাসনা, পৃথিবীর ঘাসের নরম ছোঁয়ায় হয় দিশেহারা, সে শোনে দূর নক্ষত্রের কথা, চলে গ্রহ-উপগ্রহ, ছায়াপথ হাড়িয়ে অজানা এক অননুভূতপূর্ব নেশায় প্রমত্ত হয়ে। এই চঞ্চল স্বচ্ছ জীবনাবেগ 'নীলস্বপ্নের' কবিতাগুচ্ছকে করেছে সুকুমার।"[২]

অপর একজন সমালোচকের মন্তব্য, 'একাব্যে জীবনের রোমান্টিক অনুভূতি নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তিনি প্রেম আর প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছেন। সেই ভালোবাসাই তাঁকে দিয়েছে কবি-দৃষ্টি। এ দৃষ্টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর অনুভূতি নিয়ে দেখেছে সবকিছু।"[৩]

রৌদ্র ঝরা গান (১৯৬৪) প্রথম প্রকাশিত হয় কবিতাঙ্গন, ওয়ারী, ঢাকা থেকে। মোট ৫৪টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। একাব্যের পূর্বলেখে কবির ঘোষণা লক্ষণীয়, "আমার কবিতা খুঁজছে পথ মাটির আঘ্রাণে নিয়েছে তার স্বাদ, ... পত্র পুষ্পের পরাগে ছেয়েছে এই বনানী প্রান্তর দিগ্বলয়।"[৪]

বলাবাহুল্য, মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, আশা-স্বপ্ন-সম্ভাবনা তারই আলেখ্যে রচিত হয়েছে একাব্যে। পাশাপাশি প্রকৃতি-প্রীতি, ঐতিহ্য-চেতনা, মানুষের অকালমৃত্যু জনিত দুঃখ-বেদনা কয়েকটি কবিতায় উপজীব্য হয়েছে। তবে একথা বলা যায়, প্রথম কাব্যের 'নভোচারী পাখীমন' এ গ্রন্থে শূন্য আকাশ ছেড়ে মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছে। ষড়ঋতুর মধ্যে একাব্যে তাই বর্ষার উপস্থিতি নেই, আছে নিশ্চ্রাণ শীত এবং রুক্ষ চৈত্রদিনের তাপদগ্ধ আগুনজ্বালা দিন, বিরহ বিচ্ছিন্নতা, ক্লেদাক্ত পৃথিবী, নির্জন গলির মোড় একাব্যের বিভিন্ন কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়া ভাষা-আন্দোলনের বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে একটি কবিতা।

---

১. জাহানারা আরজু, নীলস্বপ্ন, ভূমিকা, কবিতাঙ্গন, ঢাকা, পৃ. ৪
২. ড. মজির উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, ১৯৬৭, পৃ. ১৭৬-১৭৭
৩. ড. এম.এম. লুৎফর রহমান, কবি জাহানারা আরজু ও তাঁর কবিতা, পৃ. ৯
৪. জাহানারা আরজু, রৌদ্র ঝরা গান, পূর্বলেখ, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি প্রকাশের পরে উল্লেখযোগ্য কোনো সমালোচনা বের হয়নি। তবে পরবর্তীকালে ড. এস. এম. লুৎফর রহমান এর সমালোচনায় বলেন, "রৌদ্র ঝরা গান'-এর কবিতাসমূহেও প্রেম ও প্রকৃতি চেতনা এবং সেই সঙ্গে স্মৃতি, স্বাধীনতা, ঐতিহ্য মানুষের অকাল মৃত্যুজনিত দুঃখ প্রভৃতি রূপায়িত হয়েছে। ... এ কাব্যে কবির দুঃখ-চেতনা প্রবল। এর বিভিন্ন কাবতায় উজ্জ্বল রোমান্টিকতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে কিয়ৎপরিমান বিষন্নতা।"[১]

---

১. ড.এস.এম. লুৎফর রহমান, কবি জাহানারা আরজু ও তাঁর কবিতা ১৯৮৭, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (জন্ম ১৯৩৪)

বরিশাল জেলার গীর্জা মহল্লায় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। পিতা আবদুল জব্বার খান বিচরপতি ছিলেন।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক সম্মান (১৯৫৩) এবং স্নাতকোত্তর (১৯৫৪) ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে ইউ.কে. থেকে Public Administration-এ ডিপ্লোমা (১৯৫৮-৫৯) লাভ করেন। এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়ে ফেলোশীপ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে। এই সময়ে সি.এস.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বর্তমানে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া প্রধান হিসেবে ব্যাংককে কর্মরত।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাতনরী হার' প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। এর পরে 'কখনো রং কখনো সুর' (১৯৭০), 'কমলের চোখ' (১৯৭৪), 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' (১৩৮৮). 'সহিষ্ণু প্রতীক্ষা' (১৩৮৮) প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্যে অবদানের জন্যে কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করে ১৯৭৯ সালে। এছাড়া ১৯৮৫ সালে জাতীয় সাহিত্য পুরস্কারও লাভ করেন।

সাতনরী হার (১৯৫৫) প্রকাশিত হয়েছে পায়োনিয়ার প্রেস, ঢাকা থেকে। মোট ১১টি কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত একাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক'কে। বিদেশী তিনজন কবি শেকস্‌পীয়র, এ.য়ি. হাউসম্যান এবং ফ্রাঁসোয়া ভিয়োঁ-র কবিতার অনুবাদ স্থান পেয়েছে একাব্যে। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের বীর শহীদদের আত্মকাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতাটি। এছাড়া গ্রাম-সমাজের পটভূমিতে রচিত একাধিক কবিতায় সমাজের নানা অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার ও অসঙ্গতিকে তুলে ধরা হয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে। আমাদের দেশের রূপকথার কুঁচবরণ কন্যাদের কাহিনী রচিত হয়েছিলো একদা সমাজের সমৃদ্ধির যুগে কিন্তু বর্তমানে সমাজ যখন শ্রীহীন, মানুষগুলো নিরন্ন ও বিবস্ত্র — তখন ঐ রূপকথা সাতনরীর হার কিভাবে গলার দড়িতে রূপান্তরিত হয়ে যায় — তারই আলেখ্য নির্মাণ করা হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। স্বদেশ-চেতনা, প্রকৃতি-প্রীতি এবং সমকালীন নগর ও গ্রাম জীবনে নানা অস্থিরতা ও অসঙ্গতি একাব্যের উপজীব্য। গ্রন্থটির সমালোচনায় ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, "আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কিছু কিছু লিখতেন। তারই সংকলন 'সাতনরীর হার' কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এ এক নতুন স্বাদ, বাংলা ভাষা-আন্দোলনের প্রাক-চঞ্চল মুহূর্তগুলি তাঁর হুড়ার ছবিতে বিধৃত হয়ে রইল।"[১] আর একজন সমালোচক বলেন, "তাঁর মানসভূমিতে যে সামাজিক ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রবহমান তিনি তাকে ঐতিহ্যমনস্ক বিভায় ও লৌকিক আধারে পর্যবসিত করেছেন। ... প্রকৃতপক্ষে, তাঁর একমাত্র চিন্তার সারাৎসার দেশ ও মানুষ।"[২]

---

১. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য, মাসিক মোহাম্মদী ২৯শ ভর্ষ ৯ম সংখ্যা-কার্তিক-আশ্বিন, ১৩৬৪-৬৫ পৃ. ৮১৩

২ নূরউল করিম খসরু, দশজন কবি, শিল্পতরু প্রকাশনী ১৯৯২, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আবু বকর সিদ্দিক (১৯৩৪)

বাগেরহাটের গোটপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে আবুবকর সিদ্দিক জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৪ সালের ১৯শে আগষ্ট। পিতৃভূমি বৈটপুর গ্রাম। পিতা মতিয়ার রহমান পাটোয়ারী প্রথম জীবনে শিক্ষকতা, পরে হুগলি এবং বর্ধমানে পি.ডাব্লিউ. ডি বিভাগে সরকারী চাকুরী করেন। দেশ বিভাগের পর অপশন দিয়ে বাগেরহাটে তিনি একই চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। মা মতিবিবি সুগৃহিণী ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন হুগলী মসজিদ পাঠশালা, গোটপাড়া প্রাইমারী স্কুল, বর্ধমান নিবারণ পন্ডিতের পাঠশালা এবং বর্ধমান জি.টি. স্কুল ও বর্ধমান সি.এম. এস স্কুল থেকে। ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন বাগের হাট সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে। ১৯৫৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন বাগেরহাট সরকারী পি.সি. কলেজ থেকে। ঐ কলেজ থেকে ১৯৫৬ সালে বি.এ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ভর্তি হয়ে পাশ করেন ১৯৫৮ সালে।

কর্মজীবন শুরু করেন সরকারী কলেজের বাংলার প্রভাষক হিসেবে। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত চাখার সরকারী এফ. এইচ. কলেজ, দৌলতপুর সরকারী বি. এল কলেজ, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ ও বাগেরহাট সরকারী পি. সি. কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৪ সাল থেকে অদ্যাবধি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ধবল দুধের স্বরগ্রাম' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এরপর 'বিনিদ্র কালের ভেলা' (১৯৭৬) 'হে লোক সভ্যতা' (১৯৮৫) 'মানুষ তোমার বিক্ষত দিন' (১৯৮৬) এবং 'হেমন্তের সোনালতা' (১৯৮৮) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ ও প্রবন্ধের গ্রন্থ রয়েছে। সাহিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৮ সালে বাঙলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।[১]

ধবল দুধের স্বরগ্রাম (১৯৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্যশিল্প প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্র রচিত হয়েছে তাঁর মাকে বন্দনা করে। মোট ২৯টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। সমকালীন রাজনীতি-মনস্কতা, আনন্দ ও বঞ্চনা, হতাশা, ক্লান্তি, প্রেম-বিরহ এ কাব্যের উপজীব্য। স্বদেশ প্রেম, প্রকৃতি চেতনা, এবং শিল্প সম্পর্কে কবির বিশেষ ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে কোনো কোনো কবিতায়। এছাড়া রোমান্টিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে বেশ কিছু কবিতায়। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে রচিত একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে এতে। এ গ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতা উৎসর্গ করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে। কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রাহমান এবং সিকান্দার আবু জাফরকে। অপরদিকে বিষ্ণু দের 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' গ্রন্থটি উপহার পেয়ে তাঁকেও একটি কবিতা উৎসর্গ করেছেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য "স্বদেশ, নিসর্গ এবং বীর্যবত্তাই মূলত আবুবকর সিদ্দিকের কবিতার বিষয়বস্তু। জন্মসূত্রেই টঙ্কার দেয় যে জননী জন্মভূমির ধবল দুধের স্বরগ্রাম, যুবক শোনিতে তিনি সেই সুরকেই ধারণ করেছেন।..... এ কবি বিশ্বাস করেন কবির সামাজিক ভূমিকায়। বুকের শ্বাসে যে মিছিল চলমান, সেই তাঁর সমাজ, এবং সে সমাজের ভাষ্যকার হয়েই তিনি কবিতাকে গণ-অধিকারে রেখে দিতে চান।"[২] অন্য এক সমালোচনায় ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, "অনেক বিলম্বে তাঁর কিছু কবিতা নিয়ে বেরিয়েছে এই ক্ষীণ কলেবর গ্রন্থ। ক্ষীণ কলেবর হলেও সংকলিত কবিতাগুলোতে শব্দ প্রয়োগ ও ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে আবুবকর সিদ্দিকের নিরীক্ষাপ্রিয়তার পরিচয় আছে; কাল সচেতনতা ও ব্যঙ্গ প্রবণতায় পঞ্চাশ দশকের চারিত্র্য তাঁর কবিতায়ও অনুপস্থিত নয়।"[৩]

---

১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং লেখক কর্তৃক সংগৃহীত, বা/এ, পৃ: ৩৩
২. মুহম্মদ নূরুল হুদা, কবিতা, শুদ্ধ রসায়ন, কালশ্রোত প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ১৯৭২, পৃ: ৬৭
৩. ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, এলান, দ্বিতীয় পক্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৭০, পৃ: ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫)

রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমায় ১৯৩৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সৈয়দ শামসুল হকের জন্ম হয়। পিতা ডা. সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। স্থানীয় স্কুলে কিছুকাল লেখাপড়া করে সৈয়দ হক ঢাকার কলেজিয়েট হাইস্কুল থেকে ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯৫৪ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল ইংরেজীতে অনার্স পড়েছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। প্রথমে ঢাকার সিনেমা সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'-তে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন ১৯৬৯ সালে। ইংরেজী মাসিক 'এক্সপ্রেস'-এর সাহিত্য উপদেষ্টা রূপে কাজ করেছেন ১৯৭০-৭১ সালে। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় যোগ দেন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন' -এর বাংলা বিভাগে। বর্তমানে তিনি সার্বক্ষণিক সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একদা এক রাজ্যে' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। 'বিরতিহীন উৎসব' ১৯৬৯ সালে। এছাড়া 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' প্রকাশিত হয় ১৩৭৬ সালে। এই গ্রন্থটির জন্য তিনি ঐ বছরই আদমজী পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রধানত কবি কিন্তু কথাসাহিত্য ও নাটকে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বাঙলা একাডেমী'সহ আরো বিভিন্ন পুরস্কারে বিভিন্ন সময়ে ভূষিত হয়েছেন।

382310

একদা এক রাজ্যে (১৯৬১) প্রথম প্রকাশিত হয় সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। মোট ২৯টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ কাব্যে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবি শামসুর রাহমানকে। প্রথাসিদ্ধ নিয়মে ২০টি কবিতার নামকরণ করা হয়েছে বাকি ৯টির নামকরণে শতক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। এ কাব্যে একজন ব্যক্তি-মানুষের মনের জগতের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। ব্যক্তি মনের অব্যক্ত ইচ্ছা অপূর্ণ বাসনার স্মৃতিচারণ মূর্ত হয়ে উঠেছে বেশ ক'টি কবিতায়। সমকালীন জীবনের আদিম ও অকৃত্রিম যে ভাবনাগুলো মনের চেতন, অচেতন ও অবচেতন স্তরে ছড়িয়ে আছে - স্বপ্নে ও বিশেষ মানসিক অবস্থায় ঐ স্তরের নানা অনুভূতি বিশেষ — বিশেষ প্রতীকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে এ কাব্যে। এ গ্রন্থের সমালোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "শামসুল হক তাঁর কবিতায় এক আদিম অরণ্যচারী অভিজ্ঞতার পরিচর্যা করেন, যে অভিজ্ঞতাকে ঢেকে রাখতে পারলে আমরা স্বস্তি পাই তাকে তিনি প্রখর দিবালোকে প্রকাশ্য আলোকে নিরিখ করেন। শামসুল হকের কবিতায় স্মৃতিচারণ খুব বেশী, সে স্মৃতি ঘটনার নয়। সে স্মৃতি অব্যক্ত ইচ্ছার, অপূর্ণ বাসনার।.....অনর্গল উষ্ণ ও উচ্ছল লাল নীল সবুজ তমসাকে আশ্চর্য ভাবে জীবন্ত করতে পারেন শামসুল হক, তাদের দৃশ্যমান করে তুলতে পারেন কবিতায়, কবি হিসেবে সৈয়দ শামসুল হকের এইটাই সবচেয়ে বড় সার্থকতা।"[১]

বিরতিহীন উৎসব (১৯৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে বর্ণমিছিল, ঢাকা থেকে। মোট ৩২টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ কাব্যে। পূর্বোক্ত কাব্যের মতোই এ গ্রন্থের ২১টি কবিতা ছাড়া বাকি ১১টির সংখ্যাসূচক নামকরণ করা হয়েছে। 'দারা শিকোহ্‌র স্বগতগুচ্ছ' শিরোনামে তিনটি কবিতা ক্রমানুসারে স্থান পেয়েছে এ কাব্যে। সমকালীন সমাজ - জীবনের টানাপোড়েন, ক্লান্তি, হতাশা, জীবনধারণের গ্লানি সর্বোপরি স্বদেশের অস্থির মানচিত্রে উনসত্তরের আন্দোলনের ঢেউ — যে বৃহৎ জীবনের

---

১. আধুনিক কবিতা, পৃ: ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বানে প্রতিটি বাঙালীকে আলোড়িত করে তুলেছিলো — তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কাবিতায়। প্রেম, প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতার বোধ ছাড়াও বাইরের জগতের নানা ছবি ও ঘটনার নিবিষ্ট দর্শক হিসেবে এর উৎবমুখরতার অনবরত গতিকে চিত্রিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এখানে। কবি ও কবিতার জন্ম বিষয়ক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে দুটি কবিতায়। সরাসরি মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক পাঁচটি কবিতা স্থান পেয়েছে একাব্যে। বলা যায়, আধুনিক জটিল জীবনের উন্মূল বাসনায় দ্বিধাদীর্ণ কবিমানস একাব্যে পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতে যতো না রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, পাওয়া-না-পাওয়ার ব্যর্থতা ও বেদনায় যেন ততোধিক মোহ্যমান।

বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৭০) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবি হাসান হাফিজুর রহমানকে। একজন নায়কের স্বগতোক্তির আকারে রচিত এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। এখানে কবি ব্যক্তিগত জীবনের উদ্ভ্রান্তি, নৈরাশ্য, বিকার ও বিক্ষোভকে সমকালীন জীবনের পটভূমিতে স্থাপন করে প্রকাশ করেছেন, ফলে এতে সেকালের সমাজ ও সমাজ-মানস মূর্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার স্মৃতি রোমন্থনে যেমন উজ্জীবিত হয়েছে কবির লেখনী, তেমনি আমাদের শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের খন্ড চিত্র অঙ্কনে তিনি সমান পারদর্শী। এ কাব্যের সমালোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "একদা একরাজ্যে' কবি শামসুল হকের অভিজ্ঞতার জগৎ ছিল তমসাময়, যে তমসা অনর্গল উষ্ণ ও উচ্ছল লাল নীল সবুজ। সেই পিচ্ছিল প্রবাহ থেকে 'বিরতিহীন উৎসব'-এ তিনি অনেকটা বেরিয়ে এসেছেন। জীবনের সহজ সরল, আনন্দ বেদনা সেখানে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে আর 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা'য় তিনি গদ্যময় জীবনে অবতীর্ণ। এমনকি রাজপথেও নেমে আসতে দেখি তাঁকে। খুব স্বচ্ছন্দে আর স্বল্প পরিবেশে তিনি আমাদের পঞ্চাশ আর ষাট দশকের জীবনধারাকে তুলে ধরেছেন। বস্তুত, পূর্ব বাংলার কোন যথার্থ কবির পক্ষেই ষাট দশকের শেষ অবধি পরিবেশ থেকে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি, সৈয়দ শামসুল হকও পারেননি। ষাট দশকের শেষে ঢাকার উপকণ্ঠে ডেমরায় আর কুমিল্লা জেলায় যে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল সে ঝড় ছিলো একাত্তরের মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস, সে ঘূর্ণির তান্ডব আর ধ্বংস বৈশাখের পংক্তিমালার রসদ জুগিয়েছে। কালবৈশাখী রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা জুগিয়েছিলো। সৃষ্টি হয়েছিল 'বর্ষশেষ', কাল বৈশাখীকে নজরুলও ব্যবহার করেন তার 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায়। সৈয়দ হক তেমন মহৎ সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু কালবৈশাখীর ঘূর্ণিকে তিনিও সার্থকভাবে কবিতায় পরিণত করেছেন। ..... সৈয়দ শামসুল হক 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা'য় জীবনের গভীরতায় অবগাহন করতে সক্ষম হয়েছেন।'[১]

---

১ আধুনিক কবিতা, পৃ: ৮০

Dhaka University Institutional Repository

আল মাহমুদ (জন্ম ১৯৩৬)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে আল মাহমুদের জন্ম হয় ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই। পিতা আবদুর রব মীর ছিলেন বস্ত্র-ব্যবসায়ী। পরবর্তী সময়ে সুফীতত্ত্বে বিশ্বাসী দরবেশী জীবন-যাপন করেছেন। আল মাহমুদের শিক্ষা-জীবন শুরু হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম.ই. স্কুলে। পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জর্জ হাই স্কুলে (বর্তমান নাম নিয়াজ মোহাম্মদ হাইস্কুল) ভর্তি হয়ে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি তিনি লাভ করেননি। তবে বাড়িতে পড়াশোনার একটা পরিবেশ ছিলো। দাদার নিজস্ব লাইব্রেরী ছিলো। দাদা ছিলেন স্বভাব কবি। জারীগান, সারিগান ও মর্সিয়া লিখতেন। দাদা-দাদী দু'জনেই ফার্সিতে বয়াত আবৃত্তি করতেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে নজরুলের লেখার প্রতি খুবই আকর্ষণ বোধ করেন। একজন খ্রীষ্টান বাবুর মাধ্যমে জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' বইটি প্রথম পড়েন। এর প্রভাবে প্রথম আধুনিক কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সত্যযুগ' পত্রিকায় ১৯৫১-৫২ সালের দিকে। তখন পত্রিকাটির সাহিত্য-সম্পাদক ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ।

১৯৫৪ সালে কর্মজীবন শুরু করেন দৈনিক মিল্লাত পত্রিকার প্রুফ রীডার হিসেবে। ১৯৫৫ সালে কিছুকালের জন্যে ওয়াপদার ঘুঙ্গুর স্কীমে ড্রেজার 'বলেশ্বর'-এ গেজ রীডার রূপেও কাজ করেন। পরবর্তী বিশ বছর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। এক সময় তিনি ইত্তেফাকের প্রুফ রীডার ছিলেন। দৈনিক গণকণ্ঠের সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে ১৯৭৪ সালে কারাবরণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের ব্যক্তিগত সদিচ্ছায় পরবর্তী সময়ে শিল্পকলা একাডেমীর পরিচালক পদে নিয়োগ পান। বর্তমান কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে 'পালাবদল' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদনা করছেন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক-লোকান্তর' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কালের কলস' (১৩৭৩), 'সোনালি কাবিন' (১৯৭৩), 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' (১৯৭৬), 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না' (১৯৮০), 'বখতিয়ারের ঘোড়া' (১৯৮৪), 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস' (১৯৮), 'প্রহরান্তের পাশ ফেরা' (১৯৮৭), 'একচক্ষু হরিণ' (১৯৮৯), 'মিথ্যাবাদী রাখাল' (১৯৯৩) প্রকাশিত হয়। এসব গ্রন্থ পরে মুদ্রিত হলেও এর অনেক কবিতা পাঁচের ও ছয়ের দশকে রচিত। এছাড়া তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প ও শিশুতোষ রচনাও আছে।

সাহিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে যেসব পুরস্কার পেয়েছেন তার মধ্যে প্রধানত বাঙলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮) জয় বাংলা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২, কলকাতা) হুমায়ুন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৪) জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার (১৯৭৪) সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক (১৯৭৬) বাঙলাদেশ লেখক সংঘ (১৯৮০), ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬) একুশে পদক (১৯৮৭) নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০)।

লোক লোকান্তর (১৩৭০) আল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক 'কপোতাক্ষ'।[১] একাব্যে সংকলিত হয়েছে ৫১টি কবিতা। যা ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে রচিত। একাব্যের

---

১ কপোতাক্ষ একটি সমবায় প্রকাশনা সংস্থা। কবি-সাহিত্যিক-সাহিত্যিক সাংবাদিক এবং চিত্র শিল্পীরাই কপোতাক্ষের সদস্য। ১১ জন শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মহান মুক্তিযোদ্ধা ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে জামায়াত-এ ইসলামের অঙ্গসংগঠন আলবদরের হাতে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে নিহত ছড়াকার ও সাংবাদিক এবং 'মুর্শীর অপটিমা' র অন্যতম সহযোগী মুহম্মদ আখতার। অন্য সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন- শিল্পী হাশেম খান, রফিকুন্নবী, সাংবাদিক শাহাদত চৌধুরী, কবি আসাদ চৌধুরী ও রফিক আজাদ। উল্লেখ্য যে, এই প্রতিষ্ঠান থেকে কথাশিল্পী জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'বহেনা সুবাতাস' গল্পগ্রন্থ ও কবি আবুল সাত্তার অনূদিত 'আরবী কবিতা'ও প্রকাশিত হয়েছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু আধুনিক জীবনের অনিকেত বোধ এবং তজ্জনিত নিরাশা, ক্ষোভ-বেদনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তির হাহাকার। সমকালীন শহুরে পরিবেশকে মনে হয়েছে রুক্ষ — অনুর্বর মরুভূমির মতো — যেখানে সারাদিন খুঁজেও পিপাসার বারি পাওয়া যায় না। ফলে শহুরে জীবনের নিষ্ঠুরতায় ক্ষুব্ধ কবি গ্রামজীবনকে আকাঙক্ষা করেন তিতাস ও তিতাস- বাহিত প্রকৃতি ও জনজীবনকে, তার উত্তাপ ও বৈভবকেই যেন স্থাপিত করেছেন স্বদেশের সমগ্রতায়।

'সমকাল' পত্রিকার কবিতাসংখ্যায় কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনায় আবদুল মান্নান সৈয়দ এ গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন, "তাঁর নিচু কণ্ঠস্বরে তিনি তাঁর অনুভবের কথা, তার পারিপার্শ্বিক কম্পমান অগ্রসরমান জীবনের কথা বলে গেছেন। ... এক সুস্থ-স্বস্থ-স্বচ্ছ আত্মকেন্দ্রিক জগতের অধিবাসী এই কবি সযত্ন ও পরিচ্ছন্ন ছন্দ ও ভাষার অধিকারী"।[১] আর এক তরুণ সমালোচক নুরউল করিম খসরু বলেন, " আল মাহমুদ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর'-এ আরক্তিম আত্মতাড়িত আলগ্ন যদিও নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত, দুঃখ-বেদনায় নীল — তবু, স্বোপার্জিত, স্বচিহ্নে নতুন ও দ্যুতিবান। তিনি অবলীলায় নিজেকে উন্মুক্ত করেন; 'কেবলই আমার মধ্যে যেন এক শিশু আর পশুর বিরোধ'। পবিত্রতার সঙ্গে অপবিত্রের, সরলতার সঙ্গে জটিলতার, নির্লোভের সঙ্গে লোভের, নিষ্কামের সঙ্গে সকামের এ এক চিরকালীন দ্বন্দ্ব, বিরুদ্ধবাদিতা। এভাবে চিনতে হয় রাস্তা, গড়তে হয় জীবন, যেতে হয় গন্তব্যে। আল মাহমুদ তাঁর কবিতা-যাত্রা আরম্ভের প্রথম লগ্নে সে অবধারিত ও চিরকালীন পথই বেছে নিলেন"।[২]

কালের কলস (১৩৭৩) মোট ৩৬টি কবিতা নিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় 'বইঘর' চট্টগ্রাম থেকে।[৩] কবিতাগুলি রচিত হয় ১৩৭০ সাল থেকে ১৩৭৩ সালের মধ্যে। এ কাব্যের বিষয়বস্তু মোটামুটিভাবে প্রথম কাব্যগ্রন্থেরই অনুরূপ। তবে ব্যক্তিমনের আশা-আকাঙক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা, কামনা-বাসনা এবং বিষণ্নতার আলেখ্য নির্মাণ করতে গিয়ে স্বদেশের বৃহৎ প্রেক্ষিতকে তিনি অনায়াসে গেঁথে গেছেন এ গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতায়। স্বদেশ-ভূমি এখানে কবি-মানসের পটভূমি। একদিকে আশার হাতছানি — অন্যদিকে হতাশায় নিমজ্জিত অন্ধকার অন্তর্লোক — এই দুই দারুণ ধাঁধার আঁধারগোলক পেরিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত উপনীত হয়েছেন জীবনের আলোকিত প্রান্তরে। যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ অবস্থান — চিরপরিচিত সেই পল্লীসমাজে প্রত্যাবর্তন করে বর্তমান সংকট থেকে মুক্তি খুঁজছেন।

এই গ্রন্থের কবিতা সম্পর্কে প্রবীণ সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "আল মাহমুদ স্বদেশ জাগরণের ছবি যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন এক পরম আশাবাদিতার পটভূমিতে, তেমনি ব্যক্তি-মনের মুক্তির আলেখ্যও তিনি রচনা করেছেন আশার সমুজ্জ্বল পটে"।[৪]

কবি সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, " লোক-লোকান্তরে'র কবি ক্রমশ কালের কলস ভাসালেন। দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রেম, কাল ও সমাজ-চেতনা আল মাহমুদকে ক্রমশ নিবিষ্ট করে সময়ের পটে"।[৫] এই গ্রন্থের এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত কবিতাকে উপলক্ষ্য করে হাসান মুরশিদ (গোলাম মুরশিদ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় লেখেন, "জসীমউদ্দীন যেখানে

---

১. সমকাল, অষ্টম বর্ষ, কবিতা সংখ্যা-১৩৭১

২. নুরউল করিম খসরু, 'দশজন কবি', পৃ: ৫০

৩. এ গ্রন্থের অপর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে কলকাতার বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। এই গ্রন্থটির জন্যে প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ কবিকে 'জয় বাঙলা' পুরস্কার প্রদান করে ১৯৭২ সালে। (তথ্য ঃ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত)

৪. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সমকালীণ সাহিত্যের ধারা, ১৯৬৫, পৃ. ৬৫

৫. 'কয়তলে মহাদেশ' আব্দুল মান্নান সৈয়দ, পৃ: ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

লোকসাহিত্যের উপাদানের ওপর তাঁর কুটির তৈরী করেন, আল মাহমুদ সেখানে আধুনিক এক প্রাসাদের কারুকার্যে লৌকিক উপাদান ব্যবহার করেন।... পল্লীর শব্দ ও প্রবাদ- প্রবচনকে আধুনিক কোনো কবি সম্ভবত, এমন নিপুণ ও শৈল্পিক ভঙ্গিতে ব্যবহার করেননি"।[১] পশ্চিম বাংলার আর এক কবি-সমালোচক অমিতাভ দাশগুপ্ত বলেন, " তাঁর কবিতা এক অর্থে বাঙলা কবিতারই পুনরুজ্জীবন"।[২]

রাম বসু একাব্যের বিশ্লেষণে বলেন, " নিজের জীবনের অনুষঙ্গ থেকে দেশের সামগ্রিক সংবাদকে তিনি অনায়াসে স্বচ্ছন্দে কবিতায় বিধৃত করতে পারেন"।[৩]

---

১. পূর্ববাংলার সাহিত্য, দেশ, ১০ জুলাই, ১৯৭১
২. বেলা-অবেলা, কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৭৮
৩. পরিচয়, পৌষ-মাঘ, ১৩৭৮

Dhaka University Institutional Repository

জিয়া হায়দার (জন্ম ১৯৩৬)

পাবনা জেলার দোহার পাড়া গ্রামে জিয়া হায়দার জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ১৮ই নভেম্বর। প্রকৃত নাম আবদুর রউফ জিয়াউদ্দিন হায়দার। পিতা মোহাম্মদ হাকিম উদ্দীন প্রথম জীবনে রেলওয়েতে চাকুরী করেছেন। পরবর্তীকালে ঠিকাদারী ব্যবসা করতেন।

জিয়া হায়দার প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন আরিফপুর প্রাইমারী স্কুল, পাবনায়। এরপর পাবনা জেলা স্কুল ও গোপালচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশন পাবনা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৫২ সালে। ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক কারণে কিছুদিন জেল খাটেন এবং কিছুদিন পলাতক অবস্থায় ছিলেন। এজন্যে তিন বছর পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। পরবর্তী সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলা সম্মান নিয়ে পাস করেন ১৯৫৬ সালে। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন শুরু করেন ছাত্রাবস্থায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা, ইত্তেফাক ও চিত্রালীতে সাংবাদিকতা করেছেন বেশ কিছুদিন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। এই সূত্রে নাট্যকলায় এম. এফ. এ. ডিগ্রি লাভ করেন হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে। নাট্যকলা বিষয়ে আরো একাধিক ডিগ্রি লাভ করেন নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে।

পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন ছোট চাচা আবুল কাশেমের কাছ থেকে। ছোট চাচা গল্প, কবিতা, নাটক লিখতেন। তবে তা সবই সৌখিন পর্যায়ে। তাঁর রচিত একটি নাটক পাবনাতে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ছাত্রাবস্থায় জিয়া হায়দার কলেজে ফুটবল খেলা থেকে শুরু করে অভিনয় এবং কবিতা-আবৃত্তি করেও প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এভাবে ধীরে ধীরে একসময় সৃষ্টিশীল লেখার প্রতি আগ্রহ জন্মে। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় পাবনা থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পাক-হিতৈষী'তে। ১৯৫৪ সাল থেকে 'দেশ' পত্রিকা ও শুদ্ধ স্বত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক' পত্রিকায় নিয়মিত লেখা ছাপা হতে থাকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একতারাতে কান্না' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। এরপরে 'কৌটার ইচ্ছেগুলি' (১৯৬৭) 'দূর থেকে দেখা' (১৯৭৭) 'আমার পলাতক ছায়া' (১৯৮২) 'লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা' (১৯৯০) প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার প্রমা প্রকাশনী থেকে। এ ছাড়া প্রবন্ধ গ্রন্থ, নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ, অনূদিত নাটক এবং বেশ ক'টি মৌলিক নাটকও রয়েছে।

সাহিত্যের অবদানের জন্যে কবিতায় বাঙলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেছেন ১৯৭৭ সালে। গীতিকার হিসেবে চলচ্চিত্রে গান রচনার জন্যে চলচ্চিত্র-সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৮ সালে।[১]

একতারাতে কান্না (১৯৬৩) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সপ্তক প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। মোট ৩৫টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে একাব্যে। সমকালীন জীবন চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে একাব্যের অধিকাংশ কবিতা। এছাড়া রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে রচিত একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে এতে। বসন্ত ঋতুকে নিয়ে রচিত একটি কবিতাও এতে আছে। নগর-জীবনের পাশাপাশি গ্রামজীবনের পটভূমিতে রচিত 'শান্তি' নামের নিষ্পাপ রানীমার আত্মহত্যার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা 'কিংবদন্তী'। সমাজের নানা

তথ্য: ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিপর্যয়ের চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক কবির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিধৃত হয়েছে এ গ্রন্থের শেষ কবিতায়।

এ গ্রন্থের সমালোচনায় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "জিয়া হায়দারের কবিতায় রোমান্টিক মানস- প্রবণতা স্পষ্ট। কাব্যভঙ্গিতে আধুনিক হলেও জীবনচেতনায় তিনি পুরোপুরি আধুনিক নন। প্রাচীন ঐতিহ্যময় সম্পদের নব ব্যবহারের চেষ্টা তিনি করেছেন, সে উদ্দেশ্যে তিনি ফিরে গেছেন চর্যাপদে, প্রাচীন সাহিত্যে। .... আবদুস সাত্তারের মতো জিয়া হায়দারেরও আকাঙ্ক্ষা গ্রামের নিভৃতে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে সময়-যাপনের। কিন্তু জিয়া হায়দারের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা আরও গভীর : 'তারপর আকাশের দিগন্তের দিকে চোখ রাখে'।[১]

অর্থাৎ বলা যায় প্রথম কাব্যে জিয়া হায়দার রোমান্টিক মানস-প্রবণতায় প্রকৃতি-আশ্রয়ী হয়েছেন।

কৌটার ইচ্ছেগুলো (১৯৬৭) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে শাইনিং বুক এজেন্সী, ঢাকা থেকে। মোট ১৮টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এ সংকলনে। সমকালীন পরিবর্তমান সমাজ ও সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং সেই বিপর্যয়ের রূপচিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে একাব্যে কবি হয়ে উঠেছেন অধিকতর সমালোচনা-প্রবণ। লখিন্দর, বেহুলা, সনকা, চাঁদ সওদাগর এবং সর্পদেবী মনসাকে নিয়ে রচিত হয়েছে একাব্যের ৫টি কবিতা। ছিন্নভিন্ন বর্তমান আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধ কালকূটের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে নাম-কবিতাটিতে। নিসর্গ-প্রীতির পাশাপাশি দেশমাতৃকার অনুর্বর নিষ্ফলা প্রান্তরের চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে একাধিক কবিতায়। তবে সমকালীন জীবনযাপনের দৈনন্দিন দুঃখ ক্লান্তি হতাশাকে অতিক্রম করে একাব্যে আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোনালি দিনের প্রত্যাশায়। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর রাধিকার প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে একাব্যে। সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতি, পাপাচার, যথেচ্ছারের কাহিনী তিনি সরস ব্যঙ্গ-কৌতুকে বিধৃত করেছেন। একাব্যের সমালোচনায় বশীর আল হেলাল বলেন, "তিনি আপন প্রাচীন অপ্রাচীন ঐতিহ্যসমূহকে এবং দেশজ সংস্কৃতিকে তাঁর কাব্যে উপাদানরূপে সুন্দর ব্যবহার করেন। তাঁর কাব্যে ইতিহাসের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে, যেমন ছিল জীবনানন্দ দাশের কাব্যে।"[২] অপর এক সমালোচনায় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "এ কাব্যে জিয়া হায়দার হয়ে উঠেছেন আরও বেশী সমাজ সমালোচক, ফলে কবিতা হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণতর।"[৩]

---

১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পঁচিশ বছরের কবিতা, উত্তরাধিকার, ১৯৭৪, পৃ: ২১৮
২. বশীর আল হেলাল, সাম্প্রতিক কবি সাম্প্রতিক কবিতা, ১৯৭৫; পৃ: ৪৬
৩. মোঃ মাহফুজউল্লাহ, পঁচিশ বছরের কবিতা, উত্তরাধিকার, ১৯৭৪, পৃ: ২২০

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (জ: ১৯৩৬)

কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত নওহাটী গ্রামে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি। পিতা আবদুল হক ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন, লেখাপড়া করেছিলেন দশম শ্রেণী পর্যন্ত, ম্যাট্রিক পাশ করেননি। ছোট ভাই ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বলে গ্রামের বাড়িটি 'ডিপুটি বাড়ি' বলে পরিচিত।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের নওহাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর তালশহর হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৫০ সালে। ১৯৫২ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন এবং ১৯৫৫ সালে বি.এ ১ম পর্বে ভর্তি হন। কিন্তু পরীক্ষা দেননি। ছাত্রাবস্থায় সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' ও মাসিক 'দ্যুতি' পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা মুখপত্র সাহিত্য সাময়িকী 'মাহে-নও'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে মাসিক 'পূবালী' সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬৫ সালে দৈনিক বাংলায় (সাবেক দৈনিক পাকিস্তান) ফিচার-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন, এবং বর্তমানে তিনি এই পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। নজরুল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালের মার্চ মাস থেকে পুনরায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৩ সালে দৈনিক বাংলায় পুরাতন পদে ফিরে আসেন।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর প্রথম কবিতা 'হুল্লোড়' ফয়েজ আহমদ সম্পাদিত 'হুল্লোড়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। এরপর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় উভয় বাংলার পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জুলেখার মন' প্রকাশিত হয়, ১৯৫৯ সালে। এরপর 'অন্ধকারে একা' (১৯৬৬), 'রক্তিম হৃদয়' (১৯৭০), 'আপন ভুবনে' (১৯৭৪) এবং 'কবাস্কার' (১৯৮০) প্রকাশিত হয়। মূলত কবি হলেও প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশিষ্ট এবং স্বীকৃত। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখ আহমদ ও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিশিষ্ট রূপকারদের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ, এগারোটি প্রবন্ধ গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর কাব্য-নাটক, নাটক, গীতিবিচিত্রা ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত এবং প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে নজরুল স্মৃতি পুরস্কার (কলকাতা) এবং আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮৯ সালে।

২৪ [illegible] মাহফুজউল্লাহর [illegible] (১৯৮২), [illegible] পৃ: ২৬১ থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

জুলেখার মন (১৯৫৯) প্রথম প্রকাশিত হয় রওনক পাবলিকেশনস, ঢাকা থেকে। মোট ৪৩টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবি ফররুখ আহমদকে। গ্রন্থটির নামকরণে পুথি-সাহিত্যের নব-রূপায়ণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এ কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও সমকালীন জীবনের চিত্রায়ণে কবির রোমান্টিক মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়া আদর্শ নিষ্ঠা এবং কবির ঐতিহ্য প্রীতির পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন কবিতায়। এ কাব্যের ৪৩টি কবিতার মধ্যে অন্তত ২২টি প্রকৃতির কবিতা, এছাড়া প্রেম ও অন্যান্য বিষয়ের কবিতারও পরিবেশ রচনা করেছে প্রকৃতি। এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের সমালোচনায় আবদুল হক বলেন, " মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বিশুদ্ধ গীতিকবিতার শিল্পী। তাঁর কবিতায় প্রেমের চেয়ে প্রকৃতিরই প্রাধান্য।"[১] গ্রন্থটি প্রকাশের কিছুদিন পরে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় সমালোচনায় বলা হয়, " 'জুলেখার মন' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এবং বর্তমান গ্রন্থে কবির রোমান্টিক ধারার কতগুলি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'জুলেখার মন' কাব্যগ্রন্থে প্রাথমিকতার ছাপ নেই, বরং বইটিকে ঘিরে একটি হৃদয়াবেগের আবহাওয়া বর্তমান। কবির মধ্যে নিসর্গপ্রীতি রয়েছে। চিত্রকল্প রচনার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ যত্নশীল।"[২] অপর এক সমালোচনায় সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন "কবিতাকে মাহফজুউল্লাহ অনুভূতির জগতেই আবিষ্কার করেছেন। বাস্তব সেখানে যদিবা উপস্থিত হয়েছে, তা-ও রোমান্সের রসে সিক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়ে। 'জুলেখার মন' আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় — আধুনিকতার চোরাগলিতে হারিয়ে গেলেও মানুষের মন এখনও ঐশ্বর্যরিক্ত হয়নি। তাতে স্নেহ, প্রেম, সৌন্দর্যবোধ, আদর্শনিষ্ঠা, ঐতিহ্যপ্রীতি আজও অনেক পরিমাণে ক্রিয়াশীল। .... মাহফুজউল্লাহ মূলত রোমান্টিক কবি; বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবিতা রচনায়ই তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। আর তাঁর রোমান্টিক মনের অবলম্বন প্রকৃতি, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ। .... পুথিকারদের কাব্যে যে জগৎ আত্মগোপন করে রয়েছে, যার সৌন্দর্যের অবগুন্ঠন মোচনে পুথিকারগণ সমর্থ হননি, মাহফুজউল্লাহ সে সৌন্দর্য-জগতের দ্বারোদঘাটন করেছেন। এ বিষয়ে তিনি সম্ভবত ফররুখ আহমদের অনুসারী।"[৩]

অন্ধকারে একা (১৯৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্য মঞ্জিল, ঢাকা থেকে। মোট ৫০টি সনেট গ্রন্থিত হয়েছে একাব্যে। প্রতিটি সনেটের প্রতিটি পংক্তিই অষ্টাদশ অক্ষর বিশিষ্ট। পংক্তির অক্ষর ১৪ স্থলে ১৮ বলে কাব্যের সনেটের ছন্দে সঙ্গীতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কবিতায় তা সুস্পষ্ট এবং সুপরিস্ফুট হয়েছে। সনেটের প্রথম অষ্টকে একটা ভাবকে বিশেষভাবে ধরে রাখা হয়েছে, পরবর্তী ষষ্ঠকে সে-ভাবের বিস্তার লাভ করেছে। বলা যায় একাব্যের বিভিন্ন সনেটে কবির ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙক্ষা, স্বদেশ-চেতনা, সাংসারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সংকট এবং ঐতিহ্যের রূপায়ণের পাশাপাশি কবি হৃদয়ের আকূতি বিধৃত হয়েছে। আত্মকথনের ভঙ্গিতে কবির ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস মূর্ত বেশ ক'টি সনেটে। তবে সমকালীন যুগচিত্র এবং স্বদেশ প্রেমের প্রকাশ সবচেয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। গ্রন্থটি প্রকাশের পর পরই বিভিন্ন সমালোচক এর সমালোচনা করেছেন। সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদের মন্তব্য, "তিনি অনেক কবির মতো এ যুগের আদিগন্ত অন্ধকারে একা রক্তাক্ত হৃদয়ে কাল কাটাচ্ছেন, তার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বলিষ্ঠ জীবন-উল্লাসে সাড়া দিতে পারছেন না। আঁধারকে জোর করে সরাবার কোনো প্রয়াস নেই তাঁর কবিতায়।"[৪] এ গ্রন্থের অপর এক সমালোচনায় বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, " প্রথম বই থেকে দ্বিতীয় বই পর্যন্ত মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

---

১. আবদুল হক, সমকাল, আশ্বিন ১৩৬৬, প: ১৪৮
২. সাপ্তাহিক দেশ, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৬, কলকাতা
৩. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, পূবালী, মাঘ, ১৩৭৬
৪. শাহাবুদ্দীন আহমদ, মাহে-নও, আশ্বিন ১৩৭৭, পৃ: ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

অনেক পথ অতিক্রম করেছেন। এই অতিক্রম তাঁর কবিচিত্তে সমৃদ্ধি এনেছে, তাঁর হৃদয়কে অভিজ্ঞ করেছে, চেতনাকে সংহত করেছে। .... প্রকৃতি ও প্রেম তাঁর হৃদয়ে আগে যে বর্ণনামূলক উচ্চারণ ও উচ্ছ্বাস জাগাত, তার বদলে এসেছে বক্তব্যের বহুমুখী বিস্তার, যে কোনো ঘটনাকে বক্তব্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করার সংকল্প উচ্ছ্বাসের বদলে আবেগের অন্তর্লীন শৃঙ্খলাবোধ প্রসঙ্গে আগ্রহ।"[১]

আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য, "মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ মূলত সৃষ্টি করেছেন সনেট — পঞ্চাশের আরো অনেক কবিই এই মাধ্যমটিকে ভালোবেসেছিলেন। ব্যক্তি, দেশ, সমাজ ঐতিহ্য — এই সব তাঁর কবিতার বিষয়; তাঁর একটি বিশিষ্ট চেষ্টা পুথির রূপায়ণে।"[২]

রক্তিম হৃদয় (১৯৭০) প্রথম প্রকাশিত হয় আগামসিহ্ লেন, ঢাকা থেকে। এ গ্রন্থের কবিতাগুলি ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে রচিত। মোট ৫৪টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে। একাব্যের অধিকাংশ কবিতা সনেট জাতীয়। সমাজ, জাতি ও মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের বোধ, গণ-মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, স্বপ্ন-আশা, ব্যক্তিজীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হতাশা ও অবক্ষয়ের চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। মাতৃভাষা বিষয়ক চারটি কবিতা ছাড়াও ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি নিয়ে রচিত দু'টি কবিতা স্থান পেয়েছে একাব্যে। আন্তর্জাতিক ঘটনা নিয়ে রচিত 'হোচি-মিনের মৃত্যুতে' কবিতাটিও স্থান পেয়েছে এতে। কবির নিসর্গ প্রীতির পরিচয় একাব্যের বেশ ক'টি কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়া বর্তমান যুগের সমকালীন জীবনের নেতি ও নাস্তির বোধ, অবিশ্বাসী মন, আশা ও আশ্বাসে বীতরাগ, প্রেমে ও ধ্যানে হৃদয়াবেগের পরিবর্তে রুক্ষ বয়স্ক মননের চর্চা কবিকে যেন ক্লান্ত করে তুলেছে। ফলে কবি আশ্রয় নিয়েছেন স্বদেশের আদি ও অকৃত্রিম যে রূপ ভাটিয়ালি বাউলের সুরে জারি-সারি-পুথির গাথায়।

এগ্রন্থের সমালোচনায় হাবীবুর রহমান বলেন, "তিনি সমকালীন সমস্যা ও যুগ-যন্ত্রণাকে অধ্যয়ন করেছেন। এর ফলে 'রক্তিম হৃদয়ের' কবিতাগুলি যেমন সুস্পষ্ট হয়েছে, তেমনি সমকালীন যুগ- মানসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছে।"[৩] অপর এক সমালোচনায় বলা হয়, " এই কাব্যগ্রন্থটিতে কবির মানুষ প্রীতির রূপটি স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। কবির ছন্দ, যতির মিল, কবিতার গতিকে আধুনিক জটিল কবিতা থেকে পৃথক করেছে। এর প্রতিটি কবিতা মানুষের বিচিত্র জীবনের ছোট ছোট আশা - আকাঙ্ক্ষার রসগ্রাহী বর্ণনা।"[৪]

কবি আতাউর রহমান একাব্যের সমালোচনায় বলেন,"তিনিও যুগ-যন্ত্রণার শিকার। জীবনের যন্ত্রণাময় অবক্ষয় পঠনে তিনিও আধুনিকদের সহযাত্রী। .... তবে মাহফুজউল্লাহ পূর্ণভাবে মানসিক নৈরাজ্যে নিমজ্জিত নন। সমাজ, জাতি ও মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন তাঁকে চাবুক মারে। মানুষের দুঃখ দুর্দশা তাঁকে পীড়িত করে।"[৫]

---

১. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, পূবালী, ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা
২. আবদুল মান্নান সেয়দ, কাফেলা, এপ্রিল ১৯৮১
৩. হাবীবুর রহমান, চিত্রাকাশ, ১২ই নভেম্বর ১৯৭০ সংখ্যা
৪. আমিনুল ইসলামবেদু, বই , নভেম্বর ১৯৭০, পৃ: ২৮২
৫. আতাউর রহমান, মাসিক ডাইজেস্ট, ১৯৭০, পৃ: ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

ফজল শাহাবুদ্দীন (জঃ ১৯৩৬)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার শাহপুর গ্রামে ফজল শাহাবুদ্দীন জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। প্রকৃত নাম কাজী আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন আহমদ। পারিবারিক উপাধি কাজী। পিতা কাজী তাজিমউদ্দীন আহমেদ সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স ও এম. এ. পাস করেছিলেন ১ম শ্রেণী পেয়ে। অবিভক্ত ভারতের ওরিয়েনটাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে ইন্স্যুরেন্স একজিকিউটিভ হিসেবে চাকুরী করেছেন।

ফজল শাহাবুদ্দীনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ঢাকার নারিন্দায় কাজী আবদুর রশীদ ফ্রী প্রাইমারী স্কুলে। এরপর ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে হাইস্কুল ফাইনাল (প্রবেশিকা) পাশ করেন ১৯৫০ সালে। ১৯৫১ সালে আই, এ. ভর্তি হন জগন্নাথ কলেজে। এই সময় ৫২'র ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দেয় — ভাষা আন্দোলনের সময়কার প্রথম শহীদ মিনার তাঁর সামনেই ভেঙে ফেলা হয় — এ ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি সে সময় কলেজের বন্ধু আনোয়ারুল করিমের সঙ্গে সেই শহীদ মিনারের ছবি সংবলিত ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কিত প্রথম সংকলন পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তিকাটি তদানীন্তন সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এ সময়ে একাডেমিক লেখাপড়ায় বিরতি ঘটে। নানাবিধ পেশায় নিয়োজিত থাকার ফলে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে ১৯৫৬ সালে সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে আই. এ. পাস করেন। ১৯৬২ সালে কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী কলেজ (বর্তমান শহীদ সোহরায়ার্দী কলেজ) থেকে বি. এ. পাস করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৬২ সালে অবজার্ভার গ্রুপে চাকুরী নেন। পরে 'পূর্বদেশ' এবং 'চিত্রালী'তে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত 'দৈনিক পাকিস্তানে' (বর্তমান দৈনিক বাংলা) কাজ করেন। দৈনিক বাংলায় থাকাকালীন ১৯৬৮ সালে 'বিচিত্রা' তাঁরই সম্পাদনায় প্রথম মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন পাক্ষিক 'চিত্রিতা' পত্রিকার। ১৯৫৬ সালে প্রথম কবিতা পত্রিকা 'কবিকণ্ঠ' প্রকাশ করেন। ১৯৮১ সালে কবিকণ্ঠ কবিগোষ্ঠির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই সংগঠনের সম্পাদকও ছিলেন। আন্তর্জাতিক পি. ই. এন বাংলাদেশ শাখার সম্পাদক। ফরাসী দেশের লিও শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পি-ই-এন (Poets, Playwrights, Essayists, Editors, and Novelists)-এর ৪৫তম কংগ্রেসে বাংলাদেশের প্রতিনধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে 'কবিতা কেন্দ্রে'র প্রতিষ্ঠা করেন কবি সৈয়দ আলী আহসান এবং কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে। সৈয়দ আলী আহসান কেন্দ্রের সভাপতি এবং ফজল শাহাবুদ্দীন, শামসুর রাহমান যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

কলেজের ছাত্রাবস্থায় একটা ম্যাগাজিনের সম্পাদনার কাজে জড়িত হয়ে লেখালেখিতে উৎসাহ বোধ করেন। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় তৎকালীন 'দৈনিক মিল্লাতে'র সাহিত্য পাতায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তৃষ্ণার অগ্নিতে একা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। এরপর 'আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর' (১৯৬৭), 'আততায়ী সূর্যাস্ত' (১৯৭৫), 'অন্তরীক্ষে অরণ্য' (১৯৮০), 'সান্নিধ্যের আর্তনাদ' (১৯৮৩), 'আলোহীন অন্ধকারহীন' (১৯৮৪), আমার নির্বাচিত কবিতা' (১৯৮৭) প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস এবং অনুবাদ গ্রন্থও রয়েছে। কবিতায় অবদানের জন্যে ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন এবং একুশে পদক লাভ করেন ১৯৮৮ সালে।

তথ্য : ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, আমার নির্বাচিত কবিতা গ্রন্থের কবি পরিচিতি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃষ্ণার অগ্নিতে একা (১৯৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয় মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে। সমকালীন সমাজ জীবনের অবক্ষয় এবং ক্ষয়িষ্ণুতার চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। নারীর দেহজ প্রেমের আর্তি, তার কামনা-বাসনা রূপ পেয়েছে এ গ্রন্থে। প্রতিদিনের বিকৃত বীভৎস দৃশ্য, ভিক্ষারত কুষ্ঠরোগী, বেশ্যাপল্লী, ছেঁড়া স্যান্ডেল, মৃত ইঁদুর আবর্জনাভরা ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি একাব্যের বিভিন্ন কবিতার উপজীব্য। তবু হতাশ নন কবি। অন্ধকার তাঁর কাছে সর্বদা নেতিবাচক বলে মনে হয়নি। জীবনের ওপারে আরেকটি সুন্দর জীবন তাঁকে বারবার হাতছানি দেয়। এ গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই কবি শামসুর রাহমান এর সমালোচনায় বলেন, "ফজল শাহবুদ্দীনের কবিতা দুর্বোধ্য নয়। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই সহজ, মধুর। প্রেমিকের যন্ত্রণাকাতর মুহূর্ত, মিলনের আনন্দ বিহ্বল চিত্র বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত হয়েছে এ গ্রন্থের কিছু সংখ্যক কবিতায়। এ ধরনের কবিতা রচনাতেই ফজল শাহাবুদ্দীনের কৃতিত্ব বেশী।"[১] অপর একটি সমালোচনায় সমালোচকের মন্তব্য, "দেহজ কামনা বাসনার অনাবৃত প্রকাশ ও জীবনের নৈরাজ্য তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম, 'তৃষ্ণার অগ্নিতে একা' (১৯৬৫)। এই সংকলনের জন্যে নির্বাচিত 'পুরোনো গলি', কবিতার স্থায়ীভাব স্মৃতি, যা কবিতার পক্ষে একটি জরুরী ব্যাপারও। স্মৃতির শরীরে এক ধরনের ধূসর দূরত্বের গন্ধ লেগে থাকে। অভিজ্ঞতা পরিণত হয় স্মৃতির অবগাহনে, ঐতিহ্যে।"[২] ড. রফিকুল ইসলামের মন্তব্য, 'কবি বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক অভিঘাতে দিশেহারা মানুষের অসহায় অবস্থা চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন। সে মানুষ আমাদের পরিচিত সমাজের নাও হতে পারে, হয়তো সে মানুষ যন্ত্র-সভ্যতার পীঠস্থান অন্য দেশের অন্য মানুষেরও কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, কবি যে মানব-সভ্যতার একটি বিশেষ পর্যায়কে বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন সেইটেই বড় কথা।"[৩]

আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর (১৯৬৭) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে রচিত কবিতা থেকে কবিতাগুলি গ্রন্থিত হয়েছে একাব্যে। সমকালীন জীবনের অস্থিরতা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, হরতাল, মিছিল, গণ-মানুষের বিক্ষোভ, হাহাকারে বিদীর্ণ স্বদেশভূমির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। চারপাশের এই নিরানন্দময় পরিবেশ, ঘৃণা, আতঙ্ক, বিভীষিকার জগৎ কবির চেতনাকে আনন্দহীন করে তুলেছে। ফলে অধিকাংশ কবিতায় কবির অন্তর্মুখী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। মৃত্যু সম্পর্কেও কবির বিশেষ উপলব্ধি মূর্ত হয়ে উঠেছে কোনো কোনো কবিতায়। লোকশ্রুতি অনুসারে একদা এদেশের সম্পদের অন্ত ছিলো না, অথচ বাঙলাদেশ এখন হাহাকারে বিদীর্ণ। এই মর্ম-পীড়াদায়ক স্মৃতি নিয়ে রচিত স্বদেশ প্রেমের একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে এতে। ১৯৬৮, ১৯৬৯-এর দিকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের জাগরণ শুরু হয়। বাঙলা ভাষা, বাঙলাদেশ প্রভৃতি জনচিত্তে নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়। ফজল শাহাবুদ্দীনও এই নতুন অনুভূতি নিয়ে নব-প্রেরণায় কবিতা লিখেছেন, একাব্যে। এ গ্রন্থের সমালোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "যে দুঃসহ অবস্থা থেকে একটা জ্বালা, যন্ত্রণা আর ক্ষোভ কবির দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এক কুৎসিত নগ্নতায় সবকিছু ভরে যায়, সুন্দর আর সুন্দর থাকে না, সব কিছুর আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে — ফজল শাহাবুদ্দীন ঐ কুৎসিত নগ্নতার আর উজ্জ্বল অশ্লীলতার রূপকার।"[৪]

---

১. শামসুর রাহমান, পূবালী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৩, পৃ: ৪৫৫
২. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের কবি পরিচিতি ও কবিতা, গঙ্গোত্রী, জুন-আগষ্ট ১৯৭১, পৃ: ১০৯
৩. আধুনিক কবিতা, পৃ: ৮৬
৪. আধুনিক কবিতা, প: ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬)

যশোর শহরের খড়কী এলাকায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ১৫ই আগষ্ট। পিতা মোহাম্মদ শাহাদাত আলী প্রথমে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পদে চাকুরী করে ১৯৬৮ সালে যশোর জেলা বোর্ডের হিসাব বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি বাবার কাছে। পারিবারিক পরিবেশে কিছুদিন পড়াশোনা করে ১৯৪৬ সালে তিনি যশোর জেলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯৫৩ সালে প্রথম বিভাগ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৫ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি. এ. সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স এবং ১৯৫৯ সালে এম. এ পাশ করে এখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রোফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই-এর তত্ত্বাবধানে 'আধুনিক বাঙলা কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্যে ১৯৬৯ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৯-৭০ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল বার্সারী প্রোগ্রামে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট-উত্তর গবেষণা করেন। ছাত্রাবস্থায় কিছুকাল (১৯৫৭-৫৮) তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক মিল্লাতের' সাহিত্য সম্পাদকও ছিলেন।

স্কুল জীবন থেকেই তিনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও বর্ণনামূলক রচনা লিখতেন। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছেন। দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় ১৯৫২ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'এই আজাদী' প্রকাশিত হয় যশোরের 'ইশারা' মাসিক পত্রিকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তাঁর কবিতা ঢাকার 'মাহে-নও', 'সমকাল', 'পূর্বাচল', কলকাতার 'নতুন সাহিত্য' 'দেশ', 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দুর্লভ দিন' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। এরপর 'শঙ্কিত আলোকে' (১৯৬৮), 'বিপন্ন বিষাদ' (১৯৬৮), 'প্রতনু প্রত্যাশা' (১৯৭৩), 'ভালবাসার হাতে' (১৯৭৬), 'ইচ্ছেমতী' (১৯৭৬), 'ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার' (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। এছাড়াও গবেষণা গ্রন্থ, অনুবাদ ও সম্পাদনা গ্রন্থও রয়েছে প্রচুর।

বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। তিনি ঢাকার বাঙলা একাডেমী, ইতিহাস সমিতি, ইতিহাস পরিষদ, বাঙলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য এবং কেমব্রিজের ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী অব পোয়েটস এর প্রতিষ্ঠাতা ফেলো।

সাহিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দেশে ও বিদেশে সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্যে বাঙলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭২ সালে। লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল 'হুজ হু ইন পোয়েট্রি' থেকে 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' পেয়েছেন ১৯৬৯ সালে। এছাড়া হাসান হাফিজুর রাহমান স্বর্ণপদক (১৯৮৪), বাঙলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৪), যশোর সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৪)ও পেয়েছেন।

দুর্লভ দিন (১৯৬১) প্রথম প্রকাশিত হয় সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে রচিত মোট ৩৪টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এ গ্রন্থটি। সমকালীন জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আশা-আকাঙক্ষা, স্বপ্ন-ব্যর্থতা, একাব্যের বিভিন্ন কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। মনোজগতের

Dhaka University Institutional Repository

টানাপোড়েনের চিত্র বিশেষভাবে তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং শেরে বাংলা-কে স্মরণ করে রচিত দু'টি কবিতা স্থান পেয়েছে একাব্যে। প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বিলুপ্তি কবির মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে তাঁর প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায় কোনো কোনো কবিতায়। এ গ্রন্থের সমালোচনায় ড. মধুসূদন চক্রবর্তী বলেন, "তিনি আবহমান কালের যেসব উপাদান প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত, সে সব অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে দেননি, সে সবের মধ্য থেকেই কাব্যের রসদ সংগ্রহ করেছেন এবং পরিবেশনের গুণে সেসব ভাবসম্পদে সম্পূর্ণ চিত্তগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে, তাঁর আন্তরিকতা পাঠক মনেও অনুরণন তুলেছে, আবহমান কালের কাব্য ধারার সঙ্গে অত্যাধুনিক হয়ে এই যে সজ্ঞানে সংযোগ রক্ষা, এর জন্যে তাঁকে বাহাদুরী দিতেই হয়।"[১]

ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "বিশ শতকের ছয়ের দশকের শেষপাদেও মনিরুজ্জামান প্রাত্যহিক জীবন থেকে সৌন্দর্যের সন্ধান করতে পারেন, সেই সহজ সৌন্দর্যকে কবিতায় পরিণত করতে পারেন। যুগে যুগে যেসব উপাদান কবিদের প্রেরণা জুগিয়েছে মনিরুজ্জামান সেগুলো উপেক্ষা করেননি বরং আন্তরিকভাবে তাঁর ব্যবহার করেছেন।"[২]

শঙ্কিত আলোকে (১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয় কথাকলি, ঢাকা থেকে। মোট ৪০টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ সংকলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে হাসান হাফিজুর রহমানকে। এ গ্রন্থের 'কৃষ্ণচূড়ার মেঘ' কবিতাটি ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রচিত। অন্যান্য কবিতা ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে রচিত কবিতাবলী থেকে নির্বাচিত। এ কাব্যেও সমসাময়িক জীবন-ভাবনার পাশাপাশি সামাজিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন কবিতায়। বলা যায়, আধুনিক সমাজ-ভাবনা তাঁর কবিতায় এসেছে তিনভাবে; যুগ-মানসের যন্ত্রণার কথা তিনি বলেছেন, পূর্ববাংলার সংস্কৃতিতে বিদেশী সভ্যতার আগ্রাসনে কি-কি অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাও তাঁর কবিতার উপজীব্য হয়েছে; এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা-সচেতনতাও তাঁর কোনো কোনো কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। একাব্যের সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানও রোমান্টিক মানস-প্রবণতায় প্রকৃতি-আশ্রয়ী হয়েছেন। রোমান্টিক মানস-প্রবণতা যেসব কবিতায় রূপায়িত হয়েছে সেগুলোতেও অনুভূতি এবং আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণের চাইতে ভাবনার পরিপাটি রূপায়নই অধিক অনুভবযোগ্য। .... শুধু প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা নয়, আধুনিক নগর জীবন এবং নাগরিক সভ্যতার বিকৃতি। মানস-বিকলন এবং উৎক্ষেপের প্রতিক্রিয়ার পরিচয়ও ফুটিয়ে তুলেছেন।"[৩]

বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে কথাকলি, ঢাকা থেকে। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে রচিত মোট ৩৩টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ সংকলনে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে সৈয়দ আলী আহসানকে। সমকালীন জীবনের অসঙ্গতি ও অসহায়ত্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নৈরাশ্যব্যঞ্জক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। এছাড়া এদেশের সংস্কৃতির ওপর বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিক্রিয়া নিয়ে রচিত হয়েছে একটি কবিতা। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নানা সমস্যা ও সংকট একাব্যের বিভিন্ন কবিতায় উপজীব্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন কবি-মানসের প্রতিফলন ঘটেছে বেশ ক'টি কবিতায়। ব্যক্তিগত হতাশা ও দীর্ঘশ্বাস উপজীব্য হয়েছে একাব্যের কোনো কোনো কবিতায়। বলা যায় , সমকালীন জীবন ও যুগভাবনার মধ্যে প্রবল হয়েছে কবির আন্তর্জাতিকতা বোধ। এক্ষেত্রে কবির ব্যঙ্গদৃষ্টির তীক্ষ্ণতা

---

১. বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ধারা পৃ. ২৪৭
২. আধুনিক কবিতা, পৃ: ৮৮
৩. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, 'পঁচিশ বছরের কবিতা' উত্তরাধিকার, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিলক্ষিত হয়। সমালোচক বশীর আল হেলাল বলেন, "মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বিশিষ্ট স্বাদের কবি। কবিতায় দেহরূপের চর্চায় তাঁর যত্ন বেশি। সেই অনুপাতে রসের উৎসার কম। তিনি ছন্দ সম্পর্কে সচেতন। হৃদয়ের তুলনায় কান তাঁর বেশি সর্তক। ....তবে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জাগতিক বিষয়সমূহ এমনকি বহমান জাগতিক সমস্যাসমূহ নিয়েও কাব্যচর্চা করেছেন। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা ছড়াধর্মী হয়ে উঠেছে।"[১]

---

১. বশীর আল হেলাল, সাম্প্রতি কবি ও সাম্প্রতিক কবিতা, পৃ: ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

দিলওয়ার (জ. ১৯৩৭)

সদর সিলেটের অর্ন্তগত দক্ষিণ সুরমাস্থ ভার্থখোলা গ্রামে দিলওয়ার জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারি। পিতা মৌলভী হাসান খান আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। এক ধ্যানী মানস আমৃত্যু তাঁর ভেতর কার্যকর ছিলো। মা মোসাম্মৎ রহিমুন্নেসা ছিলেন এক প্রভাবশালী ভূস্বামীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। নিরক্ষর হলেও তার মধ্যে ছিলো অসাধারণ কর্মদক্ষতা, আত্মসম্মানবোধ, জীবনের মূল্যবোধ এবং দূরদর্শিতা। জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে কবির জীবনে মায়ের প্রভাব সমধিক।

দিলওয়ারের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ১৯৪৩ সালে, সিলেটের ঝালপাড়া পাঠশালায়। পরবর্তীকালে ৪র্থ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজা গিরীশ চন্দ্র হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯৫২ সালে এ স্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯৫৪ সালে মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে আই. এ. পাস করেন। স্বাস্থ্যগত কারণে কিছুদিন লেখাপড়া করতে পারেননি। পরে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে রীতিমত পড়াশোনা শুরু করলেও ধারাবাহিক অসুস্থতার কারণে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়া হয়নি আর। এই অসুস্থতা এখনো বহন করছেন।

কর্মজীবনের শুরুতে দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক গণকণ্ঠের সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন বেশ কিছুকাল। এরপর সোভিয়েট দূতাবাসের সংস্কৃতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত মাসিক 'উদয়নে' সিনিয়র অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। পারিবারিক অসুবিধার জন্যে অবশ্য এই চাকুরীটি তিনি অল্প দিনের মধ্যেই আবার ছেড়েও দেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

দিলওয়ার স্কুলজীবন থেকেই লিখে আসছেন। তাঁর প্রথম কবিতা 'সাইফুল্লাহ হে নজরুল' ১৯৪৯ সালে স্থানীয় 'যুগভেরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। এই বছরই 'পূবাল হাওয়া' নামে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এরপর 'ঐকতান' (১৯৬৪), 'উদ্ভিন্ন উল্লাস' (১৯৭২), 'ফেসিং দি মিউজিক' (১৯৭৫), 'সনিষ্ঠ স্বদেশ' (১৯৭৭), 'নির্বাচিত কবিতা' (১৯৮৭), 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' (১৯৮৩), এবং 'দিলওয়ারের শত ছড়া' (১৯৮৯) প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রবন্ধগ্রন্থ 'বাঙলাদেশ জন্ম না নিলে' (১৯৮৪) এবং কয়েকটি সম্পাদিত গ্রন্থও রয়েছে।

কবিতায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮০ সালে। এছাড়া ১৯৭৮ সালে সিলেটের জনসাধারণ কর্তৃক সংবর্ধনা লাভ করেন এবং সর্ব প্রথম তাম্রফলকে মানপত্র ও স্বর্ণ শাপলা পুরস্কার পান। আবুল মনসুর সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৬ সালে।

ঐকতান (১৯৬৪) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে কবি দিলওয়ার সংবর্ধনা কমিটি, সিলেট থেকে। মোট ৫৪টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত একাব্য গ্রন্থটির প্রকাশনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য একারণে যে, গ্রন্থটি কবির বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সহযোগিতায় তাদেরই উৎসাহে-উদ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে সাধারণ মানুষেরা আজ শ্রেণী-বৈষম্যের শিকার, শোষিত, পীড়িত এবং বঞ্চিত — এ গ্রন্থে কবি সমাজের যাবতীয় অসাম্য, অন্যায়, অবিচারের প্রতি সোচ্চারে তীব্র ধিক্কার ছুঁড়ে দেন। সম্ভবত, একারণেই দক্ষিণ আফ্রিকার গণমানুষের নেতা নেলসন মেনডেলাকে নিয়ে রচিত একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে একাব্যে। শেক্সপিয়রকে নিয়ে রচিত একটি কবিতাও আছে এতে। এছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারি

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থটির নাম-কবিতাটি। কবির এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পরে কথাসাহিত্যিক রাহাত খান এর একটি সমালোচনায় গ্রন্থটিকে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থটি প্রকাশের আগে কবির আরো দুটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে জিজ্ঞাসা (১৯৫৩) এবং পূবাল হাওয়া (১৯৫৩) নামে।[১] গ্রন্থটি সম্পর্কে রাহাত খানের বিশ্লেষণ, "সামগ্রিক বিচারে কাব্যটির মূলসুর যা — তা হলো একটি উৎকণ্ঠিত, উচ্চকিত অনুভূতি — সুন্দরের জন্যে মানবিকতার জন্যে যৌবন ও জীবনের জন্যে। রূপকল্প ও আঙ্গিক রীতিতে রাবীন্দ্রিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রভাব চিহ্নিত, তবে সে প্রভাব প্রায়শ কতগুলি শব্দ ব্যবহারেই সীমিত, মূলভাবধারা রবীন্দ্রযুগ থেকে তেমন প্রাগ্রসর নয়। এই থেকে অন্তত একটি কথা বলা চলে, সেটি হচ্ছে কবি যুগ-সচেতন হয়েও যুগের তীব্র টানা-পোড়েনের ধারক নন। যুগ-যন্ত্রণার ছাপ যতটুকু আছে তা মহত্ত্বের, ব্যক্তি-মেধার বিশেষত্বের পরিচায়ক নয়। .... কবি সহজ কাব্য প্রতিভার অধিকারী। স্বভাব কবির পরিমিত ব্যক্তিত্ব তাঁর মধ্যে সহজে বিকশিত।[২]

---

১. 'জিজ্ঞাসা', 'পূবাল হাওয়া' ভার্থখোলা, সিলেট, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩

২. রাহাত খান, 'মাসিক পূবালী', ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৭২, পৃ: ৯১৯

Dhaka University Institutional Repository

ওমর আলী (১৯৩৯)

পাবনা জেলার শিবরামপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ওমর আলী জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৯ সালের ২০শে অক্টোবর। পৈতৃক বাড়ি একই জেলায় চরঘোষপুর গ্রামে। পিতা উজির আলী জমিজমার তদারকি করতেন।

ওমর আলীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় পাশের গ্রামে চরচাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কিন্তু পরের বছর স্কুলটি পদ্মানদীর গর্ভে বিলীন হওয়ায় চরঘোষপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৪৯ সালে পাবনা গোপালচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর ঢাকার আরমানীটোলায় হাম্মাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৯৫৪ সালে। এই সময় তিনি কবি আহসান হাবীবের বাসায় জায়গীর থাকতেন এবং তাঁর সন্তানদের পড়াবার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সালে হাম্মাদিয়া স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে জগন্নাথ কলেজে আই. এ. ভর্তি হন। কিন্তু পরে ১৯৬২ সালে সোহরায়ার্দী কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ১৯৬৫ সালে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ পাশ করেন। ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলায় এম. এ. পাশ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে 'দৈনিক সংবাদ'-এর বার্তা বিভাগে সাব এডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। এরপর সরকারী কলেজের ইংরেজী বিভাগে প্রভাষক হিসেবে বিভিন্ন কলেজে চাকুরী করে বর্তমানে শহীদ বুলবুল সরকারী কলেজ, পাবনায় কর্মরত আছেন। প্রথম গ্রন্থ 'অরণ্যে একটি লোক' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। এরপর 'আত্মার দিকে' (১৯৬৮), 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' (১৩৬৭), 'নদী' (১৯৬৯), 'নিঃশব্দ বাড়ি' (১৯৭৩), 'বিয়েতে অনিচ্ছুক একজন' (১৯৭৫) প্রকাশিত হয়। মোট ২৩ খানা কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও দু'টি উপন্যাস 'কুতুবপুরের হাসনা হেনা' এবং 'খান ম্যানসনের মেয়ে' রয়েছে।

সাহিত্যে অবদানের জন্যে কবিতায় বাঙলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮১ সালে।

অরণ্যে একটি লোক (১৯৬৬) প্রথম প্রকাশিত হয় শিলাইদহ, কুষ্টিয়া থেকে। মোট ৫৯টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এ গ্রন্থে। সমকালীন যুগ চৈতন্যে সমাজ জীবনের যে সংকট, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হতাশা, ক্ষোভ, পাওয়া-না-পাওয়ার আনন্দ বেদনা — তাই একাব্যের উপজীব্য। নারীর দেহজ সুধাময় মধুর প্রেমের চিত্র যেমন আছে তেমনি বিপরীতে তার ঘৃণা আর অবহেলার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে কোনো কোনো কবিতায়। পরীদের নিয়ে রচিত একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে একাব্যে। এছাড়া মৃত্যু-চিন্তা বিষয়ক একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে একাব্যে। স্বদেশ প্রেম, প্রকৃতি-চেতনা, অরণ্য ভূমির নির্জনতা, গ্রাম বাংলার আদি ও অকৃত্রিম রূপের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় একাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির বিশেষ দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে একাধিক কবিতায়। একাব্যের আলোচনায় সমালোচক বলেন, "দেহজ-কামনা বাসনা এবং সুখানুভবের আকাঙক্ষা তাঁর কবিতায় স্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত, এই অভিব্যক্তি যদি গভীরতর কোনো চেতনা-নিষিক্ত হতো তাহলে তা অমোঘ আবেদনের দাবী নিয়ে উপস্থিত হতো। আঙ্গিক ও প্রকাশ প্রকরণে ওমর আলী নতুনত্বের অভিসারী কিন্তু মনোভঙ্গীর দিক থেকে তিনিও রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন।"[১]

---

১. মোঃ মাহফুজউল্লাহ, সমকালীন সাহিত্যের ধারা, নওরোজ কিতাবিস্থান ১৯৬৫, পৃ: ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি (১৩৬৭) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে কোহিনুর লাইব্রেরী, ঢাকা থেকে। মোট ৫০টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে একাব্যে। প্রায় কুড়িটি সনেট, চারটি দীর্ঘ এবং ছাব্বিশটি মাঝারি ধরনের কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পূর্ব বাংলার শ্যামলরূপের একটি মমতা-মাখানো পরিচয় বিধৃত হয়েছে সনেটগুলোতে। এছাড়া প্রেম, প্রিয়তম ও নৈরাশ্য সনেটগুলোর অঙ্গে অঙ্গে কখনো নৈরাশ্যের মেঘময় পরিবেশ, কখনো প্রিয়তমার অবহেলা, কখনো ফাল্গুনের ঝিকিমিকি বাসন্তী আলোয় হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে। 'ফরহাদের প্রতি শিরীন ও শিরীনের প্রতি ফরহাদ' সনেট দুটি না-পাওয়ার বেদনা, দীর্ঘশ্বাস ও কান্নায় উদ্ভাসিত। কবিতাগুলিতে রোমান্টিকতা থাকলেও প্রেম, ভালোবাসা ও মিলন-বিরহের কথা আঁকলেও মৃত্যুর একটি করুণ চিন্তা সর্বত্র বিষাদের প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব-সৃষ্টিরহস্যের অজানা জগৎ সম্পর্কে কবির কৌতূহল মূর্ত হয়ে উঠেছে একটি কবিতায়। গ্রন্থটি প্রকাশের পর পর আবদুল হাফিজ এর সমালোচানায় বলেন, "সামগ্রিকভাবে কাব্যটি রোমান্টিক। প্রেম, দেহজ-কামনা, মৃত্যু, অভিমান গার্হস্থ্য ভালোবাসা ও নৈরাশ্য একাব্যের পরিমন্ডল রচনা করেছে। একদিকে যৌবনের প্রতি কবির আসক্তি আর অন্য দিকে মৃত্যুর বিষণ্ন হাতছানি — এ দুই-ই আধুনিক কাব্যের লক্ষণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্য নয়, বরং বাঁচার আশাই একাব্যে উচ্চকিত।"[২] অপর এক সমালোচনায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, " ওমর আলী মূলত প্রেমের কবি। তাঁর কবিতায় প্রধান উপজীব্য নারী, এ দেশের শ্যামল রঙ রমণী নিয়ে তিনি অনেক কাব্য করেছেন। প্রেমের মান-অভিমান আর মিলনের আনন্দ কবি প্রাণ ভরে কবিতাবদ্ধ করেছেন।"[৩]

---

২. আবদুল হাফিজ, পূর্বমেঘ, দ্বিতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা আসাঢ়-১৩৬৮, প: ১৬
৩. ডঃ রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, পৃ: ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ কাদরী (১৯৪২)

১৯৪২ সালের ১৪ আগষ্ট কলকাতায় শহীদ কাদরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহের বাড়ি ছিলো পাবনার সিরাজগঞ্জে। পিতা খালেদ-ইবনে-আহমাদ কাদরী কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক ইংরেজী কাগজের সম্পাদক ছিলেন। কাদরী পড়াশোনা করেন কলকাতায়। ১৯৫৮ সালে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করার পর তিনি আর লেখাপড়া করেননি। কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান টেলিভিশন করপোরেশনে কাজ করেছেন। পরে সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা এ.পি.এন-এ বেশ কিছুদিন কাজ করেন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন শহরে বসবাস করছেন।

ছাত্রাবস্থায় কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'নির্বাণ' প্রকাশিত হয়েছিলো বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়। প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি যেদিন তাঁর হাতে আসে, সেদিনই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময়ে দেশের উল্লেখযোগ্য সব পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরাধিকার' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এরপর 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' (১৯৭৪) এবং 'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই' (১৯৭৮) প্রকাশিত হয়। তাঁর আর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবিতায় বাঙলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৭৩ সালে।

নির্লিপ্তি ও নিঃসঙ্গতা কাদরীর জীবনের ও সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি কোনো সংগঠনের সঙ্গে কোনোদিন জড়িত ছিলেন না। তিনি আজন্ম নগরবাসী এবং স্বতোৎসারিত নগর-চেতনা তাঁর কবিতায় শুদ্ধ স্বাভাবিকতায় প্রকাশিত। তাছাড়া আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তি, বোহেমিয়ানা, প্রকৃতি-বিমুখতা, নগর-জর্জরতা তাঁর কবিতায় সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। এইসব কিছু 'উত্তরাধিকার'-এ বিধৃত হয়ে তাঁর কবি-খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি মাত্র কবিতার বই-ই তাকে পরিচিত করেছে শহর-ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে।

উত্তরাধিকার (১৯৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয় বইঘর, চট্টগ্রাম থেকে। এই গ্রন্থের শীতে, নির্বাণ, শত্রুর সাথে একা, তিনটি কবিতা রচিত হয়েছে ১৯৫৬ সালে অর্থাৎ কবির কিশোর বয়সে। বাকি কবিতাসমূহ ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে রচিত। মোট ৪০টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে এই সংকলনে। সমকালীন নগর জীবনের হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃস্বতা, একাকিত্ব ব্যক্তিমনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং অনিকেত বোধ প্রধানত একাব্যের উপজীব্য। এছাড়া স্বদেশ চেতনা, নিসর্গপ্রীতি এবং শিল্প-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন কবিতায়। মৃত্যু-চেতনা বিষয়ক একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে একাব্যে। গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই ড. হুমায়ুন আজাদ এর সমালোচনায় বলেন, "তাঁর কাব্যের নাম 'উত্তরাধিকার'। বস্তুত তিনি তাঁর স্বইস্কুলীয়দের মতোই উত্তরাধিকারহীন ছিন্নমূল নিঃস্ব। শহীদ কাদরী বোহেমিয়ান নগর লালিত ও নগর জর্জরিত প্রকৃতিবিমুখ ক্যাফে-রেস্তোরাঁয় বর্ধিত। .... কাদরী আপদমস্তক আধুনিক, ব্যক্তিবাদী এবং সাম্প্রতিক জগতের বহু ময়লা তাঁর গায়ে, শামসুর রাহমানকে, যেমন মনে হয় প্রচন্ড ধূলিঝড়ে বিপর্যস্ত একটি বৃক্ষ, যাঁর আকাঙক্ষা নীলাকাশে বিস্তার লাভ; শহীদ কাদরী যেন ড্রেন, তাঁর মধ্য দিয়ে ধীরস্রোতে সাম্প্রতিক জগতের বিস্তর আবর্জনা বয়ে যাচ্ছে। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।"[১] অপর এক সমালোচায় ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "শহরকে কবিতায় ব্যবহারে শহীদ কাদরী শুধু সার্থক নন, মাঝে মাঝে দুঃসাহসীও বটে। শহীদ কাদরীর শহর পরিক্রমায় জ্বালা আছে কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা সহানুভূতি নেই। কাদরীর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা শহরের সঙ্গে এমনভাবে

---

১. হুমায়ূন আজাদ, পরিক্রম, ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪৯৪

Dhaka University Institutional Repository

আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো যে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। .... শহীদ কাদরী কবিতায় শহর-ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার।"[১] গ্রন্থের অপর এক সমালোচনায় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, "আধুনিক নগরজীবনের খন্ড-বিচ্ছিন্ন উপলব্ধি ও টুকরো ছবিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন শহীদ কাদরী তাঁর কবিতায়। তাঁর উপলব্ধি প্রগাঢ় এবং অনুভূতি তীক্ষ্ণ, সেই প্রগাঢ় উপলব্ধি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিকে ধরে রাখবার কাব্যময় ভাষাও তাঁর আয়ত্তে। .... অবশ্য সামাজিক মনের রূপায়নের চেয়ে ব্যক্তি মনের রূপায়নের দিকেই তাঁর প্রবণতা এবং সম্ভবত একারণেই অনেক কবিতা আত্মজৈবনিক।"[২]

---

১. ড. রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, পৃ. ৮৯

২. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, উত্তরাধিকার, ১৯৭৪, পৃ: ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মান্নান সৈয়দ (জন্ম . ১৯৪৩।

পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণায় আবদুল মান্নান সৈয়দ জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৪৩ সালের ৩রা আগষ্ট। পিতা সৈয়দ এম. এ. বদরুদ্দোজা সরকারী চাকুরী করতেন। তবে প্রথম যৌবনে তিনিও উর্দু ভাষায় কবিতা লিখতেন। এছাড়া ইংরেজী ও বাংলায় নিয়মিত ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল তাঁর।

আবদুল মান্নান সৈয়দের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে। পরবর্তী সময়ে ঢাকার নবাবপুর হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং ঐ স্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৬০ সালে আই. এ. পাশ করেন ঢাকা কলেজ থেকে। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাংলা ভাষার কালজয়ী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষয়ে তিনি ১৯৮০-৮৪ সালে গবেষণা করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৬৫ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে ঢাকার শেখ বোরহানউদ্দীন কলেজে (১৯৬৬-৬৭) অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি সরকারী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। সেই সূত্রে দীর্ঘদিন সরকারী এম.সি. কলেজ (সিলেট), জগন্নাথ কলেজ ও নোয়াখালী গার্লস্ কলেজ অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি সরকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম কবিতা 'সোনার হরিণ' ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকীতে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। এরপরে জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬৯), মাতাল মানচিত্র (১৯৭০) ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ (১৯৭৪) নির্বাচিত কবিতা (১৯৭৫) কবিতা কোম্পনী প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৮২) পরাবাস্তব কবিতা (১৯৮২) পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি (১৯৮৩) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ এবং সম্পাদনা গ্রন্থ রয়েছে। 'শিল্পকলা' নামে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শিল্পকলার ৮টি সংখ্যা (১৯৭০-৭৩) প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'চারিত্র' নামে একটি সাহিত্য বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। 'চারিত্র'-এর ৪টি সংখ্যা (১৯৭৯-৮৫) প্রকাশিত হয়। 'শব্দশিল্প' (১৯৭০) নামে একটি অণুপত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন তিনি।

সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮১ সালে। এছাড়া হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৩), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৬), ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯১) পেয়েছেন।

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৭) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ধ্রুপদ প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে রচিত মোট ১৭টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে একাব্যে। বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের পথে পরিক্রমা না করে মান্নান সৈয়দ ইউরোপীয় কাব্যরীতির, বিশেষত, ফরাসী কাব্যরীতির অনুসরণের দিকেই ঝোঁকেন। কবিতায় যাকে বলে পরাবাস্তবতা, ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা ও কুহেলিকা সৃষ্টির প্রয়াস — এ কাব্যে তারই প্রকাশ ঘটেছে। শিল্পের জন্যে শিল্প এবং সৌন্দর্যই শিল্পের প্রধান অভীষ্ট — এই রকম চেতনা থেকে মান্নান বলেন, 'কবিতা লেখার জন্যে নিজের গভীর বিবরে ঢুকে

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়া চাই; সেখানে সমাজ নেই, ধর্ম নেই, রাষ্ট্র নেই, সেখানে আছে এক অপার অনন্ত আমি। সেখানকার সমুদ্রের নাম আমি, আর যে একখানি দ্বীপ আছে, তার নামও আমি, আর সেই দ্বীপে যে একখানি কাগজের নৌকা বাঁধা আছে — তার নামও আমি।"১

এইসব আত্মউচ্চারণ আবদুল মান্নান সৈয়দকে দিয়েছে পৃথকতা। তবে একথা বলা যায়, একাব্যের কবিতা আধুনিক আত্মার নির্যাস, চলতি শতাব্দীর জরাজীর্ণ সভ্যতার মাটিতে মরমী অথচ ক্লেদাক্ত ফুল-ফসল। ব্যক্তিসত্তা তাঁর কাছে সর্ব-বিশারদ; অবিনাশী সেই ব্যক্তিক নির্মিতির প্রেরণায় কবিতাকে তিনি করে তুলেছেন ঋদ্ধ জটিল স্বভাবী আর পরাবাস্তব-মনস্ক। একাব্যের সমালোচনায় বশীর আল হেলাল বলেন, "একটা বিদ্রোহ তাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই বিদ্রোহ সকল প্রকার প্রচলিতের বিরুদ্ধে — প্রচলিত বিশ্বাস, প্রচলিত মূল্যবোধ, নারী-পুরুষের প্রচলিত সম্পর্ক, ঈশ্বর বা দিব্যপুরুষদের সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারণা এবং কবিতায় প্রচলিত ভাষারীতির বিরুদ্ধে।"২ অপর এক সমালোচনায় শহীদ কাদরী বলেন,"তার প্রথম কবিতার বই 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' আগাগোড়া টানা গদ্যে লেখা (যা কিনা বিশ্বব্যাপী কন্টিনেন্টাল প্রোজ পোয়েম নামে পরিচিত)। আমার ধারণা 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' বইটি গোটা বাংলা কবিতার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।"৩ এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর পরই কথা সাহিত্যিক শওকত ওসমান 'নতুন কবিতা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে এর সমালোচনায় বলেন, "মান্নান আঙ্গিকের দিক থেকে পুরোপুরি পরাবাস্তবতাবাদী বা সুররিয়ালিষ্ট। চিত্রকল্পের মাধ্যমেই তার ভাবজগৎ নির্মিত। মান্নানকে ভুল বোঝাবুঝির তাই যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু ইউরোপীয় কাব্যধারার সঙ্গে পরিচয় থাকলে, এমন হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা কম। সংকুচিত পৃথিবীতে শিল্পের ভাববস্তু (content) হোক জাতীয়, আকার প্রকার বা গড়ন (form) হোক আন্তর্জাতিক। গ্রাম্যতা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। নতুন টেকনিক আমদানী কোন অপরাধ নয়। শুধু প্রশ্ন তার সাফল্য দেশী ঐতিহ্যে কতটুকু সুসঙ্গতি লাভ করেছে। মান্নান এই ক্ষেত্রে আশ্চর্যরকমে অনেকখানি সফল।'৪

জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬৯) প্রকাশিত হয়েছে ধ্রুপদ প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। এ গ্রন্থের কবিতাগুলো রচিত হয়েছে ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে। একাব্যের কবিতাবলী 'শব্দের জ্যামিতি' 'উড়ন্ত অনুভূতি' এবং 'কবিতানাট্য' শীর্ষক তিনটি উপবিভাগে গ্রন্থিত। 'উড়ন্ত অনুভূতি' অংশে ৬টি কবিতা স্থান পেয়েছে। 'ঈশ্বর প্রাপ্তির ছোট্ট গাথা' 'বিশ্বাসের তরু' ও জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা'–তিনটি কবিতা-নাটক 'কবিতানাট্য' শীর্ষক উপবিভাগে স্থান পেয়েছে। সমকালীন জীবনের নগ্ন, নিষ্ঠুর, রূঢ় বাস্তবের কঠিন ভোগান্তি থেকে নিরাময়ের জন্যে স্বপ্ন-কল্পনায় রচিত হয়েছে একাব্যের কাল্পনিক জগৎ। যেখানে কুয়াশায় ইশারার মতো হীরের চোখ ঝরে ঝরে পড়ে। তবে বলা যায়, একাব্যে কবি অস্পষ্টতা থেকে ক্রমান্বয়ে স্পষ্টতার দিকে যাত্রা করেছেন। এমনকি চিত্র রচনা, শব্দ ব্যবহার ও নিসর্গ সন্দর্শনে ধীরে ধীরে জীবনানন্দীয় পরিমন্ডলের দিকে যাত্রা করেছেন বলেই মনে হয়। তবে জীবনানন্দ যেখানে লোক-পুরাণে ভ্রাম্যমাণ ও স্মৃতিচারী — মান্নান সৈয়দ সেখানে সমকালীন জীবনবিহারী। একাব্যের সমালোচনায় কবি হুমায়ূন কবির বলেন, "আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে (জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা) যে সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা অগ্রজ

---

১. কবিতা, করতলে মহাদেশ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, পৃ: ১৩
২. বশীর আল হেলাল, সাম্প্রতিক কবি, সাম্প্রতিক কবিতা, পৃ: ৬০
৩. শহীদ কাদরী, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৯৮৪
৪. শওকত ওসমান, 'নতুন কবিতা', সমকাল, ১৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

কবিদেরও বিস্ময় ও কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে থাকবে।'[১] অপর এক সমালোচনায় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, "পূর্বসূরী দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতার শরীর অন্যদের থেকে এত আলাদা, তাকাবার চোখ এত নতুন ও মৌলিক, কণ্ঠস্বর এমন স্বতন্ত্র ও স্বকীয়, উপমা ও চিত্র রচনা এমন একক ও নিজস্ব চরিত্রের যে কেবল সমকালের নয়, গত কয়েক দশকের পটভূমিতেও মান্নানের কবিতা অনন্য। কারো কারো কাছে অপ্রিয় ঠেকতে পারে, কিন্তু আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে মান্নান যে জীবনানুভূতি উপহার দিয়েছেন, সংযোজন করেছেন শব্দের ভাষার এবং রূপকল্পের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তার মূল্য যাই হোক তা তার সম্পূর্ণ নিজের। মান্নানের কবিতার জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।'[২]

---

১. দৈনিক পাকিস্তান, রোববারের সাহিত্য, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭
২. কণ্ঠস্বর, জুন-আগষ্ট, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

নির্মলেন্দু গুণ (জন্ম . ১৯৪৫)

ময়মনসিংহ জেলার বারহাট্টার কাশবন গ্রামে নির্মলেন্দু গুণ জন্মগ্রহণ করেন ১৩৫২ সালের ৭ই আষাঢ়। পিতা সুখেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী।

নির্মলেন্দু গুণের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বারহাট্টা প্রাইমারী স্কুলে। বারহাট্টা সি.কে.পি. ইনস্টিটিউশন থেকে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন নেত্রকোণা কলেজ থেকে। ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত 'দি পিপল' পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত 'দৈনিক গণকণ্ঠ' এবং ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত 'দৈনিক সংবাদ'-এ কর্মরত ছিলেন সহকারী সম্পাদক হিসেবে। পুনরায় ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত 'দৈনিক সংবাদ'-এ কাজ করেন। এছাড়া 'বাংলার বাণী' এবং 'সাপ্তাহিক ঢাকা'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বেশ কিছুদিন। বর্তমানে 'বাংলাবাজার পত্রিকা'র সাহিত্য সম্পাদক।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে। এরপরে 'না প্রেমিক না বিপ্লবী' (১৯৭২), 'কবিতা অমীমাংসিত রমণী' (১৯৭৩), 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী' (১৯৭৪), 'চৈত্রের ভালোবাসা' (১৯৭৫), ও বন্ধু আমার (১৯৭৬), 'বাংলার মাটি বাংলার জল' (১৯৭৮), 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র' (১৯৭৯), 'চাষাভূষার কাব্য' (১৯৮১) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধগ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী ও আত্মজীবনী মূলক রচনাও রয়েছে। বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮২ সালে। এছাড়া হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭২), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), বঙ্গবন্ধু পদক (১৯৭৫) পেয়েছেন।

প্রেমাংশুর রক্ত চাই (১৯৭০) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে খান ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কলকাতা থেকে 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থা কাব্যগ্রন্থটির একটি সুলভ-সংস্করণ প্রকাশ করে। প্রথম মুদ্রণের ২৯টি কবিতার সঙ্গে আরো দুটি যুক্ত হয়ে মোট ৩১টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে দ্বিতীয় মুদ্রণে। একই প্রকাশনী সংস্থা থেকে বর্তমানে গ্রন্থটির অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ছয়টি কবিতা উৎসর্গ করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে। সমকালীন স্বদেশ, স্বদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতির বৈষম্য, শোষণ-শাসন, জীবনের ব্যর্থতা, পরাজয় প্রভৃতি একাব্যের উপজীব্য। বৃহত্তর গ্রামজনপদের পাশাপাশি নগর জীবনের নানা ক্লেদ, গ্লানিও মূর্ত হয়ে উঠেছে একাব্যের কোনো কোনো কবিতায়। সরাসরি স্বদেশ প্রেমের একটি কবিতাও স্থান পেয়েছে এতে। সমাজের শঠতা প্রবঞ্চনা এবং অসঙ্গতিকে প্রকাশ করতে কখনো কখনো তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আশ্রয় নিয়েছেন। নিসর্গ প্রীতির পরিচয় বিধৃত হয়েছে একাধিক কবিতায়।

এ গ্রন্থের সমালোচনায় বশীর আল হেলাল বলেন, "তাঁর কবিতায় বিভিন্ন চিত্রকল্পে ও ভাবকল্পে পরিচিত বাংলাদেশ বহুলভাবে উপস্থিত হয়। কিছু রাজনৈতিক ব্যাপারও তিনি আনেন। দেশমাতৃকার দুঃখে তিনি কাঁদেন। কখনো কখনো তাঁকে বামপন্থী বিপ্লবী বলেও মনে হয়।"[১] এ গ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর মন্তব্য, 'মানসিক বিষাদ, বিষণ্নতাবোধ ও নাগরিক যন্ত্রণা কাতরতা কিংবা কোনোরূপ অসহায় আর্তি নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় প্রধান চারিত্র্য লক্ষণ

---

১. বশীর আল হেলাল, সাম্প্রতিক কবি ও সাম্প্রতিক কবিতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে রূপ পায়নি। তাঁর অভিজ্ঞতার এলাকা বৃহত্তর গ্রামজনপদ এবং নগর এই উভয় ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত। কিন্তু নির্মলেন্দু গুণ যেমন বিশেষ অর্থে নাগরিক কবি নন, তেমনি নন গ্রামীণ কবিও। তাঁর কবিতায় গ্রাম ও নগর — উভয় এলাকা এবং জীবনের ছবিই রূপ পেয়েছে।'[১] এই গ্রন্থে গুণের প্রেমিক-সত্তাই প্রবল। প্রথমাবধি রাজনীতি উপলক্ষ হলেও নারীপ্রেমের রোমান্টিক চেতনাই শরীরীরূপ পেয়েছে অধিক। তাঁর রোমান্টিকতা সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেন, "তার রোমান্টিক নিদ্রা কাটে না বহুকাল। রিরংসাসঞ্জাত নারী ভাবনা তাঁকে গ্রাস করে রাখে আমুন্ডু। এবং যদিও একটি চোখ তাঁর জেগে থাকে ঐ ঘুমের ভেতরেও, যে চোখের ভেতর' শুধু উপলব্ধি আছে এক পরিবর্তনশীল অসহায় অস্থির মাতৃভূমির তবু আরেকটি চোখ রাজ্য ও রাজনীতি থেকে যোজনদূর কোনো এক আসঙ্গনিবিড় নির্ঘুমতার মধ্যে ঘুম যায়।"[২]

---

১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পঁচিশ বছরের কবিতা, উত্তরাধিকার, ১৯৭৪, পৃ.২৩৪

২. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, বাংলাদেশের কবিতা, অন্তরঙ্গ অবলোকন, পৃ. ১২৩

সারণী

	কবির নাম	পিতার নাম ও পেশা	কবির জন্মস্থান ও জন্মসাল	শিক্ষা ও পেশা	আলোচ্য সময়ে গ্রন্থ সংখ্যা
১	আহসান হাবীব	হ্যামজউদ্দীন হাওলাদার গৃহস্থ, কবিরাজ	শঙ্কর পাশা, বরিশাল ১৯১৭	ম্যাট্রিক, সাংবাদিকতা	৩
২	ফররুখ আহমদ	সৈয়দ হাতেম আলী	মাঝআইল, যশোর ১৯১৮	আই. এ সরকারী চাকুরী	৭
৩	সিকান্দার আবু জাফর	মঈনউদ্দীন হাশেমী গৃহস্থ	তেঁতুলিয়া, সাতক্ষীরা ১৯১৯	আই, এ সাংবাদিকতা	৪
৪	আবুল হোসেন	এস. এম. ইসমাইল হোসেন পুলিশ কর্মকর্তা	দেয়াড়গ্রাম, খুলনা ১৯২২	এম, এ সরকারী কর্মকর্তা	২
৫	সৈয়দ আলী আহসান	সৈয়দ আলী হামেদ	আলেকাদিয়া, যশোর ১৯২২	এম, এ অধ্যাপনা	৪
৬	সানাউল হক	খান বাহাদুর শহুদুল হক ওকালতি	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা ১৯২৪	এম, এ সরকারী কর্মকর্তা	৪
৭	আবদুল গান হাজারী	ইজ্জত আলী হাজারী জমিদারী	নয়াগ্রাম, পাবনা ১৯২৬	বি. এ সাংবাদিকতা	৩
৮	আশরাফ সিদ্দিকী	ডাঃ আব্দুস সাত্তার সিদ্দিকী হোমিওপ্যাথ, ডাক্তার	নাগবাড়ী, টাঙ্গাইল ১৯২৭	এম. এ অধ্যাপনা	৪
৯	আতাউর রহমান	মোঃ আলাউদ্দীন সরদার	আক্কেলপুর, বগুড়া ১৯২৭	এম. এ অধ্যাপনা	২
১০	আবদুর রশীদ খান	মৌঃ ওয়াজেদউদ্দিন খান	জাফরাবাদ, চাঁদপুর ১৯২৭	এম. এ সরকারী চাকুরী	৪
১১	আবদুস সাত্তার	মৌঃ আব্দুস সোবহান গৃহস্থ	গোলরা, টাঙ্গাইল ১৯২৭	বি. এ সরকারী চাকুরী	৩
১২	শামসুর রাহমান	মোখলেসুর রহমান ব্যবসা	মাহুতটুলী, ঢাকা ১৯২৯	বি. এ সাংবাদিকতা	৫
১৩	আজীজুল হক	জবেদ আলী পুলিশ ইন্সপেক্টর	তারাউজল, যশোর ১৯৩০	এম. এ অধ্যাপনা	১

Dhaka University Institutional Repository

	কবির নাম	পিতার নাম ও পেশা	কবির জন্মস্থান ও জন্মসাল	শিক্ষা ও পেশা	আলোচ্য সময়ে গ্রন্থ সংখ্যা
১৪	হাসান হাফিজুর রহমান	আবদুর রহমান চাকুরী	জামালপুর ১৯৩২	এম. এ সাংবাদিকতা	৩
১৫	আলাউদ্দিন আল আজাদ	গাজী আবদুস সোবহান গৃহস্থ	রামনগর, ঢাকা ১৯৩২	এম. এ অধ্যাপনা	৩
১৬	জাহানারা আরজু	আফিল উদ্দিন আহমদ চৌঃ চাকুরী	জাবরা, মানিকগঞ্জ ১৯৩২	এম. এ গৃহবধূ	২
১৭	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	আব্দুল জব্বার খান বিচারপতি	গাজামহল্লা, বারশাল ১৯৩৪	এম. এ সরকারী কর্মকর্তা	২
১৮	আবু বকর সিদ্দিক	মাতয়ার রহমান পাটোয়ারী সরকারী চাকুরী	গোটপাড়া, বাগেরহাট ১৯৩৪	এম. এ অধ্যাপনা	১
১৯	সৈয়দ শামসুল হক	ডাঃ সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন ডাক্তারী, হোমিওপ্যাথি	কুড়গ্রাম, রংপুর ১৯৩৫	আই. এ সাংবাদিকতা	৩
২০	আল মাহমুদ	আব্দুর রব মীর ব্যবসায়ী	মোড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৯৩৬	মাধ্যমিক পর্যায় সাংবাদিকতা	২
২১	জিয়া হায়দার	মোঃ হাকিমউদ্দিন ব্যবসায়ী	দোহার পাড়া, পাবনা ১৯৩৬	এম. এ অধ্যাপনা	২
২২	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ	আব্দুল আওয়াল মেম্বার, ইউনিয়ন পরিষদ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ১৯৩৬	এম. এ সাংবাদিকতা	৩
২৩	ফজল শাহাবুদ্দিন	কাজী তাজমউদ্দিন আহমেদ	ঢাকা ১৯৩৬	বি. এ ব্যবসা ও সাংবাদিকতা	২
২৪	মোহাম্মদ মানরুজ্জামান	মোঃ শাহাদাত আলী শিক্ষকতা	খড়কী, যশোর ১৯৩৬	এম. এ অধ্যাপনা	৩
২৫	দিলওয়ার	মোঃ হাসান খান গৃহস্থ	ভাথখোলা, সিলেট ১৯৩৭	আই. এ শিক্ষকতা/সাংবদিকতা	৩
২৬	ওমর আলী	ভাজির আলী	পাবনা ১৯৩৮	এম. এ অধ্যাপনা	৩
২৭	শহীদ কাদরী	খালেদ ইবনে আহমাদ কাদরী, সাংবাদিকতা	ঢাকা ১৯৪২	'ও' লেভেল চাকুরী	১

Dhaka University Institutional Repository

	কবির নাম	পিতার নাম ও পেশা	কবির জন্মস্থান ও জন্মসাল	শিক্ষা ও পেশা	আলোচ্য সময়ে গ্রন্থ সংখ্যা
২৮	আবদুল মান্নান সৈয়দ	সৈয়দ এ. এম বদরুদ্দোজা সরকারী চাকুরী	চব্বিশ পরগণা, পাশ্চিমবঙ্গ ১৯৪৩	স্নাতক সম্মান. এম.এ অধ্যাপনা	৩
২৯	নির্মলেন্দু গুণ	সুখেন্দু প্রকাশ গুণ চৌঃ	বারহাট্টা, ময়মনাসংহ ১৯৪৫	বি. এ সাংবাদিকতা	১

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রতিফলন এবং স্বরূপ অন্বেষণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৪৮ সালে সেই আন্দোলন সুতীব্র রূপ ধারণ করেছিল। তখন আন্দোলনের আঘাতে পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা পশ্চাদপসরণ করে ওয়াদা দিয়েছিল যে তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করবে কিন্তু পরে মুসলিম লীগ সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করে। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজের ভেতর বিভিন্ন ভাবে ভাষার আন্দোলন চলতে থাকে।

১৯৪৮ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব যখন আবার ঘোষণা করেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে তখন থেকেই নতুন পর্যায়ে ভাষার আন্দোলন শুরু হয় এবং ৩০শে জানুয়ারি ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা নগরীতে ছাত্রদের ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, ৩১শে জানুয়ারি গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। পরিষদ ভাষার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে সাধারণ হরতালের আহ্বান জানায়।

মুসলিম লীগ সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিল কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারের ১৪৪ ধারা তুচ্ছ করে পুলিশের উদ্যত রাইফেল ও গুলিবর্ষণের সামনে ঢাকায় ছাত্র-সমাজের মৃত্যু-ভয়হীন অভিযান ও পুলিশের গুলিতে ঢাকার রফিকুদ্দিন, বরকত প্রমুখ বীর তরুণের শাহাদাৎ বরণ আন্দোলনকে নতুন এক স্তরে উন্নীত করে। ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ঢাকা নগরী ও সারা পূর্ববঙ্গের সমস্ত নরনারীর ভিতর এক বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চার করেছিল। ২২শে, ২৩শে ফেব্রুয়ারি মিলিটারির বন্দুক ও সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ঢাকা নগরীতে হাজার হাজার জনতার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা নগরীতে সরকারী অফিস ও রেডিও স্টেশন থেকে শুরু করে যানবাহনে হাটবাজারে একটা সাধারণ হরতালের আঘাতে সরকারের বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। শ্রমিকশ্রেণী এ লড়াইয়ে শরিক হয় এবং ২১ তারিখ চট্টগ্রামে, ২৩শে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ রেল-শ্রমিকগণ এবং ২৫ তারিখ নারায়ণগঞ্জে সমস্ত মিল এলাকায় শ্রমিকগণ হরতাল করে। ২৯শে ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জে পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলেন, ২২শে থেকে শুরু করে ২৬শে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলাতেই শহরে-শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রার ঢেউ খেলে যায়।

এই বিরাট গণসংগ্রামকে দমন করবার জন্য সরকার বীভৎস দমননীতির সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ সৃষ্টি করতে এবং আন্দোলনকে উর্দু বিরোধী খাতে প্রবাহিত করতে অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু জনগণ নিজেদের সুস্থ চেতনা দ্বারাই করেছিল এবং উর্দুভাষী জনগণের প্রগতিশীল অংশ এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিল।

"বস্তুত, এবারকার ভাষা-আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের শ্রমিক-কৃষক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ধনিক পর্যন্ত নূরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং পূর্ববঙ্গে এক গৌরবময় জাতীয় সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এবার আন্দোলনে একটানা যেমন চারদিন হরতাল চলেছিল

Dhaka University Institutional Repository

এবং যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেইরূপ ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম পূর্ববঙ্গে আর কোনদিন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই ব্যাপক গণসংগ্রাম পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।[১]

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙালী জাতির ভাবধারার যে উন্মেষ ঘটেছিলো পরবর্তী সমস্ত আন্দোলনে তা প্রেরণা, উৎসাহ-উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করেছে; আশা ও আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছে, ভবিষ্যৎ পথ-নির্দেশ করেছে। প্রতিবছর শহীদ দিবস পালনের ভেতর দিয়ে শহীদদের যে আত্মদান এবং আত্মত্যাগ বাঙালী জাতিকে প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের ধারণা দিয়েছে — পরবর্তীকালের যেকোন ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। ভাষা-আন্দোলনের বহুমুখী তাৎপর্য সম্পর্কে ১৯৬৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'দৈনিক সংবাদের' সম্পাদকীয়তে বলা হয় —

"একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ব্যাপ্তি বা তাৎপর্য কেবল ভাষার দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। একুশে ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিক চেতনার মহা উদ্বোধনের দিন; জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার নবরূপায়ণের শপথের লগ্ন। একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষার দাবী আজ বৃহত্তর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী, জাতিসত্তা, বিশেষত, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা-ভাষাভাষী জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন. জনগণের মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন গণদাবীর অগ্রসর চেতনার স্বাক্ষর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ভাষা-আন্দোলনকে যেভাবে বৈদেশিক হস্তের কারসাজি বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, অনুরূপভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকেও ঢালাওভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত করিতেছে। অপরদিকে দেশবাসীর কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার নাই, এমনকি ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে যতটুকু লোকদেখানো গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল ১৯৬৫ সাল হইতে জরুরী অবস্থার অজুহাতে উহাও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির নামে জনসাধারণের ভোটের অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত শত নেতা ও কর্মী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বিনা বিচারে কারাগারে আটক রহিয়াছেন। এই অচলাবস্থার বৃত্ত ভাঙ্গিয়া জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রাম তথা স্বায়ত্তশাসন, প্রত্যক্ষ-নির্বাচন, বন্দীমুক্তি, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রভৃতি দাবীকে অগ্রসর করিয়া নেওয়ার আহ্বান লইয়াই আসিয়াছে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারি।[২]

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে ফিরে এসেছে বাঙালী জনমানসের কাছে। কেননা, বাঙালীর জনজীবনে ২১শে ফেব্রুয়ারি শুধু কর্মসূচীভিত্তিক আন্দোলনের দিন নয়, আত্মসাক্ষাৎকারের দিন, আত্মবিশ্বাসের দিন। বলা যায় ২১শে ফেব্রুয়ারি সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শুভ সূচনার দিন, জনশক্তির বিজয়যাত্রার দিন। এ সম্পর্কে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় —

"আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। আজ সতের বছর পর তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়ের দিনটিকে আবার আমরা নতুন করিয়া স্মরণ করিতেছি। কিন্তু প্রতিবছর যে প্রবচন ও প্রতিজ্ঞা লইয়া দেশবাসী অমর

---

১. বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল, পৃঃ ৩৪২
২. দৈনিক সংবাদ, একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা; সম্পাদকীয়, ১৯৬৮ সাল

Dhaka University Institutional Repository

একুশে উদযাপন করিয়া থাকে, এবারের একুশে ফেব্রুয়ারির উৎসব চরিত্র ও চেহারায় তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এবার সত্যই রক্ত ফাল্গুনের পতাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি আবার তার মৃত্যুহীন প্রাণের স্বাক্ষর রাখিয়াছে। ১৯৫২ ও ১৯৬৯ সাল। বায়ান্ন সালে ছাত্র-জনতা আত্মদান করিয়াছে ভাষার জন্য। '৬৯ সালে তাহারা আত্মবলিদান করিয়াছে সামগ্রিক অধিকারের জন্যে। ভাষা-আন্দোলনের স্বাদেশিকতাই আজ গণতান্ত্রিক অধিকার-আন্দোলনের পরিধিতে আরো ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। বরকত, সালাম, জব্বার, রফিকের নামের পাশে যুক্ত হইয়া গিয়াছে আসাদ, আবুল প্রমুখ কত জানা-অজানা চেনা-অচেনা শহীদের নাম। ফেব্রুয়ারির পতাকায় শুধু আন্দোলনের কিংবা আত্মদানের প্রতিজ্ঞা নয় — তার বিজয় ঘোষণাও সোচ্চার। এই বিজয় স্বাদেশিকতার, এই বিজয় গণতান্ত্রিকতার, এই বিজয় মুক্ত ও প্রবুদ্ধ মানসিকতার। একুশে ফেব্রুয়ারির এই সংগ্রামী উত্তরাধিকারকেই আজ আমরা আবার নতুন করিয়া স্মরণ ও বরণ করিয়া লইতেছি।[১]

ভাষা -আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্যে বিভিন্ন সময়ে সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র আঁটা হয়েছে — কিন্তু কোনটাই শেষপর্যন্ত সার্থক হতে পারেনি। তবু অব্যাহতভাবে সেই প্রচেষ্টা চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গে সরকারী পর্যায়ে প্রথমেই ভাষার ওপর আঘাত আসে তিনটি দিক থেকে —

প্রথমত, নির্বিচারে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ঢুকিয়ে বাংলা ভাষার মুসলমানী রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। এই চেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তৎকালীন রেনেসাঁ সোসাইটি। এই সোসাইটির লক্ষ্য ছিল, "জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ, পাকিস্তানবাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক আলোচনার ব্যবস্থা, সাহিত্যে পাকিস্তানবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে প্রতিহত করা।[২] এই লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের পূর্ব থেকেই রেনেসাঁ সোসাইটি বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী-উর্দু অর্থাৎ তথাকথিত মুসলমানী শব্দ অকাতরে ব্যবহার করার সুপারিশ করে। এই পরিকল্পনাটি পূর্ববাংলা সরকারের মনঃপুত হয় এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার এক উৎকট রূপ নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয় যে, জন্মের পর থেকে বাংলাভাষার গতি কখনো একমুখী থাকেনি, বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক পরিবর্তন একে প্রভাবিত করেছে। মধ্যযুগের ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকেরা এর মুসলমানী রূপ দিয়েছিল, আধুনিক যুগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা দিয়েছিলেন সংস্কৃত-ঘেঁষা রূপ। রেনেসাঁ সোসাইটি এর 'পাকিস্তানী' রূপ দিতে উৎসুক। মুখপাত্রগণ নতুন ভাষাতেই তাঁদের বক্তব্য হাজির করেছিলেন :

"গোজাশ্‌তা এশায়াতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোকতাসার ভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে, শৈশবে বাংলা ভাষা মুসলমান বাদশাহ ও আমীর ওমরাহদের নেকনজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারের শান-শওকত হাসিল করেছিল। .... সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহজীব তমদ্দুনের তায়াল্লুক বর্জিত বাংলাভাষা মাশরেকি পাকিস্তানের মাতৃভাষা নয়, এবং হবে না, হতে পারে না। একথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামী।[৩]

---

১. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সম্পাদকীয় পৃ. ৪- ১৯৬৯

২. পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির কার্যবিবরণী, পৃষ্ঠা ২৮

৩. মাহে নও, অক্টোবর ১৯৪৯ পৃ. ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

রেডিও পাকিস্তানের বাংলা সংবাদ-প্রচারে এবং স্কুল পাঠ্য কবিতা-গল্পে এই ভাষার ব্যবহার শুরু হয়।[১]

দ্বিতীয়ত, আরবী হরফের প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয় দেশবিভাগের পর থেকে। কেন্দ্রের বাঙালী শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (১৯০৫-৫৬) ছিলেন এর উদ্যোক্তা। যুক্তি দেয়া হতো যে, এর ফলে পূর্ব-পশ্চিমের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য সহজতর হবে, পূর্ববঙ্গে আরবী হরফ পরিচিত বলে বয়স্কদের সহজে সাক্ষর করে তোলা যাবে, মুদ্রণ, টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডের কাজ সহজ হবে।[২]

পরবর্তী পর্যায়ে আরবীতে বাংলা শিক্ষা দেবার চেষ্টা হয়। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়, ছাত্রদের বিনামূল্যে আরবী হরফের বাংলা বই দেয়া হয়। ১৯৫০ সালে এ ধরনের শিক্ষা কেন্দ্র ছিল ২০টি।

এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয় প্রবল জনমত। 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র ভাষা কমিটি ঐ প্রচেষ্টাকে পূর্ববাংলার শিক্ষিত সমাজকে অশিক্ষিত বানাবার জন্যে সরকারের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে। প্রতিবাদ করে তমদ্দুন মজলিশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। লিপির শেষাংশে বলা হয় : আঞ্চলিক প্রভুত্ব লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা এমনভাবে পাকিস্তানের শত্রুতা করিতে যাইতেছে। পাকবাংলার মনে নূতন পরাধীনতার আশঙ্কাকে কায়েম করিয়া তুলিতেছে।[৩]

এই বিক্ষোভের মুখে প্রাদেশিক সরকার ঘোষণা করে যে, বাংলাভাষার হরফ কি হবে তা এ প্রদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে; কিন্তু এরপরেও তৎপরতা অব্যাহত থাকে এবং নতুন পথে শুরু হয় চক্রান্ত।

তৃতীয়ত, ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সরকার বাংলাভাষা সংস্কারের জন্যে একটি ভাষা কমিটি স্থাপন করে। এই কমিটির লক্ষ্য ছিল, উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করে জাতীয় জীবন থেকে বাংলাকে সরিয়ে দেয়া। কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও সেক্রেটারী ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪) কমিটির প্রতি নির্দেশ ছিল তিনটি :

ক) পূর্ববাংলার জনগণের ভাষা (বাংলা ব্যাকরণ, বানান প্রভৃতি সহ) সহজীকরণ, সংস্কার ও প্রমিতকরণের প্রশ্ন বিবেচনা করে সে বিষয়ে সুপারিশ করা;

খ) যে সমস্ত বিদেশী শব্দ ও টেকনিক্যাল শব্দের পরিভাষা এই ভাষায় নেই সেগুলোর জন্য নতুন শব্দ ও বাক্যাংশ গঠন করা এবং সেগুলোর জন্যে যতদূর সম্ভব অনুবাদ করার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া;

গ) এই ভাষাকে বিশেষভাবে পূর্ববাংলার এবং সাধারণভাবে পাকিস্তানের জনগণের প্রতিভা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্যে অন্যান্য যা কিছু প্রয়োজনীয় মনে করেন সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়া।[৪]

---

১. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ববাঙলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, পৃ. ৩০
২. বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৪৪
৩. বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ; ১৯৭০, ঢাকা।
৪. Report of the East Bengal Language Committee, ১৯৪৯, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

বছর দেড়েক আলাপ-আলোচনার পর কমিটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে ও সরকারের কাছে তা দাখিল করে ১৯৫০ সালের ৭ই ডিসেম্বর। কমিটির উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যতম সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনের (১৮৯৭-১৯৭৮) আত্মচরিতে।

রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার গুরুতর সংস্কারের পরামর্শ দেয়া হয়। প্রস্তাবিত ভাষায় নতুন রূপের নামকরণ হয় 'সহজ বাংলা'। বলা হয়, স্বাভাবিক গতিতেই এর বিকাশ হবে, তবে যাতে সাধারণভাবে পাকিস্তানের বিশেষভাবে পূর্ববাংলার জনগণের 'প্রতিভা ও সংস্কৃতির' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তেমন উপাদানসমূহ পরিত্যক্ত হয়ে ক্রমশঃ সঙ্গতিপূর্ণ উপাদানসমূহ যুক্ত হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। পুথি সাহিত্য ও জনজীবনে প্রচলিত সাহিত্যের উপাদানসমূহ প্রাধান্য পাবে, আর মুসলমান সাহিত্যিকেরা ব্যবহার করবেন ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রকাশভঙ্গী।[১] (আমি জন্ম-জন্মান্তরেও তোমাকে ভুলিব না, না লিখে তাঁরা লিখবেন, আমি কেয়ামত তক তোমাকে ভুলিব না) বাংলা বর্ণমালা থেকে ঈ, ঊ, ঋ, ৯, ঐ ঔ, ঙ, ঞ, ণ, য, ষ, স, ঢ়, ক্ষ, ৎ, ঃ বাদ যাবে, যুক্ত হবে নতুন স্বরবর্ণ অ্যা; বর্ণ সংযুক্তকরণের ও ফলা ব্যবহারের রীতিও পরিত্যক্ত হবে।

কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রশ্নকে অন্তত বিশ বছরের জন্যে স্থগিত রাখার উপদেশ দেয় এবং এই সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষাকেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহবান জানায়। এই অভিমত সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না বিধায় রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা হয়।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চিন্তা শুরু হয়েছিল দেশবিভাগের পূর্বেই। ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে হায়দারাবাদে ঘোষণা দেন। ঐ সময় এর কোন প্রতিবাদ হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যায় যে, পাকিস্তান সরকারেরও লক্ষ্য তাই। ফলে প্রতিবাদ শুরু হয় বিভিন্ন তরফ থেকে। গণতান্ত্রিক যুবলীগ ১৯৪৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তাদের সম্মেলনে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা' করার দাবী জানায়।[২] ১৫ই সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকায় বাংলাকে পূর্ব বাংলার শিক্ষার বাহন ও আইন আদালত-অফিসাদির ভাষা করার এবং উর্দুকে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা ও ইংরেজীকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে শিক্ষা দিবার দাবি করে।[৩] ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-৮১) একটি প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, উর্দু প্রচলিত হলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক রাষ্ট্রিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংস ঘনিয়ে আসবে এবং সর্ব বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হবে উত্তর ভারতীয় পশ্চিম-পাকিস্তানী উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের যন্ত্র।[৪] এতোসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও ৫ই ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার আবরণে উর্দুকে রাষ্টভাষা করার সুপারিশ করা হয়।[৫] এই সংবাদ পেয়ে ঢাকার ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভা করে এবং প্রস্তাব নেয় —

ক. বাংলাকে পাকিস্তান ডমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক;

---

১. Report of the East Bengal Language Com. PP. 6-7
২. ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, পৃঃ ১১
৩. ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৪-১৭
৪. মাসিক কৃষ্টি, ১৯৪৭
৫. বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০, পৃঃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

খ. রাষ্ট্রভাষা ও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।[১]

এভাবে ছাত্রদের আন্দোলন আরম্ভ হলে বিভিন্ন স্তরের লোকজনও এতে যোগ দেয় এবং ভাষা সংগ্রাম রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত হয়। আন্দোলন চালিয়ে নেবার জন্য তমদ্দুন মজলিশ "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করে। ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি পরিষদের সঙ্গে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান মনিঅর্ডার ফরম, ডাকটিকেট ও মুদ্রায় ইংরেজী-উর্দুর পাশাপাশি বাংলা লেখার আশ্বাস দেন।[২]

পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা করার সুপারিশ করেন কিন্তু মুসলীম লীগ সদস্যদের বিরোধিতায় তা বাতিল হয়ে যায়।[৩] এই সংবাদে ঢাকার ছাত্র-রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও যুবসংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। পরিষদের আহ্বানে ১১ই মার্চ সারা প্রদেশে সাফল্যজনকভাবে হরতাল পালিত হয়। সরকারও বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘটিদের ওপর নির্যাতন চালায়। নির্যাতনে ১২৮ জন আহত হয় বলে পরিষদ দাবি করে।[৪] এই ঘটনায় সরকার-বিরোধী মনোভাব আরো বৃদ্ধি পায় এবং অনন্যোপায় হয়ে খাজা নাজিমুদ্দিন পরিষদের সঙ্গে আট দফার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে দমননীতি প্রত্যাহার, ১৪৪ ধারা তুলে নেয়া, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করা এবং সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে চুক্তি হয় :

ক. "১৯৪৮-এর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যেদিন নির্ধারিত হইয়াছে সেদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্টভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদেও কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উথাপন করা হইবে।"

খ. "এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উথাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারীভাষা হিসেবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থানে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।[৫]

চুক্তিতে সাধারণ ছাত্ররা খুশী হয়নি, ফলে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ঐ সময়ে ১৯-এ মার্চ বড়লাট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসেন। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন এবং আন্দোলনকারীদের চিহ্নিত করেন ভারতের চর, কম্যুনিষ্ট ও রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে।

---

১. ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, পৃ. ২১
২. ভাষা আন্দোলন, পৃ. ৪২
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫২
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্টভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনায় অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করলে চরম বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। তবু, তাঁর এই মনোভাবে আন্দোলনে ভাটা পড়ে।[১]

এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বসে। খাজা নাজিমুদ্দিন সেখানে ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব আনেন। তুমুল বিতর্কের পর কিছু সংশোধনীসহ সেটা গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবটি ছিল পূর্বোক্ত চুক্তির প্রায় অনুরূপ।[২] এভাবে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে ঢাকায় আসেন। সেদিন পল্টন ময়দানের জনসভায় উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার প্রতিবাদে ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালন করা হয়। এবং 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'কে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদে' পুনর্গঠিত করা হয়। পরিষদের আহ্বানে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে বাজেট অধিবেশনের দিন, ২১-এ ফেব্রুয়ারি, দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৩] ধর্মঘটের দিন পুলিশের গুলিতে আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন ঘটনাস্থলে শহীদ হন এবং আরো ১৭ জনের মত গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁদের মধ্যে রাত আটটায় আবুল বরকত শাহাদাৎ বরণ করেন।[৪]

২২শে ফেব্রুয়ারি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকা শহরে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। গ্রাম থেকেও দলে দলে লোক এসে বিক্ষোভে অংশ নেয়। সকালবেলা 'মর্নিং নিউজ' অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়, দুপুরে মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসে গায়েবী জানাজা হয় এবং লক্ষাধিক লোকের মিছিল বের হয়। মিছিলে লাঠি চার্জ ও গুলিবর্ষণ করলে হাইকোর্টের কেরানী সফিউর রহমান শহীদ হন ও অনেকে আহত হন। শহরের অবস্থা থমথমে হয়ে ওঠে এবং যেকোনো মুহূর্তে সরকার পতনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। গত্যন্তর না দেখে সরকার সেনাবাহিনী ডাকে এবং সান্ধ্য আইন জারি করে। সেদিন ৫ জন শহীদ, ১২৫ জন আহত ও ৩০ জন বন্দী হন বলে খবরের কাগজে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন সরকারী নীতির প্রতিবাদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দল থেকে পদত্যাগ করেন। ২৩ তারিখ থেকে প্রচন্ড দমননীতি শুরু হয়। ২৪ তারিখে ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয় এবং পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ করে দেয়া হয়। কর্ম পরিষদ আন্দোলন চালিয়ে নিতে চেষ্টা করলেও তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ৮ই মার্চ এক বাড়ি থেকে আত্মগোপনকারী ৯ জন নেতার ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ।[৫] সাময়িকভাবে ভাষা-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

১. ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, পৃ. ১০৪-১২৬
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
৩. কবির উদ্দিন আহমদ, একুশে ফেব্রুয়ারি, পুথিপত্র ১৯৫৩, পৃ. ২২১-২৩
৪. পূবোক্ত, পৃ. ২২৫-২৬
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭-২৮, ২৩০-২৩২

Dhaka University Institutional Repository

রোমান হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্যের পরে সরকার রোমান হরফ প্রবর্তন ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়। বলা বাহুল্য, সরকারের এই উদ্যোগ বাংলা ভাষার ওপর দমননীতির নয়া কলা-কৌশল মাত্র। একটি মাত্র ভাষা সৃষ্টি করে দেশের সংহতি মজবুত করার জন্যে সামরিক সরকার প্রথম থেকেই চেষ্টা চালায়। পরিকল্পনা ছিল বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে একটি ভাষা তৈরি করা ও সংশোধিত রোমান হরফে লেখা। মন্ত্রিসভার বৈঠকে, সাংবাদিক সম্মেলনে, সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনায় আইয়ুব খান সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেন।[১] এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়ছিল যে, দেশবাসীর পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সমগ্র দেশের লোক বুঝতে পারে সে-ধরনের একটি ভাষার স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই বিকাশ সাধনই সরকারের লক্ষ্য।[২] আইয়ুব খান তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন :

এটা আমার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার যে, দু'টি জাতীয় ভাষা নিয়ে আমরা এক জাতি, রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবো না; আমরা বহুজাতি-রাষ্ট্র হিসেবে থেকে যাব। আমি এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিচ্ছি না, আমি একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরছি যা স্বীকার করতেই হবে। .... এটাও সমানভাবে সত্য যে যদি জনগণ — তা পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই থাকুক না কেন — নিজেদের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে চায় তবে তাদের অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়যোগ্য একটি মাধ্যম থাকতে হবে। এ ধরনের মাধ্যম উদ্ভব করতে হলে আমাদেরকে বাংলা ও উর্দুর সাধারণ উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলিকে একটি সাধারণ লিপির মাধ্যমে বিকশিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।[৩]

প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে 'শিক্ষা কমিশন' ও বাংলা একাডেমী চেষ্টা চালায়। কমিশনের প্রস্তাব ছিলো দু'টি :

প্রথমত, যে-সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নশ্‌ক বা রোমান হরফের উদ্ভাবন ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের আর্থিক আনুকূল্য করা;

দ্বিতীয়ত, মুদ্রণযোগ্য আদর্শ উর্দু বর্ণমালা নির্ণয় করা বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করা এবং বাংলা ও উর্দুর উপযোগী রোমান হরফের উদ্ভাবনের জন্য ভাষাবিদদের পরামর্শ দেয়া। কমিশন বলে যে, এই সমস্ত প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে 'সিদ্ধান্ত' নেয়ার সময় আসবে।[৪]

অপরদিকে বাংলা একাডেমীর প্রস্তাব ছিল পূর্ববাংলার স্কুলে উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুলে বাংলা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং উর্দু ও বাংলার সাধারণ শব্দগুলো খুঁজে বের করে জনপ্রিয় করা। তৃতীয়ত, সূত্রটির ব্যাখ্যা তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান এভাবে করেছেন যে, বাংলা ভাষার আরবী, ফারসী, উর্দু ও তুর্কী শব্দের একটি অভিধান তৈরি করলে দুই রাষ্ট্র ভাষার ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।[৫] সেমিনারের উদ্বোধন করেছিলেন প্রাদেশিক গভর্ণর আজম খান। তিনি দুই

---

১. ইত্তেফাক, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৬০
২. দৈনিক আজাদ, ২রা মার্চ ১৯৬০
৩ আইয়ুব খান, প্রভু নয় বন্ধু, পৃ. ১০২
৪. জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, ১৯৫৯ : ৩৭৩
৫. সৈয়দ আলী আহসান ১৯৬৪, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রদেশের ভাষাগত বিভেদ ও অনৈক্যের ব্যাপারে একটি কার্যকর সমাধানে উপনীত হতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন দু'টি ভাষারই ইসলামিক উৎপত্তি রয়েছে বিধায় আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হলে এ-ব্যাপারে সমাধানে পৌঁছুতে বিলম্ব হবে না।[১]

সে বছরই বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্যে বাংলা একাডেমী একটি কমিটি স্থাপন করে। সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন কমিটির সভাপতি। কমিটি বর্ণমালা থেকে ঙ, ণ, ঋ, ঌ, ৎ, ঞ, ঃ, ষ, ঈ, ী, ঊ, ূ বর্জন করা সহ অনেক সুদূর-প্রসারী সুপারিশ করে।[২]

গভর্ণর আবদুল মোনায়েম খান একাডেমীর প্রয়াসকে স্বাগত জানান এবং এবিষয়ে একটি 'মীমাংসায়' উপনীত হতে সবাইকে অনুরোধ করেন।

এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ উত্থিত হয়। শিক্ষা কমিশনে রোমান হরফ সম্পর্কে মতামত দেবার নির্দেশের প্রেক্ষাপটে 'দৈনিক ইত্তেফাক' 'হরফ পরিবর্তন প্রসঙ্গে' শীর্ষক পরপর দু'দিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রতিবাদ করে।[৩] মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকাও প্রতিবাদ জানায়।[৪] ১৯৫৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে বিভিন্ন ছাত্র সংসদের সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রোমান হরফের প্রস্তাবটি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়।[৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আয়োজিত আরো একটি সভায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেয়া হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিরোধিতা করেন।[৬] ১৯৬০ সালের শহীদ দিবস ও ১৯৬২-র ছাত্র-আন্দোলনে ছাত্রদের অন্যতম বক্তব্য ছিল রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে।

রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতার পাশাপাশি ভাষা-সংস্কার প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করা হয়। কখনো এককভাবে, কখনো সমষ্টিগতভাবে।

---

১. সৈয়দ আলী আহসান ১৯৬৪, পৃঃ ৮-৯
২. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০, পৃঃ ১১৪-১১৬
৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ ও ২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯
৪. মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১ ৩ ৬ ৫ পৃঃ ৫০১
৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ শে মার্চ ১৯৫৯
৬. মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১ ৩ ৬ ৫ পৃঃ ৫০১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাভাষা সংস্কার ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ

বাংলাভাষা সংস্কার ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির নামে বাংলা ভাষার ওপর সরকারী আক্রমণ অব্যাহত থাকে। বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাংলাভাষা সংস্কার প্রচেষ্টার যে প্রস্তাবসমূহ ছিলো তা কার্যকর করার ক্ষমতা একাডেমীর ছিলো না। সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে একাডেমীর প্রস্তাবসমূহ পাশ করিয়ে তার বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-পর্ষদের সদস্য ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর আনীত একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই উদ্যোগ শুরু হয়। বাংলা ভাষা, লিপি ও বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে এবং অধিভুক্ত কলেজসমূহকে সংস্কৃত বাংলা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবার জন্য তিনি প্রস্তাব আনেন।[১] প্রস্তাব মোতাবেক ভাষা সংস্কারের জন্য একটি উপসংঘ গঠিত হয় ১৯৬৭ সালের ২৮-এ মার্চ। বাংলা একাডেমীর মত যেসব প্রতিষ্ঠান ভাষা-সংস্কারের জন্য চেষ্টা করছে তাদের কার্যকলাপ বিবেচনা করার জন্যেও উপসংঘকে নির্দেশ দেয়া হয়। উপসংঘের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. কাজী দীন মুহম্মদ (জঃ ১৯২৭)।

উপসংঘ সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে। এর শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সে বৈঠকে একটি সুপারিশ গৃহীত হয়। তিনজন সদস্য ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন লিখিতভাবে। তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে, বাংলা ভাষা সংস্কারের আশু প্রয়োজন নেই; একাজে হাত দিলে ভ্রান্তি নিশ্চিতরূপে বিভ্রান্তিতে পরিণত হবে এবং পূর্ব বাংলায় ভাষার দ্রুত উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। তবু গৃহীত সুপারিশসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপর্ষদে পেশ করা হয়। অধ্যক্ষ কবীর চৌধুরীসহ অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই সর্বাত্মক বিরোধিতা করলেও সেগুলো গৃহীত হয়। সুপারিশগুলো বাংলা একাডেমীর প্রস্তাবের অনুরূপ শুধু 'ক্ষ'এর বদলে 'খ্যঁ' গ্রহণের পরামর্শ সেখানে ছিল। সে বৈঠকেই প্রস্তাবের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাপর্ষদ একটি উপসংঘ গঠন করে।[২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তৎপরতার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে আলোড়ন সৃষ্টি হয় সাংস্কৃতিক মহলে। বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান। বাংলা ভাষা অবৈজ্ঞানিক, মুদ্রণযন্ত্রে এর ব্যবহারের অসুবিধা অনেক সুতরাং দ্রুত শিক্ষা বিস্তার ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের জন্যে এর সংস্কার আশু জরুরী মোটামুটিভাবে এই ছিলো এই দলের মত। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, ইবরাহিম খাঁ, আবুল কাসেম, তালিম হোসেন, মীর ফখরুজ্জামান প্রমুখ ৫৮ জন প্রথম এর সমর্থনে এগিয়ে আসেন।[৩] ঢাকার বাংলা কলেজের অধ্যাপকসহ ২৫ জন একটি বিবৃতি দেন, 'ভাষাকে আমরা জনগণের শিক্ষার উপযোগী সহজ সুন্দর ভাষা রূপে দেখতে চাই' শিরোনামে।[৪] এ ছাড়া এর সমর্থনে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে।

সংস্কার প্রস্তাবের অসমর্থনে কোনো সংগঠন এগিয়ে আসেনি, কিন্তু বিরোধিতা করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্রসংগঠন ও সাংস্কৃতিকগোষ্ঠি। 'বাংলা হরফের রদবদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে' — এই শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় ৪১ জন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীর।[৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ বিক্ষোভ মিছিল করে এর প্রতিবাদে। পূর্ব

---

১. ড. সাঈদ-উর রহমান, আইউব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক, ঢা. বি. পত্রিকা, ১৯৭৪ পৃ. ১৮৬-২০৩

২. Minutes of the Academic Council (D.U.) held on 3.8.68

৩. দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

৪. পয়গাম, ২৭শে আগষ্ট ১৯৬৭

৫. দৈনিক সংবাদ, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান নীহারিকা সংসদ, সংস্কৃতি সংসদ, ভৈরবের সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং আওয়ামী লীগ নেতা মওলানা তর্কবাগীশও (জ. ১৯০০) এই প্রচেষ্টার নিন্দা করেন। প্রস্তাবের সমালোচনা করেও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার প্রয়াসের পাশাপাশি রোমান হরফের প্রবর্তনের পক্ষেও প্রচারণা শুরু হয়। ১৯৬৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট-তনয় ক্যাপ্টেন গওহর আইয়ূব পাকিস্তানের সংহতির জন্যে পূর্ব বাংলায় উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা বাধ্যতামূলকভাবে শেখানোর প্রস্তাব করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় সাতাশে ফেব্রুয়ারি এক চিঠি লিখে তিনি তাঁর প্রস্তাব বাংলাভাষীদের খেদমতে পেশ করেন। ঢাকার এক প্রকৌশলী এআরএম ইনামুল হক ২রা মার্চ ও ২৩শে মার্চ প্রকাশিত দু'টি চিঠিতে বাংলা ও উর্দুর জন্য রোমান হরফ ব্যবহারের সুপারিশ করেন। ঐ সময়ে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ক'টি চিঠি প্রকাশিত হয়, বিরোধিতা করেও বেরোয় কয়েকটি। কেউ কেউ প্রস্তাব করেন সংহতির জন্য শুধু রাষ্ট্রভাষার লিপি পরিবর্তন না করে জাতীয় জীবনের অন্যান্য গুরুতর দিকে সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস চালানোর জন্যে।

এই পটভূমিতে আইয়ুব খান উদযোগী হলেন জাতীয় ভাষা সৃষ্টির জন্যে। ১৯৬৮ সালের চব্বিশে সেপ্টেম্বর ঢাকার নজরুল একাডেমীর অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বিভিন্ন ভাষার সমন্বয়ে একটি পাকিস্তানী ভাষা গড়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। ক'দিন পরে পিন্ডির আন্তঃপ্রাদেশিক ছাত্র-সমিতির বার্ষিক ম্যাগাজিনের জন্যে প্রদত্ত এক বাণীতেও তিনি অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।[১] অক্টোবর মাসের পহেলা তারিখের বেতার ভাষণে তিনি তাঁর বক্তব্য আরো প্রসারিত করেন। সে-বক্তৃতায় তিনি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মত দেন এবং মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানীদের ইতিহাস, চিন্তাধারা, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি অভিন্ন, সুতরাং সংস্কৃতি ভিন্ন হতে পারে না এবং ভবিষ্যতে ভাষাও এক হবে।

'ভাষা ও পোশাক পরিচ্ছেদের বিভিন্নতা নিতান্তই কৃত্রিম ব্যাপার। আমাদের ভাষাগুলো একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেলে এবং জনগণের মধ্যে অধিকতর মেলামেশা হলে এটা অত্যন্ত সম্ভবপর যে, আমরা সকল আঞ্চলিক ভাষা একত্রিত করে যৌথভাবে একটি মহান পাকিস্তানী ভাষা উদ্ভাবন করতে পারবো।[২]

প্রেসিডেন্টের এই মনোভাব পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু সমর্থকদের উৎসাহিত করে। 'আনজুমান-ই-তরক্কিয়ে উর্দু' উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলে।[৩]

পূর্ববাংলায় এর ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়া হয়। বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের নেতারা প্রেসিডেন্টর এক ধর্ম, এক তমুদ্দুন, এক ভাষা নীতির মধ্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার মানুষের জাতীয় সত্তার ধ্বংসের আশংকা দেখলেন। আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি ইসলাম ও এক জাতিত্বের পরিপন্থী নয়' বলে বিবৃতি দেন নূরুল আমিন ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। মাওলানা ভাসানী এক প্রতিবাদলিপিতে এই প্রচেষ্টাকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা থেকে বিচ্যুত করার ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, জাতীয় ভাষা সৃষ্টির ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি নষ্ট করার অপচেষ্টা সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করে দেয়। ভাষা-বিতর্ক জাতীয় সংহতি বিনষ্ট ও তিক্ততা সৃষ্টি করবে বলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পূর্বাঞ্চল শাখা প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ মোক্তার বার সমিতি, পাকিস্তান তামদ্দুনিক আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নও এই প্রচেষ্টার নিন্দা করে। বাংলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব কেউ কেউ গ্রহণ করে।[৪]

---

১. আজাদ, ৪ঠ অক্টোবর ১৯৬৮

২. আজাদ, ৩রা অক্টোবর ১৯৬৮

৩. আজাদ, ১লা অক্টোবর ১৯৬৮

৪. দৈনিক আজাদ, ৩-২১ অক্টোবর, ১৯৬৮-এর বিভিন্ন সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' – বিরোধী আন্দোলন

ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানের পর থেকে বাঙালী তরুণ মানসে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা আবার নতুন করে শুরু হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে পাকিস্তানীবোধের ভিত পাকা করার জন্য পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আজিজুর রহমান মল্লিক (জ. ১৯১৮)-কে সভাপতি করে একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় এবং পরিষদের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (জ. ১৯২৬) 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামক দু'খন্ডে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থ ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে পূর্ববাংলার মাধ্যমিক স্কুলসমূহে নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঠ্য করা হয়। পুস্তকের প্রথমখন্ডে ভারতবর্ষে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎস ও বিকাশ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার পূর্ণ বিকাশের কথা আলোচিত হয়; দ্বিতীয় খন্ডে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ এবং ভাষা-সাহিত্য-স্থাপত্য-চিত্র প্রভৃতির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত 'অখন্ড জাতীয়তাবাদী চেতনা' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পর্কে বলা হয় :

> কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আপাত এত অমিল সত্ত্বেও টেকনাফ থেকে তুরখাম পর্যন্ত সমগ্র ভূখন্ডের প্রায় সকল অধিবাসীই এক ধর্মবিশ্বাসের সূত্রে আবদ্ধ। একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হিসেবে পাকিস্তানীরা একটি সুসংহত জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। আর সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের নিজস্ব একটি কৃষ্টিগত বুনিয়াদ। .... পাকিস্তানের নিজস্ব কৃষ্টিগত বুনিয়াদকে আমরা পকিস্তানী কৃষ্টি আখ্যায়িত করিতে পারি। এই পাকিস্তানী কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রচ্ছদপটই দেশের জনগণের মধ্যে সংহতির একটি শক্তিশালী যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।[১]

পুস্তকটি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করায় ছাত্র-ছাত্রীরা এর প্রত্যাহারের জন্য সংগঠিতভাবে আন্দোলন শুরু করে। দু'টি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় : একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের, অপরটি : পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) তত্ত্বাবধানে। দুই পরিষদ ১৯৭০ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলে স্কুলে ধর্মঘট, প্রতিবাদসভা ও বিক্ষোভ করতে থাকে — ক্রমে ক্রমে আন্দোলনে যোগ দেয় অন্যান্য ছাত্র সংগঠন; ষোল জন বুদ্ধিজীবীও বইটি প্রত্যাহারের জন্য বিবৃতি দেন।[২]

আন্দোলনের চাপে সরকার কিছুটা আপোষ করে; বইটি কিছুটা পুনর্লিখন ও বর্জনের আশ্বাস দেয়া হয়। ধীরে ধীরে সেপ্টেম্বর মাস থেকে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায় ।

উল্লেখিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিত ১৯৭০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় —

> "কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে বাংলাভাষাকে নির্জীব করিয়া দিতে, পঙ্গু করিয়া দিতে। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে বাংলা ভাষার যে হাজার হাজার বছরের সঞ্চয় রহিয়াছে, তাহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছে কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকচক্রের চরেরা। ঐতিহ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া স্বাভাবিক ধারাকে বিকৃত করিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া সাহিত্য ফলাইয়া জেলের ভয় দেখাইয়া মাথা কিনিয়া নিতে চেষ্টা করিয়া কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকচক্র বাংলা ভাষার স্বীকৃতিকে অন্তঃসারশূন্য

---

১. পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি, পৃ. ১-২
২. দৈনিক পাকিস্তান, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৭০, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতিতে পর্যবসিত করিতে চাহিয়াছে। কখনও রোমান হরফের সুপারিশ করিয়া, কখনও রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে খড়গউত্তোলন করিয়া, কখনও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করিয়া কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকচক্র ছয়কোটী মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে নতুন করিয়া জিঞ্জির পরাইতে চাহিয়াছে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা চাহিয়াছে পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তাগত স্বায়ত্তশাসনের গণভিত্তিকে ভাঙিয়া দিতে। কৃষক-মজুর এবং অন্যান্য মেহনতীর সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তোলার মাধ্যম যে সহজ সরল মাতৃভাষা তাকে কৃত্রিম ভাষায় পরিণত করিয়া স্বার্থবাদীরা মেহনতী মানুষের মন ও মতের আদান-প্রদানকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছে। বিশেষ করিয়া গত কলঙ্ক দশকে শাসক ও শোষকচক্রের ষড়যন্ত্র সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি ধ্রুবতারা হিসেবে আমাদের সামনে থাকায় এইসব যড়যন্ত্রের জাল কোনোটাই টিকিতে পারে নাই। কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হয় নাই। উনসত্তর সালের জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুবশাহী আপসারিত হইয়াছে। এই গণ-অভ্যুত্থানও সম্ভব হইয়াছে সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রাখিয়া — সুতরাং বিভেদকারীরা যত জালই পাতুক না কেন; গত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-জনতা এগারো দফার কর্মসূচী রচনা করিয়া সমস্ত বাধা বিঘ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এক নতুন একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস সৃষ্টি করিল। শত শত শহীদের রক্তে আমাদের ইতিহাসের পথে অগ্রগতির স্বাক্ষর আঁকিয়া দিল। এই নিশানাতে বাহান্ন সালের ঐক্য নতুনতর সচেতনতায় অভিষিক্ত হইল।[১]

২১শের আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রকাশিত একুশের সংকলনের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "এই আন্দোলনের মধ্যে পরবর্তীকালের সকল আন্দোলনের বীজ ভ্রূণাকারে নিহিত ছিলো এবং কালে কালে তা বর্ধিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তোলে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেকগুলো ধারণা পাওয়া যায়––

প্রথমত, বৃহত্তর জনগোষ্টীর ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বীকৃতি দিতে হবে। এতে ছিলো রাষ্ট্রের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রয়োগের বাসনা;

দ্বিতীয়ত, কোনো জাতির মাতৃভাষাকে বাদ দেয়া যাবে না — এই ধারণায় পাওয়া যায় জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি।

তৃতীয়ত, ইসলামী সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ভাষা বলে পাকিস্তানী শাসকবর্গ কর্তৃক প্রচারিত উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অস্বীকার করার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলো রাষ্ট্রিক ভাবনা থেকে ধর্মীয় মনোভাবকে পরিহার করার সূচনা অর্থাৎ সামন্তবাদী চিন্তার স্তর অতিক্রম করার প্রয়াস।

এভাবে বিশ্লেষণে দেখা যায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে সুপ্ত ছিলো গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ইহলৌকিক ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙক্ষাসমূহ। ফলত, এই আন্দোলনের সফলতার মাধ্যমে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক দর্শনের অর্থহীনতা প্রকাশিত হয়ে নতুন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতি কখনো সুস্থ ও স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হয়নি এবং সেই অস্থিরতা ও অন্ধকার দিনগুলিতে ক্রমবর্ধমান সাড়ম্বরে শহীদ দিবস পালনের মাধ্যমে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক, রাজনীতিবিদ, তথা জনগণ নিজেদের ক্ষোভ উত্তেজনা ও আকাঙক্ষা প্রকাশ করেছে। শেষ পর্যন্ত দিনটি এক প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে। কারো কাছে একুশের তাৎপর্য ছিলো বাঙলী জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে; কারো কাছে পাকিস্তানের শাসকগোষ্টীর গণতন্ত্রবিরোধী ও জাতিসমূহের স্বায়ত্তশাসনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে. আবার অনেকে মনে করেছেন. সবরকমের সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বায়ান্নোর একুশে আমাদের শিখিয়েছে

---

১. দৈনিক সংবাদ, একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা; সম্পাদকীয়, পৃঃ ৪, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত দেশপ্রেম — যে দেশপ্রেমের অর্থ হলো এদেশের শোষিত ও নিপীড়িত জনতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সব শ্রেণীর স্বদেশী ও বিদেশী শোষকের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ঘৃণা আর ক্ষোভ।[১]

উল্লেখিত সামাজিক এই পটভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত এদেশের কবি-সাহিত্যিকগণ। তাঁরা মিছিলে শরীক হয়েছেন — আন্দোলনকে বেগবান করেছেন তাঁদের কলমের ভাষায়। জীবনের নানা ক্ষেত্রে নানা আবেগের যে ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করেছে তার নেপথ্য নির্মাতা এই কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী, তথা সাংস্কৃতিক কর্মীরা। আমাদের আলোচ্য পর্বের কবিরা বিশেষ ভাষাশিল্প নির্মাণ করে যে আবেগকে ধারণ করেছেন, মেধা ও মননকে ব্যবহার করেছেন যে শিল্পিত উপায়ে তার স্বাক্ষর অঙ্কিত হয়ে আছে এই পর্বের কবিতায়। পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি, প্রকৃতি, ঐতিহ্য, লোকায়ত জীবন, রবীন্দ্র-নজরুল, ভাষা-বর্ণমালা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে কবিতারচনার প্রবণতা বেশ লক্ষণীয় হয় এই পর্বে। এছাড়া মার্কসবাদী আদর্শ-ভিত্তিক রচিত কয়েকটি সংকলন এ সময়ে প্রকাশিত হয়। তবে "এ সময়ের অনেক কবিতা সমষ্টির ভাবনায় উচ্চকিত নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও কবিগণ পূর্ববাংলার সমষ্টিগত বোধ ও আবেগকে ভাষা দিয়েছেন। সৈয়দ শামসুল হকের 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' (১৯৬৯), মযহারুল ইসলামের 'বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি' (১৯৭০) শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে" (১৯৭০), আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন', আবদুর রশীদ খানের 'অন্বিষ্ট স্বদেশ' (১৯৭০), নির্মলেন্দু গুণের 'প্রেমাশুর রক্ত চাই' (১৯৭০) এবং একুশে ফেব্রুয়ারির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত জাহানারা আরজুর কাব্যগ্রন্থ 'শোনিতাক্ত আখর' (১৯৭১)-এর মধ্যে সে চেতনার পরিচয় স্পষ্ট। এসময়ে রচিত কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকাশিত, এই চেতনাবিশিষ্ট কাব্যগুলো হলো সিকান্দার আবু জাফরের 'বাংলা ছাড়ো' মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'প্রতনু প্রত্যাশা'. এবং হাসান হাফিজুর রহমানের 'যখন উদ্যত সঙ্গীন'। 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' আত্মজৈবনিক হলেও এর পটভূমিতে বিরাজিত বিপর্যস্ত পূর্ব বাংলা স্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষ-গোচর। উল্লেখিত কাব্যসমূহে এদেশের জনজীবনের দুরবস্থা, জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙক্ষা, জাতিগত নির্যাতন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ — কখনো মৃদু, কখনো সরোষ — বিষয়বস্তু হয়েছে। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার যে-প্রবণতা ইতোপূর্বে অনেক কবির মধ্যে প্রকট ছিল তা এ সময়ে কাটতে শুরু করেছে এবং ধারণা করা যেতে পারে যে, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানই এর কারণ। কবিরা ক্রমশ জনজীবন বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠেছেন এবং সংলগ্ন হয়েছেন বৃহত্তর জীবনের ও গণআন্দোলনের। এভাবে কবিতায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে স্ফূরণ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তা আরো স্ফূর্তি পেয়েছে নবোদ্যমে রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের কবিতার চর্চার মধ্য দিয়ে। ঐ সময়ে এঁদের কবিতার নতুন নতুন সংস্করণ এদেশে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় মুক্তি ও মার্কসবাদী আদর্শকে অবলম্বন করে রচিত কবিতার সংখ্যা এপর্বে আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক ও অনূদিত সংকলনগুলো ছাড়াও লেখক সংঘ প্রকাশিত 'আফ্রো-এশীয় কবিতাগুচ্ছ' ও রণেশ দাশগুপ্ত অনূদিত ও সম্পাদিত 'ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা' (১৯৬৯) এবং সুকান্তের কবিতার পুনর্মুদ্রণ শুরু হয় প্রবল উৎসাহের সঙ্গে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে ছোট-ছোট মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যাও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।[২]

---

১. সম্পাদকীয়, ইস্পাত (একুশের সংকলন) পূ. পা. ছাত্র ইউনিয়ন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ১৯৭০

২. ড. সাঈদ-উর-রহমান, পূ. বা. রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, পৃঃ ১২৯-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

একটি জাতির ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত ভাষা, কী এক রহস্যময় বন্ধনে একটি জাতিকে আবদ্ধ ক'রে সত্যিকারে জাতিতে পরিণত করতে পারে, তা উপলব্ধি করার দিন এই একুশে ফেব্রুয়ারি। বলা বাহুল্য, এ বোধ জাগ্রত ছিল এদেশের প্রতিটি মানুষের ভেতর। বাংলাদেশের মানুষ যার জন্যে সংগ্রাম করতে পারে, এবং সংগ্রাম করে গৌরব বোধ করতে পারে। বহু বছরের ভেতর ভাষা-আন্দোলন ছিলো তেমনি একটি বিষয়। যে বিষয় নিয়ে প্রত্যেক কবিরই একাধিক কবিতা রয়েছে। কবিরাও ২১শে ফেব্রুয়ারির বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছেন — নিজেদের জড়িত রেখে — জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেই আবেগকে ভাষা দিয়েছেন নতুন ব্যঞ্জনায়। প্রকৃত অর্থে এই ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই স্বদেশ-বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন কবিগণ। এদেশের কবিরা মায়ের রূপকে মাতৃভূমিকে আবিষ্কার করেছেন নানাভাবে, নানা পরিসরে, নানা উপমা-চিত্রকল্পে। কবি আহসান হাবীব মুখের কথা, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমিকে একই সমান্তরালে আবিষ্কার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন "কথারাই জননী" — তাই আজীবন মাতৃভাষার চর্চায় থাকতে চান সমর্পিতপ্রাণ —

জানি আমি কথারাই জননী এবং জন্মভূমি।
আমার স্বজন প্রিয়জন
কথার তরঙ্গে নিত্য আমাকে, আমার
আত্মাকে লালন করে —
গড়ে তোলে আমাকে। একদা
আমি সেই কথাকার
জননীর এবং এ প্রিয় জনমানসের সপক্ষে। কথারা
যতো দিন সোচ্চার
আমি আছি
অম্লান অস্তিত্বে আমি অজেয়। আমাকে
কথারা লালন করে —
আমি তার পরিচর্যাভার
নিয়েছি এবং তার লালনেই থাকতে চাই সমর্পিতপ্রাণ।[১]

সিকান্দার আবু জাফরের কাছে একুশ ধরা দিয়েছে জাতীয় জীবনের প্রতীক হিসেবে; জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক হিসেবে। কেননা, এই একুশের একটি মহৎ জন-জাগৃতির মুহূর্তে দেশের মানুষ একটি দন্ডে একাত্ম হয়েছিল, স্নায়ু-গ্রন্থিতে পাঁজরে-পেশীতে মেখে নিয়েছিল একটি অংগীকার। চেতনার পথে দ্বিধাহীন অভিযাত্রা নানামুখীন হাজার লোকের একত্র অস্তিত্ব — সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে — কাজেই কবির কাছে একুশের অর্থ নানাভাবে ধরা দিয়েছে। ক্রোধের ঘৃণার এমন কি ভয়াল বিস্ফোরণ তিনি আবিষ্কার করেন এই একুশে ফেব্রুয়ারিতেই—

---

১. আহসান হাবীব, একুশের কবিতা, বাংলা একাডেমী ১৯৮৩, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

কালো পতাকায়
প্রাচীর পত্রে
অশ্রু-তরল রক্তরঙের লিপি
ক্রোধের
ঘৃণার
ভয়াল বিস্ফোরণ —
একুশে ফেব্রুয়ারী।[১]

অথচ ভেলকি-হাতের অদৃশ্য কৌশলে বছর বছর এর মূল্য রূপান্তরিত হয় নানাভাবে। নানা প্রতিঘাত অভিঘাত উজিয়ে অবশেষে একুশ কবির কাছে হয়ে ওঠে গর্ব ও গৌরবের অশ্রু —

অতীতের কোনো নির্বাক একদার
দেশের লোকের গর্ব-গৌরবের
অশ্রু এবং রক্ত দানের
ক্ষয়ে ঝ'রে-যাওয়া প্রেরণা মূল্য
নিখিল জীর্ণ নিষ্প্রভ ইতিহাস
একুশে ফেব্রুয়ারী।[২]

বছর গড়িয়ে প্রতিবছর যখনই একুশ এগিয়ে আসে ধীর পায়ে — কবিও নতুন অঙ্গিকে নতুন ভাব-ব্যঞ্জনায় সমকালীন জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং তার আক্ষেপ এবং অভিঘাতে জর্জরিত কবিসত্তা একুশকে আবিষ্কার করে ভিন্ন মাত্রায়। দুঃখিনী মায়ের বাড়ির পথ চিনিয়ে দিতে সিকান্দার আবু জাফর যেন নিজের হৃদয়কে উপড়ে নিয়ে আসেন দেহের বাইরে —

মায়ের বাড়ি যখন ইচ্ছে এসো
অষ্টপ্রহর সব দরোজা খোলা,
পথ চিনতে কষ্ট কেন হবে।
হাড়ের গুঁড়ো মাথার ঘিলু
কলজে ছেঁড়া ছেঁড়া
সাজিয়ে পথের নিশান করা আছে
দেখামাত্র অমনি যাবে চেনা।

চলতে পথে বারে বারেই শিউরে উঠছে দেহ
মনে হবে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে বুঝি
কারো আশা, ভালোবাসা কারো মায়া স্নেহ
মায়ের বাড়ির পথে যদি ঘনায় আঁধার নিশা,
কান পাতলেই ছেলে-মরা মায়ের কান্না শুনে
মিলবে পথের দিশা।[৩]

---

১. সিকান্দার আবু জাফর, একুশের কবিতা পৃঃ ১৭
২. সিকান্দার আবু জাফর, মায়ের বাড়িরপথ, দৈনিক সংবাদ, একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ১৯৬৭
৩. সি.আ. জাফর, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নে ও বাস্তবে, ঘুমে ও জাগরণে আবুল হোসেন শিশুর মতো আকুলি-বিকুলি করেন একটি কথার জন্যে, হয়তো বা একটি শব্দের জন্যে সারারাত জেগে ছটফট করেন। কেননা, এদেশের ভাবা,ভাষা আর ভালোবাসা নিয়ে একদা মাইকেলও ফিরে এসেছিলেন ঘরে, ইস্কুল-পালানো ছেলে বিশ্বের শিরোপা নিয়ে এলেন, এমন কি বিদ্রোহী হলেন নজরুল নিজে, বাংলার মুখ খুঁজে পেলেন জীবনানন্দ দাশ — সে তো এই বাংলাভাষার চর্চা করেই — কাজেই কবিদের যতো খেলা তাতো ভাষাকে নিয়েই —

তোমার দেহের স্বাদ পেয়েছি বলেই
মানুষের গভীরতা জানি,
দেখেছি তোমার মুখ তাই
দেশ ও দেশের মানুষকে
ভালোবাসি, তোমার প্রসাদ
পেয়েছি বলেই
ফোটাই কথার খই
বুকের আগুনে।
তোমাকে নিয়েই যতো খেলা,
তাদেরও আমারও।[১]

ধ্বনিময় বর্ণমালা সুরে ও ছন্দে কিভাবে জাগিয়ে তোলে শব্দকে, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে শব্দেরা কিভাবে জেগে ওঠে সুরের মন্থনে, এমনকি কবিরা কিভাবে কবিতা লেখেন রাত্রি জেগে, অক্ষরে অক্ষরে খোঁজেন শব্দের পল্লব — শব্দনাম, শব্দস্বর, শব্দজ্যোতি — তারই প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করেন এভাবে—

কখনো কবিতা কেউ লেখে
রাত্রি জেগে অক্ষরে-অক্ষরে খোঁজে
শব্দের পল্লব শব্দনাম
শব্দস্বর, শব্দজ্যোতি
আকন্দ ফুলের টোলে
জোনাকী-যোনীর আলো।[২]

কবিতার শেষ স্তবকে তিনি ভাষাকে তুলনা করেন শেষ মাঘের কল্যাণকর বৃষ্টির সঙ্গে —

সোচ্চার মুখের ভাষা অত্যাশ্চর্য
যেন শেষ মাঘে বৃষ্টির কল্যাণ
কবিতার শিরোনাম কিংশুক পলাশ
জননীর কবর-প্রহরী করবী গুলঞ্চ,
উচ্চাঙ্গ সময় বুঝি দ্রাক্ষা রস
মধুভান্ড, গুচ্ছ গুচ্ছ শব্দের স্তবক,
আ-মরি বাংলাভাষা।[৩]

---

১. আবুল হোসেন, একুশের কবিতা পৃ. ২২
২. সানাউল হক, একুশের কবিতা, পৃ. ২৪
৩. সানাউল হক, একুশের কবিতা, পৃঃ ২৬

Dhaka University Institutional Repository

উনিশশো বাহান্নোর কবিতায় তরুণের খুনের পুষ্পাঞ্জলি বুকে নিয়ে যে দেশমাতৃকা আজো সগৌরবে মহীয়সী সেই ফুলের একটি পাপড়িও আজ কাউকে ছিঁড়ে নিতে দেবেন না বলে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন শামসুর রাহমান। আজন্ম সঙ্গের সাথী যে ভাষা তাকে তিনি তুলনা করেন অক্ষিগোলকের মধ্যে আঁখিতারার মতো।

আমার এ অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখি তারা।

যুদ্ধের আগুনে
মারীর তান্ডবে,
প্রবল বর্ষায়
কি অনাবৃষ্টিতে।[১]

অর্থাৎ জীবনের যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় যে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা সর্বক্ষণ উম্মীলিত থাকে কবির সত্তায় — সেই মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষাকে নিয়ে যখন ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র চলতে থাকে তখন কবিও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন তাঁর 'দুঃখিনী বর্ণমালা'র জন্যে —

এখন তোমাকে ঘিরে ইতর বেলেল্লাপনা চলছে বেদম,
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস।
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।[২]

১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম একুশের সংকলন "একুশে ফেব্রুয়ারী" এ ধারার অগ্রগমনে একটি উল্লেখযোগ্য এবং সাহসী পদক্ষেপ। এই সংকলনের ভূমিকায় বলা হয় :

"…. ভাষা আন্দোলনের গতি এমনি চূড়ান্ত সরকারী দমননীতির চাপে আপাত স্তব্ধ হয়ে গেলেও প্রদেশের জনসাধারণ তাকে ভোলেনি। তার প্রমাণ — ১৯৫৩ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক সাফল্য। সারা প্রদেশের মানুষ এই দিন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সালের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানাতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছে। ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁরা পূর্ববাংলার জনগণকে সুদৃঢ় আত্মচেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং তদপরবর্তী গণআন্দোলনের ধারা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

একুশে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের শাসকগোষ্ঠীর চেহারা চিনে নিয়েছে। বীর শহীদরা প্রত্যেকটি মানুষের মনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এই স্মৃতিস্তম্ভ সকল প্রতিবন্ধকতার পাষাণ প্রাচীর ধ্বংস করে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদের প্রাণে দুর্জয় প্রেরণার সঞ্চার করবে।"[৩]

---

১. শামসুর রাহমান, একুশের কবিতা। পৃ ৩৮
২. শামসুর রাহমান, একুশের কবিতা পৃ. ৩৮
৩. কবির উদ্দিন আহমদ একুশে ফেব্রুয়ারী, পুথিপত্র, ১৯৫৩ পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের নানা স্তরে বীর শহীদদের মহান আত্মত্যাগের অঙ্গীকারকে হাসান হাফিজুর রহমান ব্যক্ত করেন শব্দসার্থক উপমা ও চিত্রকল্পে। চারস্তবকে রচিত দীর্ঘ কবিতায় কবি শহীদদের বিষণ্ন থোকা থোকা এক সারি নাম উচ্চারণ করেন — যা বর্শার ফলার মতো এখনো পাঠকের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। বিচ্ছেদের জন্যে তৈরি হয়ে ওঠার আগেই আমরা হারিয়েছি সেই অস্বাভাবিক বেড়ে-ওঠা বিশাল-শরীর বালক আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন এবং জব্বারকে। তবে যাঁদের আমরা হারিয়েছি — তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে গেছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত —

যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত, কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রান্তের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।
আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ন নাম। একসার জ্বলন্ত নাম।
.....
আয়ুর প্রথম হৃদয়মথিত শব্দ,
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে
তারই সম্মানের জন্যে তাঁরা যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল;
বুদ্ধ আর মোহাম্মদের দৃষ্টির মতো দীপ্তি।[১]

প্রথম শহীদমিনার (আজকের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার) যখন ভেঙে ফেলা হয় তখন সারারাত জেগে বিশেষ সময়ের অনুপ্রেরণাকে ধারণ করে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন 'স্মৃতিস্তম্ভ' নামের কবিতাটি। যেখানে ইটের মিনার ভাঙা হয়েছিলো — যারা ধান বোনে, গুণ টানে, তোলে অস্তিত্বের হাতিয়ার, হাঁপর চালায় সেই সব সরল নায়কদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মুছে দেয়ার জন্যে। সেদিন সেই সব মানুষের প্রতিনিধি হয়ে কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন —

ইটের মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য পারেনি ভাঙতে

ইটের মিনার ভেঙে গেলে সে মিনার চেতনায় বিশ্বাসে আরো গূঢ় গম্ভীর প্রভাব বিস্তার করলো। এখানে এসে মৃত্যু অশ্রু বিরহ যে অর্থ ধারণ করলো তা গূঢ় মহৎ অবিনশ্বর —

এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন
শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পাতাকার রঙ?
এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে এমন মৃত্যু
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মোহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল'?[২]

---

১. হাসান হাফিজুর রহমান, একুশে কবিতা, পৃ. ৪২
২. আলাউদ্দিন-আল আজাদ, একুশের কবিতা, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনে অনেক মায়ের বুক খালি হয়েছে। যাঁরা জীবন দিলো এদেশের সন্তান, তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে, স্বদেশের জন্যে সবচেয়ে বড় দান রেখে গেলো। রক্ত-মাংসে বাঁচার চেয়ে তাঁরা বেঁচে রইলো কালের গভীরতা নিয়ে অমরতার ব্যাপ্তি নিয়ে নতুন অর্থ নিয়ে। কিন্তু যে মা রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করেন — কখন ফিরে আসবে তার খোকা? অবুঝ হৃদয়ে যে মা এখনো তাঁর খোকার জন্যে ডালের বড়ি শুকিয়ে চলেছেন, নারকেলের চিঁড়ে, উঁড়কি ধানের মুড়কি ভেজে ঝাপসা চোখে এখনো তাকিয়ে আছেন উঠোনের দিকে — সেই মায়ের হৃদয়ের ভাষাচিত্র নির্মাণ করেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ —

ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠোনে, উঠোনে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।
এখন
মার চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দ্যায় শকুনিদের।
তারপর,
দাওয়ায় বসে মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,
খোকা তার
কখন আসে! কখন আসে![১]

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কবিতায় স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেবার আহ্বান জানান। কেননা, স্বাধীনতা কোনো অনায়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে তাকে ছিনিয়ে আনতে হয় — কথা বলবার স্বাধীনতা, অক্ষরের ডান পাশে অক্ষর বসিয়ে শব্দ তৈরি করার স্বাধীনতা, জীবনের স্তোত্র রচনার স্বাধীনতা সবল হাতে ছিনিয়ে নেয়াই বোধ করি সঙ্গত। কেননা, বাণীর দেবীকে শুধু বন্দনা করে লাভ নেই। মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে হলে মানুষকে কবি এবং কবিকে মানুষ হতে হবে আজ। কবি তাই আহ্বান জানান সমাজের সর্বস্তরের মানব-সন্তানকে —

আমার অগ্রজ যত কবিকে এখন,
আমার সপক্ষে যত যোদ্ধাকে এখন,
আমার অস্থিতে যত বজ্রকে এখন,
আমার ঘৃণায় যত বিষকে এখন,
আমার হৃদয়ে যত প্রীতিকে এখন,
আমার অস্তিত্বে যত ক্ষতকে এখন,
এই ভরা অন্ধকারে মনে মনে ডাকি,
এসো কবি, এসো যোদ্ধা, এসো বজ্র, এসো,
এসো বিষ, এসো প্রীতি, সেরে তোল ক্ষত
মানুষকে কবি করো, এসো এসো এসো;
কবিকে মানুষ করো, এসো, আজ এসো।[২]

---

১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, একুশের কবিতা, পৃ. ৬২
২. সৈয়দ শামসুল হক, একুশের কবিতা, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সনেটের দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গিকে মিনারের পাদদেশে শব্দহীন স্তব্ধতায় হাতে ফুলের অঞ্জলি নিয়ে স্মৃতিভারাতুর সময়ের ছবি আঁকেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। মাতৃভাষা সত্তার সম্মানে ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে তাঁর হৃদয়ের কথকতা। ক'জন সাহসী যুবার আত্মত্যাগ আজো অগণন মানুষের প্রিয় স্মৃতি হয়ে আছে অম্লান — আজ তারা শুধু শোকগাথায় নয়, প্রোজ্জ্বল প্রতীকে জ্বলে মানসের সাহসী সঞ্চয়ে — কেননা,

অতীত দিনের গাথা লেখে ক্লান্ত আমাদের মন
ছবি হয়ে ফোটে চোখে একুশের সেই দৃশ্যাবলী–১

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' — যে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, সম্রাজ্ঞীর মতো দীপ্ত যার অহংবোধ — সেই শাশ্বত জননীকে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবার বাসনা ব্যক্ত করেন কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল। ২১শে ফেব্রুয়ারি কবির কাছে তাঁর ২১তম জন্মদিনের মতোই তাৎপর্যমন্ডিত। নিজস্ব এই জন্মদিনে সমস্ত কর্মকোলাহল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কবি তাঁর জননীরূপ জন্মভূমিকেই প্রত্যক্ষ করতে চান প্রাণভরে —

মা, তোমার উষ্ণ কোলে আহত অবুঝ মাথা রেখে
আমি শুধু শুয়ে থাকবো, আমার সোনালী লম্বাচুলে
তোমার নিঃশ্বাস ঢেউ তুলে যাবে, আমি আজ কিছুই করবো না
চেয়ে চেয়ে দেখবো এক অলৌকিক গর্বে দীপ্ত সম্রাজ্ঞীর মতন তোমাকে।২

কয়েকটি আত্মা চৌচির হয়ে জন্ম নিয়েছিলো যে একটি দিন, ইতিহাসের খন্ডিত স্ফুলিঙ্গের মতো যে দিনটি — সেই একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিকে মুক্তির মতো, স্বাধীনতার মতো এবং প্রতিশোধের মতো একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত করেন ফজল শাহাবুদ্দীন —

আমার সম্পন্ন জ্যোতিষ্মান ভূমন্ডল
বিধ্বস্ত আত্মার সৌরভের উন্মথিত আলোছায়া থেকে
মুক্তির মতো, স্বাধীনতার মতো, প্রতিশোধের মতো
এই একটি দিন।৩

দৈনন্দিন দারিদ্র্য ঠেলে আমরা যে গানে হেসে উঠি, মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানে, মায়ের যে গানে ফোটে দোলনার কচিমুখে হাসি, সে সুরে কবি কবিতা লেখে, প্রেয়সী নারীকে ভালোবাসে — বীর শহীদ যারা প্রাণ দিয়েছে দেশের জন্যে ভাষার জন্যে তারাও একদা ভালোবেসেছিলো সেই সে গান — জন্মে জন্মে পরিচিত যে ভাষা। তাদের সেই স্মৃতি যেন বিস্মৃতির ইতিহাস হয়ে না যায় — সেই কামনা ব্যক্ত করেছেন কবি :

তারা জুড়ে আছে এদেশের সমস্ত হৃদয়।
তাই তারা বিস্মৃতির ইতিহাস নয়।৪

---

১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, একুশের কবিতা, পৃঃ ৬৮
২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, একুশের কবিতা, পৃ. ৭০
৩. ফজল শাহাবুদ্দীন, একুশের কবিতা, পৃঃ ৭৪
৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, একুশের কবিতা, পৃঃ ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল, রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখে, উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে তীরের ফলার মতো নিক্ষিপ্ত চীৎকারে বাজে একটি ধ্বনি : বাংলা। 'বাংলা' যেন কবির মায়ের নাম। ভাইদের মুখাবয়ব। জাতীয় চৈতন্যের সবচেয়ে মমস্পর্শী বিষয় নিয়ে স্বরবৃত্তের হালকা চালে গভীরতম বেদনাকে আল মাহমুদ স্পর্শ করেছেন, যা আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাসের এক দুঃখজনক অধ্যায় —

ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে বৃষ্টি কোথায় বরকতের রক্ত।
হাজার যুগের সূর্যতাপে জ্বলবে এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে,
প্রভাত ফেরীর মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদ গীতি গাইছে পথে তিতুমীরের কন্যা!
চিনতে নাকি সোনার ছেলে ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে মুক্ত বাতাস কিনতে!
পাহাড়তলীর মরণ-চূড়ায় ঝাঁপ দিলো যে অগ্নি
ফেব্রুয়ারীর শোকের বসন পরলো তারই ভগ্নি
প্রভাতফেরী প্রভাতফেরী আমায় নেবে সঙ্গে?
বাংলা আমার বচন আমি জন্মেছি এই বঙ্গে।[১]

নিজের ভাষার বর্ণমালা ছেড়ে অন্য ভাষা শেখার যে গ্লানি, স্বদেশে পরাধীন থাকার যে মর্মযাতনা, তারই ভাষারূপ দিয়েছেন ওমর আলী — ধীরে ধীরে সবকিছু বেদখল হয়ে যাচ্ছে, এমনকি শ্রোতার কান — তার নিজস্ব ভাষা থেকে বেদখল আজ :

বেদখল হয়ে যাচ্ছে, আমার স্বদেশে আমি পরাধীন
যাত্রাদল ভেঙ্গে দিয়ে কোথায় লুকাই
অ থেকে ঁ ফেলে দিয়ে শিখি অন্য ভাষা
বাঙালীর গর্ব, বাঙালীর আশা কি করে বাঁচাই?[২]

বিদেশের বৈভব, লাবণ্যভরা তৃণের বিস্তার, উপত্যকার উজ্জ্বল আভাস, এমন কি বিদেশের ফুটপাতে বর্ণোজ্জ্বল দোকানের বৈভব, তুষার মোড়া শাদা বৃক্ষের সারি আর মানুষের বাসনার মতো উর্ধ্বমুখী স্কাইস্ক্রেপারের কাতার এতোসব লোভনীয় উপচার তবু একজন কবি যিনি এই সমাজ সম্পৃক্ত মানুষ — যার আমূল প্রোথিত দেশের মাটিতে, তিনি কখনো ব্রিফকেস হাতে বলতে পারেন না — 'গুডবাই'। তাই পরিশীলিত ভাষার বদলে নিজের ভাষার খিস্তিখেউড় অনেক বেশি প্রিয়। কেননা,

---

১. আল মাহমুদ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ইত্তেফাক, ১৯৬৯
২. ওমর আলী, একুশের কবিতা, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

মিছিল প্রত্যাগত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শাসাই,
ঊর্ধ্বশ্বাস ট্যাক্সির মুখে ছিটকে পড়া
দিগভ্রান্ত গ্রাম্যজনের চকিত, উদ্বেল মুখ দেখে
টিটকারিতে ফেটে পড়ি
অর্থাৎ যখনই চীৎকার করি
দেখি, আমারই কণ্ঠ থেকে
অনবরত
ঝরে পড়ছে অ, আ, ক, খ।[১]

১৯৬৭ সালের গণ-আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা দেশে আরো ব্যাপকভাবে উদযাপিত হয়। এসম্পর্কে দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "এবারের গণআন্দোলন বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন ও বাষট্টি সালের সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারায় পুষ্ট এবং সেই ধারারই আরো বলিষ্ঠ আরো সংগ্রামী আরও পরিণত রূপ। বাষট্টি সালের সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন অপেক্ষা এবারের আন্দোলন বহুগুণে ব্যাপক ও গভীর। পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সারা দেশের জনগণ একযোগে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শহরের বৃত্ত ভাঙিয়া পল্লীতে পল্লীতে পর্যন্ত জঙ্গী গণ-আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"[২]

দেশের এই পটভূমিতে কবিও শরীক হন মিছিলে, হরতালে। সামাজিক এই আবেগকে ধারণ করতে গিয়ে কবিতার আঙ্গিক পাল্টে যায় আমূল । কবি সেই অন্বিষ্ট সমুদ্রকে আজ খুঁজে ফেরেন যে সমুদ্রের জলই শুধু নেভাতে পারে হৃদয়ের আগুন; গ্রামে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে হরতালে-মিছিলে যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনের লেলিহান শিখা নেভাতে

অন্বিষ্ট সমুদ্র খুঁজছি
এখন জ্বলছে আগুন হৃদয়ের কৌটায়
রক্তের কণিকায়
হরতালের চাকায়
জ্বলছে গ্রামে, বন্দরে, মরা প্রান্তরে আকাশের নিচে আগুন
নক্ষত্রের উজ্জ্বল উপত্যকায়, শিশুর অস্ফুট মুখের ভাষায়
যেখানে হয়েছি জড়ো
রাজপথে, মাঠে ময়দানে
জনসমুদ্রে শ্লোগান, গঞ্জে শ্লোগান, এখানে সেখানে শ্লোগান।[৩]

গণআন্দোলনের এই পটভূমিতেই রচিত হয়েছিল সিকান্দার আবু জাফরের 'মায়ের বাড়ির পথ' নামক কাবিতাটি। যে কোনো সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সংগ্রামশীল মানুষের অংশগ্রহণে সার্থক হয় যেকোনো বিপ্লব বা সংগ্রাম। কিন্তু তার নেপথ্যে গুটিকতক বিশ্বাসঘাতকের

---

১. শহীদ কাদরী, একুশের কবিতা, পৃ. ৯২
২. সম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ১৯৬৭
৩. মাহমুদ আল জামান, অন্বিষ্ট সেই সমুদ্রের মুখ এখনও খুঁজছি। দৈনিক সংবাদ ১৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিতিও অস্বীকার করা যায় না — যা অনেক সময় সংগ্রামের ধারাকে বিপথে পরিচালিত করে। এজন্যে কবি সতর্ক করেছেন — তাঁর বিবেককে — সংগ্রামী বন্ধুদেরকে —

... একুশে ফেব্রুয়ারী এবার আমাদের পরশুরামের বিবেকের কাছে
জানাতে এসেছে তার শেষ অভিবাদন;
আমাকে আর স্মৃতির কারাগারে বন্দী করে রেখো না,
আমার ক্ষতমুখে আবার রক্ত উৎসারিত হবে
অথচ আমার প্রয়োজনীয় রক্ত নেই
সর্বজ্ঞানী কাল বলেছেন : তোমার বন্ধুদের যাচাই করে নাও।[১]

মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্যে প্রয়োজনে এক বুক রক্তের যৌতুকদানের প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন কবি। আন্তরাত্মা মৃত্যুর গর্বে ভরপুর যেন ভোরের শেফালি হয়ে পড়ে আছে ঘাসে। নিজের ভেতরেই তিনি আবিষ্কার করেন বীর শহীদদের আত্মার প্রতিভাস। দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারার যে গৌরব — তাকে ধারণ করে একজন কবি অমর হতে চান :

তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো
আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।
এই নাও আমার যৌতুক, এক বুক রক্তের প্রতিজ্ঞা
ধুয়েছি অস্থির আত্মা শ্রাবণের জলে, আমিও প্লাবন হবো
শুধু চন্দনচর্চিত হাত একবার বুলাও কপালে
আমি জলে
স্থলে
অন্তরীক্ষে উড়াবো গাণ্ডীব
তোমার পায়ের কাছে নামাবো পাহাড়
আমিও অমর হবো, আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।[২]

একুশে ফেব্রুয়ারির এই চেতনাকে ধারণ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে শত শত কবিতা। এদেশের সকল তরুণ ও প্রবীণ কবি এ বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। সবক্ষেত্রেই যে তা শিল্পসার্থক হয়েছে — তা নয়। কিন্তু জাতীয় চৈতন্যের বিকাশে সামাজিক দায়িত্ব পালনের কর্তব্যবোধ থেকে রচিত হয়েছে সেসব কবিতা, এমন কি আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসেবে যেসব কবিতা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে — সেসব ক্ষেত্রে শিল্পগুণ বিচারের চেয়ে সমাজজীবনের প্রতিফলন অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে।

---

১. দিলওয়ার, ২১শে ফেব্রুয়ারী : বন্ধুরা, দৈনিক সংবাদ, একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ১৯৬৮ পৃ. ৫
২. নির্মলেন্দু গুণ, কোনো এক সংগ্রামীর দৃষ্টিতে, সাপ্তাহিক জনতা, একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ১৯৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও স্বকীয়তা অনুসন্ধান

১৯৪৭ সালের পর থেকেই পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার জনগণের স্বাতন্ত্র্যকামী প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দেবার অপপ্রয়াসে সুপরিকল্পিতভাবে লিপ্ত হয় — সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যাসাম্যে পরিণত করা, বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করা, বাঙালী জাতিসত্তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের উচ্চপদে বাঙালীদের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব না-দেয়া — সে-চেষ্টারই এক-একটি নিদর্শন। এভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণে, ক্রমশ পূর্ববাংলা পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতরে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশের রূপ লাভ করে। তার প্রতিরোধের প্রয়াসে এ-এলাকার জনগণের স্বাতন্ত্র্যকামী চেতনা সংস্কৃতিকে ঘিরে ক্রমশ সংহত ও অন্তর্মুখী হয়ে পরিশেষে প্রবল জাতীয়তাবাদী শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

"পাকিস্তানের মোহভঙ্গে পূর্ববাংলার মানুষও তার নতুনতর লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে ১৯৪৭ সালের পরবর্তীকাল থেকেই স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে নিজের আচার-আচরণে ও বিশ্বাসে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। আর তাই যে গান পশ্চিম বাংলায় যে মর্যাদা লাভ করেনি, সেই 'সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" পূর্ববাংলার মানুষের স্বপ্নের, সাধের এবং অশ্রু-উদ্রেককারী সংগ্রামী সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। মোহররমের মিছিলে নয়, রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন পূর্ববাংলার মধ্যবিত্তের কাছে সংগ্রামী চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয় আর সে চ্যালেঞ্জকে সে প্রতিবছর পাকিস্তানী শাসকচক্রের রোষচক্ষুর ক্রমাধিক বিপদ ও সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে থাকে।[১]

জাতীয়তাবোধের এই চেতনা ক্রমশ স্পর্শ করেছে সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরকে। সংস্কৃতি চর্চায়ও এর প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের সাধারণ ঐতিহ্যকে পূর্ববাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্য বলে স্বীকার করে নেয়া, বাঙালীর আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টায় লোকঐতিহ্য, আঞ্চলিক শব্দ, উপভাষা নিয়ে গবেষণা, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা, বাংলা চলচ্চিত্রের ক্রমিক প্রসার, যাত্রা-গানের শহুরে জীবনে অনুপ্রবেশ এবং লোকশিল্পের নবমর্যাদা প্রভৃতি এর উদাহরণ। সংস্কৃতিচর্চার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত বাংলা কবিতার এক উল্লেখযোগ্য অংশ পূর্ববাংলার প্রবহমান ঐতিহ্য, লোকজ সংস্কৃতি, শহীদ দিবস, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ও ব্যক্তিত্ব এবং পূর্ব বাংলার স্বাধিকার প্রভৃতিকে অবলম্বন করে রচিত। এইসব বিষয়কে ভিত্তি করে রচিত সম্পূর্ণ কাব্যের সংখ্যা কম, কিন্তু প্রায় সবাই কোনো না কোনো প্রসঙ্গে ও সময়ে এ-নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

সাতচল্লিশ থেকে '৭১-এর দিকে সময় যতই এগিয়েছে এ ধরনের কবিতা গুণে ও গণনায় ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটামুটি চারটি প্রধান শাখায় এই কবিতাগুলোকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে —

১. বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কবিতা
২. দেশপ্রেমমূলক কবিতা
৩. পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সম্পর্কিত কবিতা
৪. পাকিস্তান-বিরোধী ব্যঙ্গ কবিতা[২]

---

১. সৈয়দ ফজলুল করিম, বাঙালী সংস্কৃতি চিন্তা, মনসুর মুসা সম্পাদিত বাঙলাদেশ। বাংলা বিভাগ, ঢা. বি. ঢাকা ১৯৭৪) পৃ. ২২৯-৩০

২. সাঈদ-উর-রহমান, পূ.বা.রা-স. ও কবিতা, পৃ. ২৭১

Dhaka University Institutional Repository

১. বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কবিতা

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর থেকেই পুরো তেইশ বছর ধরে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ওপর টানা আক্রমণ চলেছে। "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা না-দেয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সাল থেকেই আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালের আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের পর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সাফল্যজনক সমাপ্তি ঘটে। পরের হামলা হয়েছে পরোক্ষভাবে। বাংলাভাষাকে সংস্কার করা, হরফ বর্জন ও বানানের সরলীকরণ, আরবী হরফ বা রোমান হরফে বাংলা লেখা, উর্দু ও বাংলার সমন্বয়ে পাকিস্তানী ভাষা তৈরি করার চেষ্টা সেই প্রয়াসেরই এক-একটি দিক। একই সঙ্গে সংস্কৃতির ওপরও হামলা অব্যাহত থাকে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জন করা, নজরুল ইসলামের রচনাবলীর পাকিস্তানী সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা, পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে হিন্দুয়ানী বলে চিহ্নিত করা, বাঙালীর জাতিসত্তাকে কালিমালিপ্ত করা এবং পূর্ববাংলার নাম বদলে পূর্ব পাকিস্তান করা — সেই আক্রমণেরই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ। কিন্তু ষড়যন্ত্র সার্থক হয়নি। মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী ছাড়া বাকি সকলেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমেছেন। কবিরা ছিলেন আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কর্মী। অনেক সংগ্রামী কবিতা রচনা করে তাঁরা সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন"।[১] 'বাঙালী' শব্দটি উচ্চারণ করা ও নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দেয়া যে এক সময় কতটা বিপজ্জনক ছিলো– আমরা তার প্রমাণ পাই ১৯৫৪ সালে ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষণে। মুসলিম লীগ সরকারের সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের কথা তিনি খোলাখুলিভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন —

"১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট বহুদিনের গোলামীর পর যখন আযাদীর সুপ্রভাত হল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নতুন নেশা আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দের অবাধ আমদানী, প্রচলিত বাংলাভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। ..... ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা এমন কি বাঙালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন।[২] 'বাঙালী' শব্দের এই স্পর্শকাতরতা নিয়ে 'পূর্ব-পাকিস্তানী' নামক একটি কবিতায় কবি তার মনোভাব ব্যক্ত করেন এভাবে —

ভাবি পুনরায় :
বাঙালী বলা ঠিক নয় তোমাদের,
কি জানি কিসের গন্ধ আছে মিশে ওর নামে,
রাজনীতির কারণে;
কাজ কি আমার ঝামেলা এনে টেনে।

---

১. পূ. বা. রা-স ও কবিতা, পৃ. ২৮৭
২. উদ্বোধনী ভাষণ (পুস্তিকা) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

তার চাইতে বলি :
তোমরা মুসলমান।[১]
(পূর্বপাকিস্তানী)

বাংলা শব্দের সম্ভাবনাকে অনেকদূর প্রসারিত করে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ — এই স্বীকারোক্তি 'রবীন্দ্রনাথকে' কবিতায় — চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন সৈয়দ আলী আহসান —

এখন আবার আমাদের শব্দে
নতুন স্বাদ আসছে —
নতুন মৃত্যু, বিচার, পদচারণ এবং বিশ্বাস
তুমি আমৃত্যুর সাধনায় এসব সম্ভাবনাকে প্রদীপ করেছো।
তাই তুমি আমার আকাশ
এবং শব্দের পরিসরে হৃদয়ের নীলাম্বর।
(রবীন্দ্রনাথকে)

শামসুর রাহমানের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'উদার সূর্যের' সঙ্গে উপমিত; কারণ তার সাহিত্যের আলো থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। নিজের জীবনে রবীন্দ্র-প্রভাবের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, জীবনের ঋতুতে ঋতুতে আপন সত্তায় যে-আশ্চর্য মায়ামন্ত্রধ্বনি তিনি অনুভব করেন, ক্লান্তি ও হতাশায় নিসর্গের কাছে গিয়ে নতুন শক্তি আহরণের যে-ক্ষমতা তিনি ধারণ করেন, তা রবীন্দ্রনাথেরই দান —

এখনো যে ক্লান্ত হলে নিসর্গের কাছে
আশ্চর্যের গ্লাশ হাতে যাই
অবসন্ন চেতনার গোধূলিতে শুনি
সান্ত্বনার ভাষা, এখনো রবীন্দ্রনাথ
সে তোমারি দান।
(সূর্যাবর্ত)

জিয়া হায়দার নিজের জীবনে রবি ঠাকুরের প্রভাবকে অতিক্রম করে আত্মশক্তিতে বিকশিত হবার যে সাধনা করেন, তা বারংবার ব্যর্থ হয়, কেননা তাঁর চেতনায় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের মতো সর্বব্যাপী —

অবশেষে অক্ষম শয়তানের মতো
নিজেই কেঁদেছি বিবিক্ত পরাজয়ে।
যেহেতু জেনেছি
আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো।
(রবীন্দ্রনাথ)

---

১. শেখ মোহম্মদ আহম্মদ, পূর্ব-পাকিস্তানী, বিচিত্রা, ১৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে একটি সুন্দর সনেট রচনা করেছেন আল মাহমুদ। সংস্কৃতির অঙ্গনে পূর্ববাংলার নৈরাজ্যজনক অবস্থার বিশ্বস্ত চিত্র এতে প্রতিফলিত। এদেশ তখন সৃষ্টিহীনা, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিজন মরুভূমির সঙ্গে তুলনীয় :

বুঝি না রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে যে বাংলাদেশে ফের
বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন
গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।

(রবীন্দ্রনাথ, কালের কলস)

বাংলাভাষা সংস্কারের জন্য ১৯৬৮ সালে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে উদ্যোগ গ্রহণ করে, সে পটভূমিতে কিছু সংখ্যক কবিতা রচিত হয়েছিল। শামসুর রাহমান লিখেছেন "বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা"। বাংলা বর্ণমালা তথা ভাষা কিভাবে সর্বক্ষণ তাঁর চিন্তা ও কর্মকে ঘিরে নিশ্চিন্ত নির্ভরশীলতা ও স্বপ্নের বাহন হয়ে আছে, তিনি তাঁর দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণমালা নিয়ে অশুভ শক্তির তৎপরতাকে তিনি রূপায়িত করেছেন এভাবে —

এখন তোমাকে নিয়ে খেংরার নোংরামি
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

(বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা : নিজবাসভূমে)

ফজল শাহবুদ্দীন বলেছেন, তাঁর জীবনে বাংলাভাষার বিস্ময়কর প্রভাবের কথা। নিজের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে-অভিজ্ঞতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, কিংবা এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার, বিশেষত, বাংলাদেশের শোষিত মানুষের যে জাগরণ তিনি দেখেছেন, বাংলাভাষা না থাকলে তার প্রকাশ কখনো সম্ভব হতো না। তাই বাংলার প্রতি তিনি চিরকৃতজ্ঞ —

আর বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে নদীতে-পাহাড়ে
শুনলাম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠ
নদীর বলিষ্ঠ তীক্ষ্ণ উদ্দীপিত এক বিপুল প্রত্যয়ে
মানুষের চিরদিনের সকল অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে
মেতে উঠেছে
হে বাংলা ভাষা আমার, আমি চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো
তুমি না থাকলে মানুষের এই উজ্জীবিত অভ্যুত্থানের কথা
আমি কোনোদিন উচ্চারণ করতে পারতাম না।

(বাংলাভাষা, মা আমার, আ. অসু.)

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ হতাশার দারুণ দুর্দিনে বাংলাভাষা তাঁকে কিভাবে অনুপ্রেরণা দান করেছে তারই চিত্ররূপ প্রতীকায়িত করেছেন একটি কবিতায়। অপর একটি কবিতায় তিনি বাংলাভাষার শব্দসমূহ রাজপথে কিভাবে নতুন প্রাণ পায় তার বর্ণনা করেন এভাবে —

প্রেমের সংলাপে আর মৃত্যুঞ্জয়ী গানে
সংঘবদ্ধ আন্দোলনে মিছিলে শ্লোগানে
তোমার প্রতিটি শব্দ দেখি রাজপথে
অনির্বাণ হয়ে জ্বলে উজ্জ্বল শপথে।

(বাংলাভাষার প্রতি, রক্তিম হৃদয়)

"সংস্কৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলো রচিত হয়েছে ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন প্রবর্তিত হবার পর থেকে তখন থেকে সংস্কৃতির ওপর এক-একটি আঘাত শুরু হলে, অন্যদের মতো কবিরাও সচেতন হলেন এবং দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের নিবিড় সম্পর্ক, জীবনে-চৈতন্যে-মননে তার বিস্ময়কর প্রভাব অনুভব করলেন আনন্দ-বেদনার সঙ্গে। সে প্রভাবের কথা কেউ বলেছেন মৃদুভাবে, কেউ উচ্চকণ্ঠে, কারো কবিতা প্রতিবাদের, কারো নীরব উপলব্ধির। তবে সবাই প্রতিনিধিত্ব করছেন সমাজের বৃহৎ অংশের আবেগ-অনুভূতির"।[১]

২. *দেশপ্রেমমূলক কবিতা :*

১৯৪৭-এর পর থেকে দেশপ্রেমমূলক যত কবিতা রচিত হয়েছে — অবধারিতভাবে পূর্ববাংলার উপস্থিতি প্রায় ক্ষেত্রে বহুবিচিত্র এবং প্রাণবন্ত। এদেশের নিসর্গ, প্রবহমান লোকজ ঐতিহ্য ও জনজীবনের দুর্গতি কবিচিত্তে প্রবাহিত ও অন্তর্লীন হয়ে তাঁদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ষড়ঋতুর বিবিধ বিন্যাস নিয়ে কবিতা রচনা করা আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই শুরু হয়। এধরনের কবিতা জনপ্রিয়ও বটে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' ও জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' ইতোমধ্যে মিথে পরিণত হয়ে লোকের মুখে মুখে ফেরে। সুতরাং দেশকে নিয়ে কবিতা রচনা বাংলা সাহিত্যে নতুন ঘটনা নয়।

ষাটের দশকের শুরুতে আমাদের কবিরা পূর্ববাংলার দিকে নতুন করে তাকালেন। বিদেশে অবস্থান কালে সানাউল হকের মনে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক যে-একটা স্বপ্নিল মায়াময় রূপ জেগে উঠেছিল তা তিনি ষাটটি সনেটে, কখনো সরাসরি কখনো তির্যকভাবে, উপস্থিত করেছেন। 'তিতাস' নদীর তীরের জনপদগুলোতে কবির বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। প্রবাসজীবনে সেই পুরোনো স্মৃতি বিশেষ রূপ নিয়ে কবির মানসপটে হাজির হয়। কবিমানসী ও গ্রামপ্রকৃতি পরস্পর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে কবিপ্রকৃতিকে প্রকাশ করেছে। কবির চোখে সে-প্রকৃতি ধরা পড়েছে এভাবে :

কাঁঠালি-চাঁপার গন্ধ, কাঁঠালের রস
এখানে শেয়ালকাঁটা, চোরকাঁটা ঠাসা
অইখানে ঝোঁপঝাড় পাতা খসখস —
কুড়োনি মেয়ের মেঠো পাত্‌তাড়ি খাসা।(৩৬)

---

১. পূ. বা. রা-স ও কবিতা, পৃ. ২৯০

Dhaka University Institutional Repository

"পরবর্তী গ্রন্থ 'সূর্য অন্যতর'-এ এই মনোগঠনের আরো প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। 'তিতাস' নামক দীর্ঘ কবিতায় একের-পর-এক খন্ডচিত্রের সৃষ্টি করে 'নিভৃত মনের নদী' তিতাসের মাধ্যমে পূর্ববাংলার প্রাণ প্রবাহকে আবিষ্কার ও নিজের সমগ্র অস্তিত্বে তার প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা আছে —

শীতলপাটির মতো ঠিক আমাদের প্রিয় নদী
রুপালি কেশের গুচ্ছ সুচিক্কণ ঢেউ — ঢেউ যার —
তনুপর্ণা — কতো ম্লান উন্মীলিত ভাঁজে ভাঁজে তার
ডুব দাও গহীন বুকের স্বাদ পেতে চাও যদি।

মোটামুটি একই সময়ে রচিত হয় সৈয়দ আলী আহসানের তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত বহুখ্যাত 'আমার পূর্ববাংলা'। কবির মনের গভীরে দেশ সম্পর্কে তাঁর আজীবনের ধারণা, দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে দেখার অভিজ্ঞতা, দেশবাসী যেভাবে প্রকৃতি ও জন্মভূমিকে ভোগ করে ও ভালবাসে তার উপলব্ধির প্রকাশ রয়েছে এই কবিতায়। প্রকৃতি ও মানুষের মিলিত জীবন-সংগ্রাম ও ঐতিহ্যলালিত চিরায়ত মনোভঙ্গি, রসগ্রাহিতা ও আত্মউন্মোচনের বৈশিষ্ট্য এই কবিতাত্রয়ে উৎসারিত হয়েছে।

এখানে নদীর মতো এক দেশ
শান্ত, স্ফীত, কল্লোলময়ী
বিচিত্ররূপিণী অনেক বর্ণের রেখাঙ্কন
এ-আমার পূর্ববাংলা
যার উপমা একটি শান্ত শীতল নদী॥
(আমার পূর্ববাংলা : এক)

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এই চেতনা আরো পুষ্টি পায় ও গভীরতা অর্জন করে। উল্লেখিত পরিস্থিতিতে স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বেলিত হয়ে অনেকে স্বদেশ বিষয়ক কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নবীন কবিরা বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন নিজেদের চারপাশের প্রকৃতি-ঐতিহ্য ও মানুষকে বিষয় করে সাহিত্য-সৃষ্টিতে। তারা অপার বিস্ময়ে ও আনন্দে অনুভব করেছেন নিজেদের শিরা-ধমনী-স্নায়ু-রক্তপ্রবাহে স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি বিপুল মমতা ও দুর্বলতা। চিরদিনের সুপ্ত দেশপ্রীতি এই সংকটে সহসা উচ্ছ্বসিত বেগে নির্গত হয়"।[১] হাসান হাফিজুর রহমান বলেন —

আমার হৃদ্‌পিন্ডের মত
আমার সত্তার মত
আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মত
সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ
আমার দেশের আনন্দ কান্নায় তোমাতেই আমি সমর্পিত।
(অনন্য স্বদেশ, আর্ত শব্দাবলী)

আতাউর রহমান 'পূর্ববাংলা' নামক কবিতায় গ্রামবাংলার আদি ও অকৃত্রিম রূপের বর্ণনা দেন এভাবে —

---

১. পূ. বা. রা-স ও কবিতা, পৃ. ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে যাও — তুমি
দেখবে মাঠে লাঙ্গল ঠেলে চাষী
বাঁশের বেড়ার গ্রাম্য পাঠশালা
(অনাদৃত ছেলের চোখ যেন)
গ্রামের মেয়ে কলস কাঁখে যায়
নদী কিংবা পুকুরে জল নিতে
শুনবে, রাতে বাউল কীর্ত্তন
গৃহমুখী পথচারীর গান।
(পূর্ব বাংলা, একদিন প্রতিদিন)

আজীজুল হক ১৯৫৮-৬৮ সময় পর্যায়কে চিহ্নিত করেছেন ঝিনুকের প্রতীকে। আইয়ুবী সামরিক শাসনকালে মধ্যবিত্তের আত্মরুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে 'ঝিনুক' অনন্য। ঝিনুক নির্জীব আবরণে রক্ষা করে নিজেকে। অন্যদিকে এর ভিন্নমাত্রা সূর্যের প্রতীকে, যা নির্দেশ করে মুক্তি ও রক্তিম হৃদয়কে। সূর্য যেন রুদ্ধ হলো ঝিনুকের নির্জীবতায়। ক্ষুদ্রতায় এবং অন্ধকারে। কিন্তু জীবন সচেতন এবং আশাবাদী — তাই কবি এ পর্যায়টিকে চিহ্নিত করেন 'মুহূর্ত' হিসেবে। ১৯৫৮-৬৮ ধরে অন্ধকার সময় রুদ্ধসমাজ ও আত্মবদ্ধ মানুষ, কেউ কারো হৃদয়ের নাগাল পায় না,

কেবল শীতল খোলসে হাত রাখে একে অন্যে —
ঘৃণার বুদবুদ আর ক্ষোভের তরঙ্গ আর স্রোতের আবর্ত দিয়ে যাকে
সমুদ্র লুকিয়ে রাখে অতল গভীরে
তাকে প্রেম দেবে বলে ঝিনুকের ঠোঁটে
ঠোঁট রাখে সূর্যের হৃদয়;

তবু মানুষ স্বপ্ন দেখে সমস্ত অন্ধকার মাড়িয়ে — সামরিক শাসনে অবরুদ্ধ হয়েও কবি জীবনে সবুজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন দৃঢ় কণ্ঠে —

আয়ুর সীমান্তে এলে পর
তুষার তাড়িত ফল বীজের ভিতরে আনে
কী গাঢ় ইচ্ছাকে, কিছুক্ষণ রঙ মাখে
কী বিষণ্ন সবুজ শরীরে।
(ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান চৈতন্যে তাঁর নিরন্তর শুনতে পান সেই স্বদেশ সঙ্গীত — শাখায় একাকী ডাকা ব্যাকুল কোকিল, দেবদারু শিরে পত্ররেখা : স্ফীত তটিনীর তনু, মন্দ মন্দ দোলানো দখিণা — বিরল বিশ্রামে এই গান নিরন্তর চৈতন্যের শিরায় উপশিরায় বেজে চলে যেন সর্বক্ষণ —

আমার চৈতন্যে শুনি রাত্রিদিন তার ধ্বনি :
গুরু গুরু গর্জনের উল্লাসের ভাষা এক দোল খায়
চূড়ায় চূড়ায় খাদে বন্ধুর আলাপে দুর্নিবার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসমুখ খুলে খুলে শান্ত ঢেউ খরতোয়া চকিতে সহসা
প্রবল জলদমন্দ্রে তীব্রনাদী দুরন্তলীনা
উপল বন্ধন চূর্ণ দর্পাধার দৃপ্ত পদাঘাতে
(ক্ষিপ্রশোভা : বিপন্ন বিষাদ)

"স্বদেশকে উপলব্ধি করার এই আন্তরিক প্রয়াস দু'টি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি ধারায় অবলম্বিত হয় সমকালীন জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত রূপ। বিভিন্ন পর্যায়ের হতাশা ও অবক্ষয় কবিদের মনে স্বদেশ সম্পর্কে যে সামগ্রিক চিত্র তৈরি করেছিল, তাই বেদনাবোধে জারিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে অনেক কবিতায়,কখনো তাদের বক্তব্য স্পষ্ট, কখনো তির্যক। কারো-কারো কবিতায় এদেশ অচেনা-অজানা বলে উপস্থাপিত, কারো কাছে কারবালা, বিধস্ত পোড়ো বাড়ি,আবার কারো কাছে বিজন শ্মশান বা মরুভূমির চিত্রকল্পে দীপ্যমান"।[১] হায়াৎ মামুদ স্বদেশকে দেখেন বিদেশের মোড়কে —

মোড় পেরুলেই দেখি
চেনাঘর, চেনামাঠ বিদেশ বিভূঁই
হয়ে গেছে ...
এখানে ছায়াও নেই, বাবলার কাঁটা
কখনো বেঁধে না পায়ে।
(স্বদেশের ছবি : স্বগত সংলাপ)

মযহারুল ইসলাম শ্মশানের ভস্মে মুখথুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেন স্বদেশকে —

আমি আমার পূর্ববাংলাকে দেখেছি
দেখেছি সে এক শ্মশানের ভস্মে
মুখ থুবড়ে যেন পড়ে আছে
পড়ে আছে আর কালপ্রবাহে চলেছে এগিয়ে —
(একটি শর্তেই)

শস্যরিক্ত স্বদেশকে ক্ষুধার পতাকা হিসেবে উল্লেখ করেন ফজল শাহাবুদ্দীন —

এখন ফসল নেই বাংলাদেশে। হাওয়ায় ওঠে না
দুলে রাশি রাশি তৃপ্তির শিখার মতো
স্বর্ণরঙ শস্যকণা আর
খামারেতে নেই সেই আকাঙক্ষার সম্পন্ন শরীর
এবং ইদানীং
ক্ষুধার পতাকা এক উড়ছে শুধুই
বিরাট আকাশ জুড়ে আশ্বিনের সুনীল ললাটে।
(নবান্ন : ১৩৭৬)

---

১. পূ. বা. বা-স ও কবিতা, পৃ. ২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

দেশের শীতল বক্ষ পারে না দুঃখ ভোলাতে। এই দুঃখের সহযাত্রী নির্মলেন্দু গুণ এজন্যে নিজেকেই দায়ী করেন নিজে —

আমিও পারিনি ক্লেদ-জর্জর
রক্তের ছাপ বুভুক্ষার
স্বদেশের বুকে শেফালি পাতায়
রেখে দিয়ে যেতে সুনির্ভর
স্বপ্নের ধোঁয়া কুয়াশার মতো
পারিনি ছাড়াতে আকাশময়
শানিত দিনের সোনারঙ রোদে
কখনো পারিনি সজ্জল চাঁদে উড়তে।

(স্বদেশের মুখ শেফালি পাতায়: প্রে. র. চাই)

"দ্বিতীয় ধারাটি প্রাচীন ইতিহাসের সরণি বেয়ে এবং লোকজবিশ্বাস, সংস্কার ও দেশজ উত্তরাধিকারকে আশ্রয় করে শক্তি সঞ্চার করে। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, লোককাহিনী ও লোকগাথার অনেক ব্যাপারে কবিতার বিষয় হিসেবে নতুন তাৎপর্যে মন্ডিত হয়ে আধুনিক জীবনভাবনাকে প্রকাশ করে। চর্যাগীতিকার হরিণী, শবরী, মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর, বেহুলা–লখিন্দর, লোককাহিনীর রূপভান, সোনাভান, মহুয়া মলুয়া, পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে মনসামঙ্গলের কাহিনী আমাদের কবিরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। চাঁদ সওদাগরের অনমনীয় পৌরুষ ও দেবতার বিরুদ্ধে ক্ষান্তিহীন লড়াই, মৃত পতির লাশ নিয়ে বেহুলার কলার মান্দাসে চড়ে গাঙ্গুরের পথে রহস্যলোকে যাত্রা প্রভৃতি সংগ্রামী বাঙালী জাতির নির্ভরশীল প্রতীকে পরিণত হল। অনেকে উপকরণগুলোর সযত্ন পরিচর্যা করলেন। জিয়া হায়দার তাঁর বিভিন্ন কবিতায় প্রাচীন জীবনের উপকরণ ব্যবহার করেছেন; এমন কি লখিন্দর, বেহুলা, সনকা, চাঁদ সওদাগর ও মনসা নামক পাঁচটি কবিতাও রচনা করেছেন। এগুলোতে দেবতাকে অগ্রাহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রবল জীবনোৎকণ্ঠা ও আদর্শানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে —"[১]

আলস্যের ব্যভিচারে সিদ্ধকাম হে দেবতা, শোনো
জীবনে সংগ্রামে গর্বিতা এই রমণীর জীবন প্রার্থনা
আমাকে ফিরিয়ে দাও লখিন্দর — জীবনের প্রেম।

(বেহুলা : কৌটার ইচ্ছেগুলো)

কুচক্রী দেবতাকে অগ্রাহ্য করে মানবতার জয়গান গেয়েছেন 'চাঁদ সওদাগর' কবিতায় —

মানুষের প্রতিনিধি যদি আমি, এই চন্দ্র বেনে
সত্যের দেবতা ছাড়া অন্য কোনো দেবতা মানিনে।
তাই কি আমার মধ্যে লালসার পাপ এনে হায়
কুচক্রী দেবতা যতো পেতে চায় নৈবেদ্য আমার।
কিন্তু হায়, একান্ত বিশ্বাসে আমি জেনেছি কেবল
মানবীয় পৌরুষের পরাজয় নেই।

---

১. পূ. বা. বা-স ও কবিতা, পৃ. ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

এই পর্যায়ের উৎকৃষ্ট কবিতা আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন' (১৯৭০) উত্তম পুরুষের জবানীতে রচিত এই দীর্ঘ কবিতাটি চৌদ্দ স্তবকে বিন্যস্ত। কবি তাঁর প্রণয়িনীকে তাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং এই প্রসঙ্গে নিজের ঐতিহ্য, আদর্শ, স্বপ্ন ও সংকল্পের কথা একের-পর-এক উন্মোচিত করে কাবিননামা প্রস্তুত করেছেন। এই আহ্বানের মাধ্যমে অনার্য কৌম সমাজের বলিষ্ঠ জীবনবাদ, সবল পৌরুষ, তীব্র স্বাধীনতাস্পৃহা, নিঃসঙ্কোচ দেহানুভূতি, সাম্যের ঐতিহ্য ও প্রগাঢ় প্রেমাকৃতির সমন্বয়ে চর্যাপদ-মুকুন্দরাম-আলাওলের লোকায়ত বাংলা প্রাণপদ্মের মতো উন্মীলিত হয়েছে এক নবীন নায়কের মধ্যে, যার স্বপ্ন প্রেমময় শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা —

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
হিওয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখ, প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাদের পোশাকে এসো এঁটে দেই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।

(সোনালি কাবিন)

স্বদেশ-প্রেম বিষয়ক কবিতাসমূহ প্রবহমান ধারার মধ্যে ভিন্ন তাৎপর্যের। নান্দনিক বিচারেও কবিতাগুলো সফল। আবেগ ও আঙ্গিকের সম্মিলনে কবিতাগুলো শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে। এর পেছনে সম্ভবত, সেকালের পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত মানসে সৃষ্ট নতুন জাতীয়তাবাদী প্রেরণাকে অনুভব ও আত্মস্থ করতে পারার কারণটি কাজ করেছে। এভাবে সঞ্চরণের একটি উদার পরিমন্ডল লাভ করায় তাদের প্রতিভার সহজ বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কবিতাগুলোর আবেদনও তাই শুধু সাহিত্যের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকেনি; তা প্রসারিত হয়েছে রাজনীতি থেকে জনজীবন পর্যন্ত।

৩. *স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতা :*

"১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে স্বাধীনতার চিন্তা তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের মনে স্থান পায়। এই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালী জাতীয়তাবাদী শক্তি সংহত হতে থাকে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত হন এবং অনেকে ছয়-দফার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করতে থাকেন। যে-সব কবি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের রচনা নবলব্ধ এই চিন্তাচেতনা দ্বারা বিশেষভবে প্রভাবিত হয়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় রচিত কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নেই। তবে এ ধরনের কোনো কোনো কবিতায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এসেছে। এ পটভূমিতে রচিত মযহারুল ইসলামের কয়েকটি কবিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি' (১৯৭১) গ্রন্থে এগুলো সংকলিত আছে। 'একটি সূর্যের হাত ধরে' কবিতায় তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যিনি এদেশের রাজনীতিতে প্রখর উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ করে অন্ধকারকে দূর করেছেন এবং দেশবাসীর মনে আস্থা এনে দিয়েছেন"।[১]

---

১. পূ. বা. বা-স ও কবিতা, পৃ. ৩০১

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর আমরা সূর্যের আলোয় অবগাহন করে
শস্য-শ্যামল আমাদের মাটিতে
দাঁড়ালাম প্রত্যয় ও বিশ্বাসে
বাড়ালাম হাত প্রশান্ত ভরসার দিগন্তে।

অন্য একটি কবিতায় ('একটি হাত : ছয় রাগ : দলবদ্ধ কণ্ঠস্বর') তিনি পূর্ববাংলার বাইশ বছরের (১৯৪৭-৬৯) ইতিহাসকে ছয়জন যাত্রীর একটি কাফেলার রূপকে উপস্থিত করেছেন। বাহুল্য বলা যে, এটি প্রতীক অর্থে ৬ দফার সমর্থন। কাফেলাটি বাইশ বছর ধরে অবিশ্রাম হেঁটে চলেছে গন্তব্যের দিকে এবং এর পেছনে-পেছনে সর্বদা ছায়ার মত অনুসরণ করছে একটি কালো হাত — যা কখনো ষড়যন্ত্রে, কখনো কণ্ঠ চেপে ধরার অপপ্রয়াসে উদ্যত হয়ে আছে। এই পর্যায়ে সর্বশেষ কবিতাটি রচিত হয়েছে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে।

একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, যখন থেকে তাঁর মাতৃভূমিতে অত্যাচার প্রকট হয়ে দেখা দিল, তখন থেকে তিনিও স্বদেশপ্রেমে জাগরিত হলেন —

দাবানলে তোমার অরণ্যের দগ্ধ প্রশান্তি
শুকনো বিচালীর কবরে তোমার
সবুজার্দ্র ঘাসের লাশ দেখে
হে দেশ, তোমার জন্যে সঙ্কোচের শর্তাধীন
তখন থেকে আমার ভালোবাসা।
(হে আমার দেশ : বাংলা ছাড়ো)

অত্যাচার ও মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয় কবিকে অন্ধ করে দিয়েছে, নিজের শক্তির ওপর এসেছে অবিশ্বাস। এ-অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে তিনি মৃত্যুহীন জননী জন্মভূমির কাছে আশ্রয়, আশ্বাস ও নির্ভরতা প্রার্থনা করছেন —

তাই বুঝি পেতে চাই জননীর অভয় নির্ভর
হাত ধরো হে জননী, মৃত্যুহীন হে আমার ধাত্রী জন্মভূমি
আমাকে নির্ভর করো।
(আমাকে নির্ভর করো)

"বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসচারিণী বাংলার বন্দনা করেছেন তিনি 'ইতিহাসচারিণী বাংলা' কবিতায়। 'কুণ্ঠিত কৃষকের' লুণ্ঠিত মজুরের' 'লাঞ্ছিত শ্রমিকের' ও জরামারীজীর্ণ জেলে, মাঝি, তাঁতী, শোষিত, পতিত, পীড়িত, ভিখারী, ভুখারী ও অনাথের বাংলাকে ইতিহাস ও নিসর্গের পটে স্থাপন করে তিনি এর জয় ঘোষণা করেছেন"।[১] 'জয়বাংলা' শ্লোগানের চিন্তাধারা এখানে লক্ষ্য করার মতো —

নবারুণ-বর্ণিনী
রামধনু-দর্পিণী
দামিনী-সীমন্তিনী বাংলা,
পর্বত-অঙ্কিনী

---

১. পূ. বা. রা-স ও কবিতা, পৃ. ৩০৩

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্র-সঙ্গিনী
নিসর্গ-নন্দিনী বাংলা :
জয় জয় জননী বাংলা।।

অনুরূপভাবে যুগচেতনার ভিত্তিভূমি নিত্যভূমি বাংলাকে তিনি বন্দনা করেছেন 'গরবিনী' কবিতায়। বাংলার বিদ্রোহী তরুণেরা মা-জননীর গর্বের কারণ —

সেই মাকে যার হাজার হাজার
মা-নাম-ডাকা পাগল ছেলে
মায়ের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে
ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে।
(গরবিনী মা-জননী)

পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালীদের একাত্মতার স্বপ্ন যখন মিলিয়ে গেল, প্রীতির বিনিময়ে বাঙলীরা যখন পেল প্রতারণা; খরা ও হতাশা যখন স্থায়ী হতে শুরু করলো, তখন শেষবারের মতো এদেশের মানুষ মাথাচাড়া দিয়ে ডাক দিল — তোমরা বাংলা ছেড়ে যাও।

কাজ কি দ্বিধার বিষণ্নতায়
বন্দী রেখে ঘৃণার অগ্নিগিরি।
আমার বুকেই ফিরিয়ে নেবো
ক্ষিপ্ত বাজের থাবা;
তুমি আমার জলস্থলের
মাদুর থেকে নামো,
তুমি বাংলা ছাড়ো।
(বাংলা ছাড়ো)

এর ফলে এদেশের কালো রাত শেষ হতে চলল। নিশাচর বাদুড়, প্যাঁচা, শকুন ও শেয়ালের অমঙ্গল ধ্বনি অবসিত হ'তে থাকলো, স্পষ্ট হয়ে উঠলো নতুন প্রভাতের ইশারা —

ঘুমিয়ে থাকা দেশের মানুষগুলো
হঠাৎ যখন বন্ধ চোখের জানলা দুয়ার খুলে
অনুভূতির আলোয় মোছে
অচেতনার ধুলো
আঁধার ভেঙে এগিয়ে আসে
নতুন ভোরের চাকা
রাত্রি পড়ে ঢাকা।
(তখন রাত্রি শেষ)

Dhaka University Institutional Repository

"এই কবিতাগুলোর গুরুত্ব শৈল্পিক কারণে নয়। শিল্প-বিচারে এগুলো হয়তো উৎকৃষ্ট নয়। এর অন্যতম কারণ সম্ভবত এই যে, অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল উত্তেজনামুখর পরিবেশেই এদের সৃষ্টি। কবিরা আবেগের তুঙ্গ মুহূর্তে এগুলো রচনা করেছেন, আবেগকে সংহত করার সুযোগ তাঁরা পাননি। কিন্তু কবিতাগুলোর গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এবং তা রাজনৈতিক কারণে অপরিসীম। পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতির বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে, যখন দেশের সমস্ত আবেগ একটি মাত্র লক্ষ্যে স্থির হয়েছিল, তখন কবিরাও তাতে যথাসাধ্য সাড়া দিয়েছিলেন। তার স্বাক্ষর বহন করছে এই কবিতাবলি"।[১]

৪. *পাকিস্তান–বিরোধী ব্যঙ্গ কবিতা :*

একদিকে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মনে বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকাশ লাভ করছিল, অপরদিকে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল পাকিস্তানীবাদের আবেদন। আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববাংলার অ-সংলগ্নতা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচী এ প্রদেশবাসীর কাছে প্রতিকূল ও তাৎপর্যহীন বলে প্রতিভাত হয়। সমাজের বিভিন্ন দিকে ব্যাপ্তি লাভ করে দুঃশাসন, হতাশা ও বিপর্যয়। পূর্ববাংলার প্রতিনিধি হিসেবে আইয়ুব খান যাদের মনোনীত করেছিলেন তারা ছিলেন অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় চরিত্রের লোক ও দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন। এই অস্বচ্ছ, জটিল রাজনৈতিক অবস্থা, মূল্যবোধের বিপর্যয়, অসৎ নেতৃত্বকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছিল বেশ কিছু কবিতা। এ ধরনের কবিতার প্রথম সংকলন হচ্ছে মযহারুল ইসলামের 'আর্তনাদে বিবর্ণ' (১৩৭৭) গ্রন্থের পূর্বকথায় বলা হয় : "'আর্তনাদে বিবর্ণ' গ্রন্থের কবিতাগুলো বিগত দশকের রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত। ... পূর্ববাংলায় বিগত দশকের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলা দুরূহ ছিলো। আমাকে তাই ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল"।[২] ফজলুল কাদের চৌধুরী ও খান আবদুস সবুর খান ছিলেন আইয়ুব খানের দুই প্রধান বাঙালী পার্শ্বচর। একই কাব্যে তারা বজলু চাচা ও সবুরভ খান নামে অভিহিত হয়েছেন। 'দাঁতভাঙ্গা খান' কবিতায় সবুর খানের কীর্তি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে —

পিন্ডির প্রস্তরে ভেঙ্গে সব দাঁত
সবুরভ খান তাঁর খুলেছে বরাত।
বাঘের দেশের সেই খান সবুরভ
সত্যি তো বাংলার বড় গৌরব।
(দাঁতভাঙ্গা খান)

কেন্দ্রে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে এদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। পরস্পরের ওপর টেক্কা দিয়ে আইয়ুব খানের কাছে অধিকতর প্রিয় পাত্র হবার জন্যে উভয়ে চেষ্টা করতেন। ফজলুল কাদের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে খেতাব পেলে সবুর খানও নানাভাবে চেষ্টা ক'রে সেটা সংগ্রহ করেন। ঘটনাটি একটি কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে —

চট্টগ্রামের দন্তবিহীন বলদ সেবার
যেই না পেল খেতাব

---

১. পূ. বা. বা-স ও কবিতা, পৃ. ৩০৪
২. মযহারুল ইসলাম, ভূমিকা, আর্তনাদে বিবর্ণ (১৩৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা জেলার বাঘা কুকুর ভাবলো মনে
সইব কিসে এ তাপ
(বেতাব)

"প্রদেশপাল মোনায়েম খান ছিলেন এই অঞ্চলের আইয়ুব খানের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কাব্যে তিনি 'ছোট খান' নামে অভিহিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ছিলেন ছোট খানের একমাত্র ভরসা এবং তিনি সেকথা প্রচার করতে দ্বিধা করতেন না। আইয়ুব খান যতোদিন ক্ষমতায় থাকবেন ততোদিন তাঁকে কেউ প্রদেশের ক্ষমতা থেকে সরাতে পারবে না — তাও তিনি গৌরবভরে প্রকাশ করতেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় তাঁকে সরিয়ে নেয়া হয়; এমন কি তাঁকে গোপনে সপরিবারে পূর্ব বাংলা ছেড়েও চলে যেতে হয়"।[১] এতে তিনি মনে যে দুঃখ পান, এই ঘটনা বিষয় হয়েছে একটি কবিতায় —

ছোট খান তাই হতে রেখে বক্ষ
চরণের নীচে নেই অধীনের চিহ্ন —
কোথা গেল বড় খান, কে করিবে রক্ষা
দেশ থেকে চিরতরে মূল আজ ছিন্ন
(ছোটখান সংবাদ)

কাব্যের প্রধান চরিত্র আইয়ুব খান। কয়েকটি কবিতা তাঁকে নিয়ে লেখা, অন্য কয়টিতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে এসেছেন। তাঁর উপাধি বড় খান। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার দুর্বলতার কথা বললে তিনি অভয় দিতেন যে, ভারত পূর্ব বাংলা আক্রমণ করলে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ দিল্লী পর্যন্ত ধাওয়া করবে। ভারতীয়রা একথা জানে বলে তারা পূর্ব বাংলা আক্রমণ করবে না সুতরাং এ-এলাকার আলাদা রক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই এই অদ্ভুত প্রতিরক্ষানীতি বিষয় হয়েছে 'হুজুরের সমীপে' কবিতায় —

গোঁফ বাঁকিয়ে হাত ঘুরিয়ে
বলেন হুজুর মুচকি হেসে
ভয় কি হেথায় লাগলে আগুন
হোথায় দেব জোরসে কোপ,
কাশের জোরে এ-অঞ্চলের
আগুন যদি না-ই সে থামে
হোথায় দেব ছিটিয়ে জবর
পানির ধারা ডাইনে বামে।
'সাবাস হুজুর' — চেঁচিয়ে ওঠে
ভক্ত সকল চক্ষু বুজে
এমন মহৎ অভয় বাণী
বিশ্ব জুড়ে পাইনি খুঁজে।

১। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

এ জাতীয় নোংরা নেতৃত্বের প্রভাব সামগ্রিকভাবে দেশের সমস্ত দিককে স্পর্শ করেছিল। সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়েছিলো রাজনীতিতে। কোনো ধরনের সুস্থ নীতির অনুসরণ এখানে ছিলো না। কর্তাকে ভজন করাই ছিলো উন্নতির মাপকাঠি। একটি কবিতাতে এই প্রসঙ্গ এসেছে — এক শিষ্য গুরুর কাছে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হবার অনুমতি ও উপদেশ প্রার্থনা করছে। গুরু তাকে পরামর্শ দিচ্ছে এভাবে —

প্রথমে তুমি দিবস রাতি কোশেব করে ডিগবাজি
শিক্ষা কর বছর খানেক হুনুর কিকির কারসাজি,
দ্বিতীয়ত খাঁটি না হয় ভেজাল মাখা মন চালিস
তৈল কিনে রপ্ত কর চরণ কিংবা শির মালিশ,
ডিগবাজি আর তৈল মাখিয়ে যখন হবে ওস্তাদি
লাফিয়ে পড় রাজনীতিতে মাভৈ বলে বুক বাঁধি।

"সিকানদার আবু জাফরের 'বৃষ্টিকলগ্ন' (জানুয়ারি ১৯৭১) এ ধরনের একটি ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন। কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয়, বরং পাকিস্তানের বিচিত্র সমাজব্যবস্থা ও ক্ষমতাসীন শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হয়েছে। পাকিস্তান তার কাছে একটা 'অবাক দেশ' বলে প্রতীয়মান হয়েছে, কেননা এ-দেশের রীতি-নীতি সব কিছুই অবাক করার মতো। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নিয়মকানুন এদেশে ব্যর্থ হয়ে গেছে। অবাক দেশের জাতীয় সঙ্গীত, অবাক দেশের নাম সঙ্গীত অবাক, দেশের বিলাপসঙ্গীত, অবাকদেশের প্রেম সঙ্গীত ও অবাক দেশের সাধনসঙ্গীত — এই পাঁচটি কবিতাতে সে-দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর-পরই গোলাম মোস্তফা একটি কবিতায় লিখেছিলেন যে, পাকিস্তানে কোনো কিছুরই অভাব নেই। সিকানদার আবু জাফর লিখেছেন, এই অবাক দেশে সবকিছু সাজ-সজ্জা গলায় হুক্কাহুয়া রব, মুরগীর আন্ডা ষাঁড়ের ডান্ডা, গাভীর বাছুর, বালিশ-কাঁথা-মানুষ 'হাঁক-ডাক-জাঁক, ঢাক ঢোল-ভোল, মাথা ভরা টাক, বিশাল পেটের ঢাক, ইমানদারীর বর্ম, ঠাট ঠমক, নড়বড়ে ঘাট, চোর-ডাকাত-শ্মশান-গোর, কাল-যম-শূল-শাল আছে, কিন্তু নেতাদের মাথার খুলিতে এক ছটাকও ঘৃত নেই। অবাক দেশটি তবু স্বাধীন বলে গর্ব করে"।[১]

মূল গায়েন : এমন স্বাধীন কে আর আছে।
সকলে : এমন স্বাধীন কে আর আছে।
সব আছে ভাই সব আছে
গরজ মত গলায় গলায়
হুক্কাহুয়া রব আছে

(অবাক দেশের জাতীয় সঙ্গীত)

আইয়ুব খানের শাসনের শেষ দিকে প্রচুর রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে অনেক ছাত্র-শ্রমিক-সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। যারা ক্ষমতাসীন ছিল তারা জনসেবক না হয়ে নরঘাতক রূপে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে রচিত হয়েছে 'অবাক দেশের নামসঙ্গীত'।

---

১. পূ. বা. রা-স ও কবিতা, পৃ. ২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

ছিঁচকে চোরে পূর্ণ সে দেশ
দস্যুদলে ভরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি।
পুণ্যভূমি হক বা না হক
সে যে বধ্যভূমি
সে যে তোমার বধ্যভূমি
সে যে আমার বধ্যভূমি।

'ইতিহাসের নীলাম' কবিতায় তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসকদের পতনের। পাকিস্তানের শাসকেরা নানাভাবে একুশে ফেব্রুয়ারির আদর্শকে ধূলিমলিন করতে চেষ্টা করতো, কখনো সরাসরি কখনো মিত্রবেশে। কবি বলেছেন যে, যারা সেদিন প্রাণ দান করেছিলেন, তাদের আত্মদানে অনেক তরুণ জন্ম নিয়েছে এবং তাঁরা দিগন্তে কালবোশেখীর ইঙ্গিত নিয়ে আসছে। সেই ঝড় মহারাজদের মাথার তাজকে ধূলায় নামিয়ে আনবে। এই কবিতাটি ব্যঙ্গ-কবিতার আদলে রচিত হলেও এতে গাম্ভীর্য এসে গেছে অনেক —

মুখ লুকাবে
জায়গা কোথায়
এত চোখের ভীড়ে
ইতিহাসের সর্বনাশা নীলাম ডাকে আজ
ধুলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে
নকল সোনার তাজ।

"'আর্তনাদে বিবর্ণ' ও 'বৃশ্চিকলগ্ন' সংকলন দু'টোতে পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থার বিবিধ অসংগতি ও নেতিবাচক দিকগুলো ভালভাবে ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। প্রথমটিতে সাধারণভাবে খন্ডচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে — কবিতাগুলো লিখিত হয়েছে বিশেষ গোষ্ঠি বা ব্যক্তিকে সামনে রেখে। কবির নিরাসক্তি এখানে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। কবির পক্ষে বলা যেতে পারে যে, এক উত্তেজনামুখর সময়ে সেগুলো রচিত হয়েছিল। লক্ষ্য ছিলো সেকালের চাহিদা পূরণ; কালোত্তীর্ণ হওয়া নয়। একটি বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে ভাঙার কাজে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ফলে নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা — তাও বিচার্য। এর তুলনায় দ্বিতয়টি ভিন্ন স্বাদের ও উন্নততর শিল্প-মেজাজের। এতে বিষয়ীভূত হয়েছে সামগ্রিক পরিবেশের অসংগতি, বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নয়। পাকিস্তানের মত অবাক করা দেশের কান্ড-কারখানায় কবির সহজ কৌতুক- প্রিয়তা উছলে উঠেছে — যার ফসল এই কবিতাগুলো"।[১]

---

১. পূ. বা. বা-স ও কবিতা, পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র বিতর্ক

১৯৪৭-এর ভারতবিভাগ একটা রাজনৈতিক ঘটনামাত্র ছিল না; সুদীর্ঘকালের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের অনিবার্যতায় তার কার্যকারণ ছিল আরো গভীরে নিহিত। দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন বাঙালীর অখন্ড জাতীয় চেতনার মর্মমূলে যে-ক্ষত সৃষ্টি করে, তার সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক পরিণাম ফলেরই দৃষ্টান্ত এই বিভাজন। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য মনে রেখেও বলা যায়, '৪৭-এর ভারত বিভাগে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি বিপন্ন হয়েছিল। পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভৌগোলিক মানচিত্রের সঙ্গে পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচস্থানের রাষ্ট্রনৈতিক অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক নিয়মেরই বিরুদ্ধাচরণ। এই অসঙ্গত রাজনৈতিক বিন্যাসের ফলে বাঙালী জাতির স্বাভাবিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডও ব্যাহত হয়েছে বারবার। ভাষা প্রশ্নে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চূড়ান্ত সাক্ষ্য বহন করে। এই আগ্রাসন স্বাভাবিক সামাজিক অগ্রযাত্রাকে এমনভাবে বাধাগ্রস্ত করেছিল যে, এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক বিতর্ক প্রক্রিয়ায়। পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-বিতর্কের প্রথম সূত্রপাত ১৯৪৮ সালে। সম্ভবত ঢাকা জেলের কম্যুনিষ্ট বন্দীরা নিজেদের মধ্যে এর সূত্রপাত করেছিলেন। মার্কসীয় দৃষ্টিতে নতুন করে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন কোন কোন কমরেড। তাঁদের মত ছিল রবীন্দ্রনাথ মূলত বুর্জোয়া লেখক। নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা ও তার সৃজনে রবীন্দ্রসাহিত্যের কোন অবদান নেই। ধনঞ্জয় দাসের "আমার জন্মভূমি স্মৃতিময় বাংলাদেশ"-এ দেখা যায় বেশির ভাগ কমরেডই অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে উগ্রবামপন্থী ঝোঁকের বশে বাতিল বলে গণ্য করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে মূল্যায়ন করে তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকাকে চিহ্নিত করেন এবং তাঁকে আমাদের ঐতিহ্যের এক মহান উত্তরাধিকার বলে রায় দেন'।[১]

জেলের বাইরেও এই বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ঢাকা প্রগতিলেখক ও শিল্পী সংঘের কয়েকজন সদস্য এ ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, আবদুল্লাহ আল মুতী ও অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ। এরা সকলেই সেই সময়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কিত ছিলেন। অজিত কুমার গুহ বাদে অন্য তিনজন সলিমুল্লাহ হলে আয়োজিত এক সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়া লেখক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই ক্ষুদ্র উপদলের মুখ্য প্রতিনিধি হিসেবে আখলাকুর রহমান রবীন্দ্রনাথের 'ভারত তীর্থ' কবিতা থেকে

> "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
> সেথা হতে সবে আনে উপহার
> দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে —
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"।।

"এই অংশটি উদ্ধৃত করে বলেন যে, কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বস্তুত, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভারত অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং সেই হিসেবে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা মূলত প্রতিক্রিয়াশীল।

---

১. বদরুদ্দীন উমর, পূ. বা. ভা. আ. ও ত. রাজনীতি, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তীব্র ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেন। আখলাকুর রহমানের এই বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি অজিত গুহ তার উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্যান্য উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সাহিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও আখলাকুর রহমানের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বক্তৃতা দেন।

সলিমুল্লাহ হলের এই সাহিত্য সভার পর লেখক সংঘের অভ্যন্তরে অজিত গুহের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং লেখক সংঘের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের সামনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুল বক্তব্য হাজির করার জন্য তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে একটা শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।"[১]

এই লেখক সংঘের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বও রবীন্দ্রনাথকে আখ্যায়িত করেন প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়া লেখক হিসেবে। তবে অল্প সময়ের ব্যবধানে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছিল। "১৯৫১ সালে তিনি রবীন্দ্রবিরোধী চক্রের প্রতি উচ্চারণ করেন কঠোর হুঁশিয়ারি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে বাঙালি জাতিকে যে বঞ্চিত করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল সে সম্পর্কে তাঁর মধ্যে সংশয় ছিল না।[২] "মুনীর চৌধুরীর এই বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, দেশের তৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের উগ্র মার্কসীয় মূল্যায়ন ক্ষতিকর। এই মূল্যায়ন থেকে প্রতিক্রিয়াশীলরাও সুযোগ নেবে। এবং সে কাজটি যে শুরু হয়ে গেছে তা উপলব্ধি করেই মুনীর চৌধুরী সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।"[৩]

এরপরেও রবীন্দ্রনাথকে বর্জন এবং অস্বীকার করার কথা এলো সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্রেক্ষিতে থেকে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দর্শন, আদর্শ এবং সংহতির জন্য প্রয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে হবে এই বক্তব্য রাখলেন সৈয়দ আলী আহসান। "নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারা খুঁজবো। সে সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি।"[৪] পরবর্তীকালে তিনিই উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এই স্ববিরোধিতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ড. আহমদ শরীফের মধ্যেও। ষাটের দশকের রবীন্দ্রবিতর্কের চরম পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, "কবি মনীষী রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাবান করে তুলবার সাধনাই করেছেন, কল্যাণ ও সদ্বুদ্ধিপ্রসূত স্বেচ্ছাসম্মতিদানে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানব-কল্যাণকামী স্বেচ্ছাসৈনিক। তাঁর এই জীবনদৃষ্টিকে বুর্জোয়া উদাহরণ ও দাক্ষিণ্য বলে উপহাস করা অসৌজন্য।[৫] বিবর্তিত সমাজ-পটভূমিতে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, সম্পদ নন। এবং তাঁর সাহিত্য আমাদের জন্যে বর্তমানে আর অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে না।"[৬]

---

১. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (পৃঃ ১৭৬-৭৭ প্রঃ খঃ
২. সরলানন্দ সেন, ঢাকার চিঠি (প্র. খ.) ১৯৭১, মুক্তধারা, কলিকাতা, পৃঃ ৭৬
৩. শামসুজ্জামান খান, নানা প্রসঙ্গ, বাঙলা একাডেমী ১৯৮৩, পৃ. ১০৯
৪. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বপাকিস্তানের বাঙলাসাহিত্যের ধারা
৫. আহমদ শরীফ, মতলবীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিন্তা পৃ. ৭৭
৬. শামসুজ্জামান খান, নানা প্রসঙ্গ, বাঙলা একাডেমী, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিতর্কের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে। ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবনে আহূত শিল্পী, সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্রদের এক সভায় পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়। বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ ও ড. খান সারওয়ার মুর্শিদ এই কমিটির যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের কক্ষেও এই কমিটির কয়েকটি সভা হয় এবং এতে বিস্তৃত কর্মসূচী তৈরি করা হয়। এই কমিটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিট্যুটে শতবার্ষিকীর উৎসব উদযাপন করেন।[১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের উদযোগে এগারোই বৈশাখ কার্জন হলে প্রধান অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সকল রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে অবস্থিত মহান কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দ্বিতীয় দিনের আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস.এম. মুর্শেদের (১৯১১-৭৯) সভাপতিত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির অনুষ্ঠান হয়েছিল চারদিনের। এ অনুষ্ঠানের আলোচকরা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বিশ্বমানবের বিশেষ সম্পদ বলে বর্ণনা করেন এবং মতবাদ-আকীর্ণ আধুনিক বিশ্বে কবির চিন্তাধারা উপকারে আসতে পারে বলে মন্তব্য করেন।[২]

শতবার্ষিকী উৎসবের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল মহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দেশে তখন আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসন চলছে। প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীরা সামরিকচক্রের যোগসাজশে শতবার্ষিকী উৎসব পন্ড করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সরাসরি আঘাত করা ঠিক হবে না মনে করেই প্রতিক্রিয়াশীলদের দিয়ে পাল্টা সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট খোলা হয়। এরা ঢাকা জেলাবোর্ড হলে এক সভা ডেকে রবীন্দ্র-কুৎসার আসর জমায়। এই ফ্রন্টের কর্মীরা ও তাঁদের মুরুব্বিরা নামে বেনামে পত্র-পত্রিকায় দেদার লিখতে শুরু করেন। দৈনিক আজাদ এদের মুখপত্রে পরিণত হয়। অন্যদিকে ইত্তেফাক, সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রগতিশীলদের বক্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে। ১লা বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'দৈনিক আজাদ' সবাইকে সাবধান করে দেয় —

"সোজা কথায়, রবীন্দ্র দোহাই তুলিয়া অখন্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক জীবনের বিপদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না।"[৩] ১২ইং বৈশাখের 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে শোহেনদার' ডাকের সমান এবং এ ডাকে সাড়া দিলে তার নিশ্চিত মৃত্যু।' দু'দিন পরে আরো একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিলেন বিরূপ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণু। এগুলো ছাড়াও বৈশাখ মাসের মধ্যে আরো তেইশটি প্রবন্ধ ও অনেক চিঠি আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের অধিকাংশ বক্তব্যে নানাভাবে ও নানা যুক্তিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা, মুসলমানদের নিকট এর অগ্রহণযোগ্যতা এবং শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্যোক্তাদের পাকিস্তান-বিরোধী মানসিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন মূলত এই দলের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁর বক্তব্য অন্যদের মত স্থূলভাবে উপস্থাপিত হয়নি। 'সমকাল' রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক

---

১. শামসুজ্জামান খান, নানা প্রসঙ্গ, বাঙলা একাডেমী পৃ. ১২৬

২. দৈনিক আজাদ, ৮ই মে, ১৯৬১

৩. রবীন্দ্রনাথ ও মাওলানা আজাদ, দৈঃ আঃ ১লা বৈশাখ ১৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

সত্তার প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করেও রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে সাহিত্যিক বিবেচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, "যে বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা গর্ব করি রবীন্দ্রনাথের কাছে তার ঋণ অপরিসীম, এ সত্যটি যেন কখনই ভুলে না যাই। বাংলা ভাষাকে তিনি নিজের সাধনার দ্বারা মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। ... রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের যা অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে ঘরের নিভৃতে হয়তো আলোচনা করা যায়, কিন্তু দুনিয়ায় জাহির করার মত কিছু থাকে না।[১]

পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্র-বিতর্ক স্পষ্ট প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীল দু'টি অবস্থান নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। এই সরাসরি মোকাবিলার ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং বিভাগীয় শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত প্রয়াসে ১৯৬৩ সালে বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলাভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে বাংলাদেশের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে একটা গর্ববোধ জেগে ওঠে। ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সপ্তাহ যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে — তা বাঙালীর ভাষাও সংস্কৃতিগত চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। আর এখানেই তারা রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে রবীন্দ্রনাথের গানের আবেদন বেড়েছে শিক্ষিত সমাজে তাঁর সাহিত্যও পঠিত হয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি — এমন কি তাঁর কবিতার লাইন ব্যবহৃত হয়েছে সুদৃশ্য পোষ্টার আর রাজপথের জঙ্গী মিছিলের প্লাকার্ডে, ফেস্টুনে। এ যেন এক নতুন পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি ঘাবড়ে দিয়েছে পাকিস্তানী শাসকদের।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়। যুদ্ধের পরে জনগণের দাবীর ফলে সরকার বাধ্য হয় বেতারে পুনরায় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার করতে। কিন্তু এটা ছিলো সরকারের নিতান্তই কৌশলগত অবস্থান। ১৯৬৭ সালেই তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় ভাবধারা ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারিত হবে না এই মর্মে বক্তব্য রাখেন। "রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারিত হবে না।" এই শিরোনামে ২৪শে জুন ১৯৬৭ তারিখে একটি খবর প্রকাশিত হয় জাতীয় দৈনিকে।[২]

পরদিন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা বাংলা ভাষায় পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। সরকারি নীতি-নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।[৩]

বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ সরকারি সিদ্ধান্তের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। এ ভাবেই বিভাগোত্তর সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী রবীন্দ্রনাথ পরিণত হয়েছিলেন একটা আন্দোলনের উৎসভূমিতে, বাঙালী জাতিসত্তার পুনরুজ্জীবনের ধারাবাহিকতায় তিনি সংলগ্ন ছিলেন অখন্ড চৈতন্যের বিশালতায় ও ঐশ্বর্যে।

---

১. মাসিক সমকাল, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৬৭৬
২. দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে জুন, ১৯৬৭
৩. দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে জুন, ১৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

এক দশকেরও অধিক কালব্যাপী রবীন্দ্র-বিতর্কের মূল্যায়নে সমালোচক অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ বলেন, "শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবত, পূর্ববঙ্গে সাধারণের মধ্যে সর্ব প্রথম একটি জীবন্ত সত্তায় পরিণত হন। এই উৎসব উপলক্ষে একদিকে প্রদেশব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর একটি পরিমন্ডলের কাছে পরিচিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে জনপ্রিয় হন। অন্যদিকে পত্রপত্রিকাকে আশ্রয় করে এ সময়ে সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক দু'দলের মধ্যে বিতর্ক ও বাকযুদ্ধ চরমে পৌঁছে। এই বিতন্ডাকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকার পাঠকরা যাঁরা অন্যথায় সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী নন, তারাও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন।[১]

বিভাগোত্তর সময়-কালের অব্যবহিত পরেই যে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আন্দোলন, রক্তপাত ও বিক্ষোভ জাতীয় জীবনে অপরিসীম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো — এদেশের কবিরাও তার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছেন, কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের সেই আবেগ, সংক্ষোভ, প্রতিবাদ, দুঃখ-বেদনা, জয়-পরাজয়ের আনন্দ ও গ্লানি।

আমাদের আলোচ্য পর্বের কবি আহসান হাবীব রবীন্দ্রবিতর্কের সময়ে যদিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর করেছিলেন তবুও তাঁর 'পঁচিশে বৈশাখ' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেন এক মহামানব হিসেবে। শিল্পের সকল শাখায় যাঁর বিচরণ, বৃত্ত ভেঙে, দেয়াল ডিঙিয়ে যিনি মানুষের অন্তর্লোকের গূঢ় মন্ত্র উচ্চারণ করেন মানবসভায়; এমন কি কবিতার শরীর যিনি সমৃদ্ধ করেন আত্মার বৈভবে — সেই চিরকালের কবিকে লক্ষ্য করে তিনি উচ্চারণ করেন —

কবিতায় সঙ্গীতে এবং চিত্রে
কি আশ্চর্য দক্ষতায়
সহজে নির্মিত হলো কি বর্ণাঢ্য সম্পন্ন বাগান, যার
ফুলে ও ফসলে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি
তৃষ্ণার্ত মানব।
(পঁচিশে বৈশাখ)

সৈয়দ আলী আহসান পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির প্রশ্নে যিনি রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের পক্ষে মতবাদ রেখেছিলেন পরবর্তী সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের উপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। এবং রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতায় মহান মহিমাময় আকাশের সঙ্গে তুলনা করেন তাঁকে —

একদিন আশ্চর্য উষ্ণতায়
শব্দের ঐশ্বর্য পেয়েছি
অতি পরিচিত শব্দ হঠাৎ সমুদ্র হয়েছে
এবং আমার সমস্ত আগ্রহ
চিলের মতো ডানা মেলেছে
এ-সব সত্য ইতিমধ্যেই ইতিহাস

---

১. গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, পৃ. ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

এখন আবার আমার শব্দে
নতুন স্বাদ আসছে —
নতুন মৃত্যু, বিচার, পদচারণা এবং বিশ্বাস
তুমি অমৃত্যুর সাধনায় এসব সম্ভাবনাকে প্রদীপ করেছ
তাই তুমি আমার আকাশ
এবং শব্দের পরিসরে হৃদয়ের নীলাম্বর।
(রবীন্দ্রনাথকে)

কাব্যজীবনের শুরুতেই আবুল হোসেন রবীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লিখেছেলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠির জবাবে স্নেহ-আশীর্বাদ সহযোগে তরুণ কবির কাব্যজীবনের সফলতা কামনা করেছিলেন। সেই মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত এই কবিতায় —

... হে কবি সম্রাট,
সেদিন পাঠিয়েছিলে মোরে তব স্নেহ-আশীর্বাদ।
হয়তো সে তব লঘু বৃদ্ধের কৌতুক, অথবা সে
ক্ষণিকের আকস্মিক দুর্বলতা অবচেতনার।
তবু আমি তাহারেই আমার বসন্ত-অবকাশে
গনিয়াছি বার বার তব বসন্তের আশীর্বাণী,
জানিয়াছি সুন্দরের তীর্থ পথে তাহারে আমার
পরম পাথেয় বলে, তাহারেই শ্রেষ্ঠ পাওয়া মানি।
(রবীন্দ্রনাথ)

পাঁচটি স্তবকে রচিত দীর্ঘ কবিতায় সমাজ-সংসারের পটভূমিতে এবং প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে মিলিয়ে পত্রালি সবুজ তৃণে, মালঞ্চের মালাকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করেছেন সানাউল হক। শতাব্দী-পরিক্রমায় অনেক উজান পথ অতিক্রম শেষে একজন কবি আবিষ্কার করেন অন্য কবির যোগ্য সম্মান। তখন—

সম্প্রতি কি সংস্কৃতির প্রতীতি নিষ্ঠায়
বুকে বুকে আঙুল-ডগায় বিদ্যুৎ ব্রততীস্পর্শ
নাড়ীতে নাড়ীতে সাড়া।
(একটি শতবার্ষিকী)

রবীন্দ্র-বিতর্কের এই সময়টাকে কৃতঘ্ন রাতের মতো অন্ধকারে ডুবে যেতে দেখেন আবদুল গণি হাজারী। এবং সময়ের বিনষ্ট ঝালরে তিনি শুনতে পান চতুর্দশ পুরুষের একটি দুর্বোধ্য তিরস্কার। দিন যায় রাত আসে, দিনগত পাপক্ষয় হয় — তবু পিতৃদত্ত আত্মার বিলাপ যেন শেষ হয় না কোনোদিন। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন কবিকে নিয়ে আমাদের এই নির্লজ্জ আচরণ — জাতিসত্তার এ বৈষম্য, ভেদরেখা — এ যেন আত্মহননের সামিল।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের লজ্জা নেই সম্ভ্রমের মাথা
কেটেছে মসৃণ হয়ে বিশেষজ্ঞ সুহৃদের সুকৌশল মারের
তবু এই জীবনের অকৃপণ হাত থেকে
প্রকাশ্যে গ্রহণ করা পরাজয় সে আমার নয় হে মহাপুরুষ, তাই
আত্মহননের পথ ঘৃণায় এড়িয়ে চলি
সিদ্ধান্তের দারুণ অভাবে।

(তিরস্কার)

সুখে-দুঃখে, সংঘাতে-আনন্দে জীবনের বহু বঙ্কিম প্রতিঘাতময় পথে ব্যক্তিমানুষের একমাত্র আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ। এই বোধে বিশ্বাসী আতাউর রহমান তাঁর সুদিনে, দুর্দিনে, রাত্রির অন্ধকারে, বৈশাখের ঝড়ে বর্ষার পিচ্ছিল পথে, এমনকি রক্তচক্ষু চৈত্রের দুপুরেও অব্যাহত দুর্নিবার 'রবীন্দ্র-অভিসার'-এ বের হন পথে পথে শত্রুদের পাতা মাইনকে উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে যান তাঁর সৃষ্টির কাছে। তখন —

মনে হয় তোমার কবিতা
চুরি করা প্রণয়ের দুর্লভ চুম্বন,
তাই তার আকর্ষণ
তাড়া করে ক্ষুধিত সত্তাকে সর্বদাই,
তাই তার অভিসার সুদিনে দুর্দিনে
রাত্রির অন্ধকারে বৈশাখের ঝড়ে
বর্ষার পিচ্ছিল পথে, রক্তচক্ষু চৈত্রের দুপুরে
অব্যাহত দুর্নিবার —
পাগলাঘন্টি সাইরেন যতই বাজুক
যতই পাতানো থাক শত্রুদের মারণ মাইন।

(রবীন্দ্র-অভিসার)

'সূর্যাবর্ত' কবিতায় শামসুর রাহমান রবীন্দ্রনাথকে তুলনা করেছেন সূর্যের সঙ্গে। সূর্যের আলো যখন পৃথিবীতে ঠিকরে পড়ে তখন সে আলোতে পৃথিবীর সবকিছুই যেমন স্নাত হয় তেমনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পাঠে আমরা স্নাত হই, 'বিশুদ্ধ হই'। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দিয়ে তাকে বর্জন করে লাভ নেই। কারণ —

পিচ্ছিল শবের ভোজে মত্ত কৃমি অথবা আজানে
উচ্চকিত সবচেয়ে উঁচু কোনো উজ্জ্বল মিনার —
সবাই অলক্ষ্যে পায় সূর্যের প্রসাদ
সম পরিমাণে :
এবং উদার সূর্য উপমা তোমার।

(সূর্যাবর্ত)

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই আমরা ঋণী তাঁর কাছে, আমরা ঋণী তাঁর ভাষার কাছে —

আমাকে দিয়েছো ভাষা, সে ভাষা আমার
হৃদয়ের একান্ত স্পন্দনে
প্রাণের নিভৃত উচ্চারণে
শিখা হয়ে জেগে রয় জীবনের মুক্ত দীপাধারে
(সূর্যাবর্ত)

ষড়ঋতুর স্বাদে-গন্ধে, প্রকৃতির শস্য-শ্যামল বৈচিত্র্যে ও রৌদ্রের তাপে, জ্যোৎস্নার মদির মায়ালোকে জীবন যেমন জীবনেরই অজ্ঞাতে সহজাত স্বভাবে বেঁচে থাকে — তেমনি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে প্রতিধ্বনি হয়ে জেগে থাকে আমাদের সত্তার আকাশ :

যেমন রৌদ্রের তাপে জ্যোৎস্নার মদির মায়ালোকে
হাওয়ার নির্ঝরে
অথবা শ্রাবণে
অক্লান্ত বর্ষণে বেঁচে থাকি মাঝে-মাঝে
নিজেরই অজ্ঞাতে
তেমনি তোমার
কবিতায় গানে প্রতিধ্বনি হয়ে জাগে
আমাদের সত্তার আকাশ।
(সূর্যাবর্ত)

তারপরও জীবন যখন ক্রমে কেবলি শুকিয়ে যায়, সাংস্কৃতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ায় বাঙালী জাতিসত্তার প্রধান জিজ্ঞাসা — তখনও কবির স্বপ্নে জীবনের পরাক্রান্ত ফুল ফোটে গানে গানে মৃত্যুর তুহিন শীতে — জীবন যখন ক্রমে কেবলি শুকিয়ে যায় ডোবে পাঁকের আবর্তে আর বর্বরের বাচাল আক্রোশে অবলুপ্ত জ্ঞানীর সুভাষ —

জেনেছি তখন
অলৌকিক পথের মতন
তোমার স্মরণ
উন্মোচিত হয়,
উদ্ভাসিত হয়
উন্মীলিত হয়,
অসংখ্য প্রাণের তীর্থে: এবং তোমার
গানে-গানে মৃত্যুর তুহিন শীতে ফোটে
ফোটে অবিরত
জীবনের পরাক্রান্ত ফুল।।
(সূর্যাবর্ত)

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দুই দলের মধ্যে যখন চূড়ান্ত বিতর্ক — রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্নে — ঠিক সেই সময় হাসান হাফিজুর রহমান আজীবন রাবীন্দ্রিক অধিকার উঁচু করে তুলে ধরবার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন তাঁর 'ফুরাবো না আমরা তাহলে' নামক কবিতায়। রবীন্দ্র-হত্যার ভয়াল বিরোধী এই কবি নিজের প্রাণের বদলে হলেও সেই সত্য রক্ষা করে যেতে চান আজীবন।

কখনো রবীন্দ্রনাথে পরিণাম জেনে
স্বস্তির অকুণ্ঠ অবসানে মজি নাই।
রবীন্দ্রহত্যার তবু ভয়াল বিরোধী আমি।
আদিগন্ত জীবনের কোনো উৎসমুখই কোনোকালে
হননের অধিকার নেই কারো। প্রাণের বদলে
এইটুকু সত্য বলে দিতে চলো আমরা সবাই
রাবীন্দ্রিক অধিকার উঁচু করে ধরি আজীবন।
ফুরাবে রবীন্দ্রনাথ, ফুরাবো না আমরা তাহলে।

(ফুরাবো না আমরা তাহলে)

আবদুস সাত্তার রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন বহুবার, বহুভাবে হাফিজের মাজারে দাঁড়ানো, কখনো পেঁজা তুলো বরফ পড়ার মস্কোতে — কবিতার উষ্ণ দ্বার খুলে চলেছেন ক্ষিপ্র গতিতে, আবার কখনো লোকালয়ে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ব্যাপ্ত তিনি। সবকিছু ছাড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ কবি — তাই বিশ্বের সকল কাব্যের মাঠে তাঁর পদধ্বনি টের পান তিনি।

রবীন্দ্রনাথকে আমি বহুবার দেখেছি। বিশ্বের
সকল কাব্যের মাঠে তাঁর পদধ্বনি পাই টের।

(রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্র-বিতর্কের তীব্র আঁচ পাওয়া যায় আল মাহমুদের কবিতায়। এই সময়কে তিনি উত্থানরহিত বঙ্গদেশের সবচেয়ে অন্ধকার সময় বলে বর্ণনা করেছেন — যে কারণে নৈঃশব্দ্যের মন্ত্রে যেন ডালে আর একটি পাখিও বসে না। নদীগুলো দুঃখময় এবং অফলপ্রসূ মাটিতে জন্মায় কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্য কোনো সবুজ শ্যামলতা নেই সেখানে। 'চতুর্দিকে কেবল অবিশ্বস্ত হাওয়া'র প্রতীকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিকে ইঙ্গিত করেন এভাবে —

অবিশ্বস্ত হাওয়া আছে, নেই কোনো শব্দের দ্যোতনা
দু' একটা পাখি শুধু, অশ্বত্থের ডালে বসে আজও
সঙ্গীতের ধ্বনি নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাক্যালাপ করে;
বৃষ্টিহীন বোশেখের নিঃশব্দ পঁচিশে তারিখে।

(রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্র 'স্মরণ : শতবার্ষিকী' নামক কবিতায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান স্বপ্নসুরভিত ছন্দের যাদুকর হিসেবে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর সে প্রদীপ্ত কান্তি গাঢ় অন্ধগুহা জ্বলন্ত তিমিরে ভরে দেয়

Dhaka University Institutional Repository

মনিবর্ণে। এবং নীলে নীলে, সমুদ্রে, নিখিলে, নীড়ে, নিবিড় আবেগে, পূর্ণ হও, পূর্ণ করো, তুলে ধরো অনন্ত গৌরবে। তখন তাঁকে নিয়ে গর্বিত বোধ করেন তিনি —

এও তো তোমারি গর্ব, গর্বে আমি জ্বলেছি যে নিজে।

(স্মরণ : শতবার্ষিকী, দুর্লভ দিন)

জিয়া হায়দার তাঁর অস্তিত্বে রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করেন ঈশ্বরের মতো। কেননা, তাঁর স্মৃতি যতবার কুটি কুটি ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছেন, আগুনে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন স্মৃতিকে বিনষ্ট করতে চেয়েছেন বিনিদ্র উত্তেজনায় — তখনো — বারবার —

এক অনন্য ভাস্বতীতে —
আলোতে ছায়ার মতো
অথবা অন্ধকারের চোখের মতো তুমি
আমাকে জড়িয়ে রাখো
নিত্য পোষাকের আচ্ছাদনে।

(রবীন্দ্রনাথ)

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার নামে ধর্মীয় লেবাস এঁটে যারা সাম্প্রদায়িক শক্তির পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের ধুয়া তুলেছিলেন — সেই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিকে লক্ষ্য করে আবু বকর সিদ্দিক বলেন —

আসলে বুনোরা
বন ছেড়ে এসে দাবড়ে বেড়ায়
আমাদের আশ-পাশ
অথচ চিনিনে ভোলার ঠ্যালায়
চাল-চুলো নেই
তবু তারাই
পন্ডিত টুলো ন্যায়রত্ন
অথবা আমাদের বাবা।
মাংসটুকুন খাবলে খেয়ে নিলে
পথে পথে।
স্রেফ কংকালে
পাড়ি সেরে শেষে দেখি
মাথার উপরে
সেই সনাতন আকাশ
চারিদিকে শুনি
সেই নামে বাতাস
চিরায়ু।

(রবীন্দ্রনাথের নামে)

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ কাদরীর চৈতন্যপ্রবাহে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা এক ট্রাফিক আইল্যান্ডের মতো দাঁড়িয়ে। কখনো চিকিৎসক, কখনো এক আলমিরা নিদ্রার সোনালি বড়ি; কাদরীর স্বীকারোক্তি লক্ষণীয় —

দিনের শুরুতে তুমি,
মিশে আছো অন্ত্রের অম্লরসে,
অনিদ্র রাতের ভোরে যেন টেবিলে সাজানো প্রাতঃরাশ
মেধার ভেতরে তুমি, মজ্জায়, শিরায় মর্মে
ওঁৎ পেতে
শিকারী বেড়ালের মতো
নিয়ে গেছো আমাদের সবগুলো সোনালিরুপালি মাছ,

রবীন্দ্র-বিতর্কের এই রুচিহীন ভাঁড়ামি ধরা পড়েছে আসাদ চৌধুরীর কবিতায় —

সবুজ আড়ালে থাকা সঙ্গীতজ্ঞ কোকিলের
ভাঁড়ামিতে বিচলিত হই আজো অভ্যাসের বশে,
রুচিহীন অভাবী বাসন নিসর্গ, নীলিমা, রীতি,
অতীতের বিশাল গৌরব ভ্রূক্ষেপ করে না আর।
গীতবিতানের আসল চরণ ঠোঁটে নিয়ে
পেরোতে পারবো কি এই বিখ্যাত আঁধার?

রবীন্দ্র-বিতর্কের শুরু থেকে শেষ অব্দি যে ঘটনাবলী, যা আমাদের জন্যে খুবই লজ্জার, যা শাস্তিযোগ্য — সেই শাস্তিযোগ্য অপরাধের সমস্ত দায় বহন করতে চাইছেন রফিক আজাদ। তাঁর মতে একজন কবিকে নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি শুধু শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয় — তা পাপও বটে —

এবার চূড়ান্ত পাপ করে বসে আছি,
শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি এবার,
জামিন পর্যন্ত আশা করি না এবার;
এবার ভেঙেছি মন, পদদলিত করেছি এক
শুচিশুভ্র কুসুমের পবিত্র হৃদয় —
আমি অপরাধী।।
(আমি অপরাধী)

নির্মলেন্দু গুণ 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' নামক কবিতায় কবির অমৃত লাভের বাসনাকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি অন্ধকারে আমার কবিতা?
বিদগ্ধ পাঠক, উত্তরে শয়তান-কণ্ঠ মুচকি হেসে ওঠে বলে — 'আমি'।
(আজি হতে শতবর্ষ পরে)

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, জাহিদুল হক, মাহমুদ আল জামান, হুমায়ুন কবির, হুমায়ূন আজাদ রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে রচনা করেছেন একাধিক কবিতা।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব-বিরোধী যে আন্দোলন শুরু হয়, ক্রমান্বয়ে তা সারা পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে পূর্ব বাংলায় তা গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয় এবং পরিণতিতে আইয়ুব খানকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়। এই আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, পাকিস্তানী জাতীয়তা, সমাজকাঠামো এবং আইয়ুব খানের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে খন্ড খন্ড আকারে যে সমস্ত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিলো, তা-ই ১৯৬৯ সালে সংহত ও একত্র হয়ে বিরাট গণআন্দোলনের রূপ নেয়। ফলে এই অভ্যুত্থানের চরিত্রও ছিলো বহুমুখী এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণ ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত। পূর্ব বাংলার কবিরাও এই আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন এবং প্রচুর আবেগদীপ্ত কবিতা রচনা করে আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন। অধিকাংশ কবিতা বিভিন্ন সংকলনে, সাময়িকীতে ও পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে, অল্প কিছু সংকলিত হয়েছে কোনো-কোনো গ্রন্থে।

আন্দোলনের প্রধান দিক ছিলো আইয়ুব-বিরোধিতা। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের দশবছর পূর্তি উপলক্ষে 'উন্নয়ন দশক' পালন শুরু হয়; যার প্রতি জনসাধারণের কোনো সমর্থন ছিল না। সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও দুঃসহ দারিদ্র্যের চাপে মানুষ যখন বিব্রত, তখন মহাসমারোহে 'উন্নয়ন দশক' উদযাপন করা তাদের কাছে নির্দয় প্রহসন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনে নেমে পড়ে। নিছক পশুশক্তির জোরে একে দমন করতে গিয়ে সরকার সাফল্য অর্জন করতে তো পারেই নি, বরং নিজের পতন ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। এই দিকটি অনেক কবিতার বিষয় হয়েছে —

> খয়ের খাঁরা গর্তে ঢোকে
> হুজুর ব্যাপার কি?
> অগ্রগতির দশ বছরে
> এ কোন বুজরুকি।[১]

এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। ফলে আন্দোলন আরো তীব্র হয় এবং চব্বিশে জানুয়ারি রাজধানীতে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। দেশের জন্যে আসাদের এই আত্মত্যাগ অনেক কবিতার বিষয় হয়েছে।

> পূর্বে ও পশ্চিমে সংঘবদ্ধ প্রতিশ্রুতি
> একক অভিন্ন
> অসমাপ্ত শহীদ মিনারে আর নয়
> শোকার্ত স্মরণ
> এ তো আসাদের মৃত্যু নয় — আসন্ন
> রক্তিম বিস্ফোরণ।[২]

---

১. গোলাম সারওয়ার, ফুসন্তব, চিচিং ফক (একুশের সংকলন) আখতার হোসেন ও আবু সালেহ সম্পাদিত, ঢাকা-১৯৬৯।

২. সন্তোষ গুপ্ত, রক্তিম বিস্ফোরণ, (শহীদ আসাদের উদ্দেশে) স্ফুলিঙ্গ (২১শে সংকলন)। পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ফ্রেন্ডস বি. বি., ঢাকা-১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমাবস্থায় অভ্যুত্থান শহরে শুরু হলেও ধীরে ধীরে এর ঢেউ গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। সে-সময় গ্রামের পোড়- খাওয়া অসহায় মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তারা হরতাল করেছে এবং থানা, তহশীলদার অফিস ও ইউনিয়ন কাউন্সিল ধ্বংস করে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। হুমায়ূন কবিরের কবিতায় এর উল্লেখ আছে —

গঞ্জেও
এসেছে হরতাল, নিতাই গফুর সাধু
জলিল পঞ্চাত বসে ছক কাটে কি কি
করা যাবে। বৃদ্ধ কেউ পাশে বসে
বলে বাবা সব, ঝান্ডায় মোদের কথা
লিখে দিও, অজন্মার খাজনা মকুব চাই
ও.সি.র জুলুম বড়, চৌকিদারী ট্যাকসোও দেব না।
(এক গঞ্জের গল্প, কুসুমিত ইস্পাত)

এই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রচন্ড শক্তি অর্জন করে। পাকিস্তান ঔপনিবেশিক মনোভাব নিয়ে পূর্ববাংলাকে শাসন-শোষণ করছে, এই ধারণাও সর্বত্র বিস্তৃত হয়। এ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে অনেকে স্বাধীনতার কথা ভাবতে শুরু করেন। আবার অনেকে এই আন্দোলনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন পরবর্তীকালের মহত্তর, বৃহত্তর ও কঠোরতর আন্দোলনের পূর্বাভাস। বাঙালী জাতি চূড়ান্ত আঘাতের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, সে কথাও কারো কারো কবিতায় রয়েছে। এদেশের মানুষকে বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে ও বিরাট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং এর জন্যে প্রস্তুতি থাকা দরকার সে কথাও কেউ কেউ লিখেছেন —

অচিরেই বাংলাদেশ ডুবে যাবে রক্তের দীঘিতে
যদি চোখে জল থাকে, তবে তা ফেলার জন্য তৈরী হও?
যদি বেদনাকে ভুলে থাক, তবে জেনো বিষাদের কারাগৃহ
তোমাদের সামনে, বন্ধুগণ, জেনো অগণ্য রক্তের
ব্যথিত সাক্ষী হতে হবে তোমাদের
এই বিশ্বস্ত স্বদেশে
অচিরেই।
আমরা এক নতুন সিঁড়ির অভাবিত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছি।[১]

মিছিল, ধর্মঘট, হরতাল, শ্লোগান, সান্ধ্য আইন, পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার খন্ডযুদ্ধ প্রভৃতি ছিল আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের মিছিল হয়েছে, যার রূপ কখনো শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর, আবার কখনো শোকে মলিন ও মৌন। সান্ধ্য-আইনের সময় শহর থমথমে রূপ লাভ করেছে-জনমানবহীন, ফাঁকা ও ভয়াবহ রকমের নিস্তব্ধ। কখনো তা ভঙ্গ হয়েছে সেপাই-শান্ত্রীর আনাগোনায়, মিলিটারি-গাড়ির আওয়াজে অথবা আহতদের নিয়ে সেনাদের নারকীয় উল্লাসে। ধর্মঘট ও হরতালের দিনে শহরের রূপ ছিলো ভিন্নতর। প্রাত্যহিক কাজকর্ম বন্ধ, রাজপথে

---

১. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, রক্তের ফেস্টুন [আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে] হে স্বদেশ ১৩৭৮, (কবিতা সংকলন)

Dhaka University Institutional Repository

মিছিল আর মিছিল। এই চিত্র অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। শামসুর রাহমান তার 'হরতাল' নামক কবিতায় হরতালের বর্ণনা করেন এভাবে —

প্রতিটি দরাজ কাউন্টার কনুই বিহীন আজ। পা মাড়ানো
লাইনে দাঁড়ানো নেই, ঠেলাঠেলিহীন;
... ...
রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা সঙ্গিন হয়ে বুকে
গেঁথে যায়, একটি কি দু'টি
লোক ইতস্তত
প্রফুল্ল বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।
(হরতাল, নিজবাসভূমে)

আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে যে শোক-মিছিল বেরিয়েছিল, তার উপর ভিত্তি করে শামসুর রাহমান রচনা করেন 'আসাদের শার্ট' নামক তাঁর জনপ্রিয় কবিতাটি। কিভাবে একটা শার্ট ক্রমান্বয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয় — তারই সার্থক ভাষারূপ লক্ষ্য করা যায় এই কবিতায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখন্ড বস্তু মানবিক
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।
(আসাদের শার্ট, নিজবাসভূমে)

শিক্ষকেরাও অংশ নিয়েছিলেন এই আন্দোলনে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শাহাদত বরণ করেছিলেন সেনাবাহিনীর বুলেট ও বেয়নেটের আঘাতে। এ ধরনের একজন তরুণ অধ্যাপকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'সেই এক অধ্যাপক' কবিতাটি। একদিন তিনি তাঁর গ্রন্থগুলোকে ছাত্রদের সম্মুখে আগুনে পুড়ে অধ্যাপনায় ইতি-টানার কথা ঘোষণা করলেন, কেননা বর্বর-চালিত, আমলাতন্ত্রের মুরুব্বিয়ানায় শাসিত এবং একনায়কত্বের নিষ্পেষণে নির্যাতিত সমাজে অধ্যাপকের স্থান নেই। তিনি বেরিয়ে পড়লেন একদল তরুণ বিপ্লবী সৃষ্টির জন্য যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে নবজাগরণ আনতে প্রাণ উৎসর্গ করবে।

এবার আমার সাধনা হবে অন্যতর এবং ভিন্নপথে
আমি গড়ে তুলবো একদল উৎসর্গীত-প্রাণ সৈনিক
যারা এই আমলা নিগৃহীত সমাজে জ্বালবে
বিপ্লব আর বিদ্রোহের অপ্রতিরোধ্য অগ্নিশিখা
কেননা আমি বিশ্বাস করি
গ্লানির পঙ্কে নিমজ্জিত একটি সমাজ
বিপ্লবের মাধ্যমেই নবজন্ম লাভ করে।
(সেই এক অধ্যাপক)

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের শহীদরা ছিলেন বাঙালীর গর্বের ধন। তাঁদের পবিত্র মরদেহগুলো রাখার জন্যে বাঙালীর হৃদয়ই উপযুক্ত স্থান — পাহাড় মাটি অথবা জল কিছুই এগুলোর যোগ্যস্থান হতে পারে না; 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়' নামক কবিতায় শামসুর রাহমান এই বক্তব্যেরই ভাষারূপ দিয়েছেন।

আন্দোলন-দমন করার জন্য প্রথমে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে ও শেষদিকে দেশরক্ষাবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়। পুলিশের প্রতি সরকারের অবিশ্বাসের কারণ ছিলো এজন্যে যে, তাঁরা আন্দোলনকারীদের ওপর যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে পারেনি; বরং শ্লোগানে ও দাবিদাওয়াতে নিজেদের অবরুদ্ধ আবেগের প্রকাশ দেখে মিছিলকারীদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। দায়িত্ব পালনের জন্যে আনেককে কোনো কোনো সময় নিষ্ঠুর হতে হলেও এরা পরবর্তী সময়ে অনুশোচনা ও গ্লানি ভোগ করেছে। 'পুলিশ রিপোর্ট' নামক একটি কবিতায় শামসুর রাহমান একজন পুলিশের বিপর্যস্ত সেই মানসিকতার চিত্র তুলে ধরেন। যেন সহসা কোনো এক তরুণের রক্ত ছিটকে এসে পড়ে তার হাতে। বিহ্বল পুলিশ ব্যারাকে এসে ঘন-ঘন হাত ধুতে থাকে, কিন্তু লেডী ম্যাকবেথের মতোই তার মনে হয়, কিছুতেই যেন সে-দাগ মোছে না। তার মনে শুধু ভাসতে থাকে মিছিলের বিশালত্ব আর তার অন্তহীন আওয়াজ।

হোস পাইপের অজস্রতা পারে না মুছতে দাগ
এ-দাগ ফেলবে মুছে এত পানি ধরে না সমুদ্রে কোনোদিন।
ঘড়িতে গভীর রাত, ব্যারাক নিশ্চুপ, বারান্দায়
করি পায়চারি আর হঠাৎ কখনো কানে ভেসে আসে
সমুদ্রের বিপুল গর্জন;
সুন্দর বনের সব বাঘ যেন আমার ওপর পড়বে ঝাঁপিয়ে ক্ষমাহীন।
(পুলিশ রিপোর্ট, নি বা ভূ)

আল মাহমুদ 'উনসত্তরের হুড়া' নামক কবিতায় আন্দোলনে শহীদ ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান এবং মতিয়ুরের আত্মত্যাগকে সার্থকতার সীমানায় পৌঁছে দেবার জন্যে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আগুন দ্বিগুণভাবে জ্বেলে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন তরুণ সমাজকে —

কেন বাঁধবো দোর জানালা
তুলবো কেন খিল?
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
আসবে সে মিছিল
ট্রাক,ট্রাক, ট্রাক
ট্রাকের বুকে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক।
কোথায় পাবো মতিয়ুরকে ঘুমিয়ে আছে সে;
তোরাই তবে সোনা-মানিক
আগুন জ্বেলে দে।
(উনসত্তরের হুড়া, সো. কা.)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত আবুল হোসেনের 'বিরস সংলাপ' গ্রন্থের অনেকগুলো কবিতায় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের চালচিত্র লক্ষ্য করা যায়। এ গ্রন্থের 'নায়ক' ও 'দেবো, সব দেবো' কবিতা দু'টিতে যেমন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম বছরগুলোতে কোনঠাসা জীবনের কথা আছে তেমনি 'ঝড়ের পূর্বে' কবিতায় আসন্ন উনসত্তরেরর গণ-অভ্যুত্থানের যে ঝড়ের রূপরেখা জনমনে অঙ্কিত হয়েছিল — তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় —

আমি জানি তুমি অপেক্ষায় ছিলে গ্রীষ্মের তৃষ্ণার্ত
রুক্ষ-ভূমি যেমন বিশুষ্ক ঠোঁট মেলে চেয়ে থাকে দূর
বর্ণহীন নীলে এক ফোঁটা বারিবিন্দুর আশায়, যেমন
জ্যৈষ্ঠের তপ্ত দিন উষ্ণ আকাঙ্ক্ষায় রাত্রির অপেক্ষা
করে সময়ের রেলিং ধরে।

... ...

আর আমি তো ভেবেছি এই অন্ধকার ছিঁড়েফুঁড়ে আসবে
যেন ঝড় তার বন থেকে বনান্তর গতি থামাবে কে, তাকে
ভরাবে কোন্ প্রান্তর।

(ঝড়ের পূর্বে : বিরস সংলাপ)

'জবানবন্দী' নামক ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় পাকিস্তানমনস্ক এক ব্যক্তির জবানীতে রচিত হয়েছে তাঁর দুঃখের কাহিনী। দুঃখ শুধু একটাই যে এদেশের কচি কচি ছেলেগুলোর 'আন্দোলন' নামক চেচামেচিতে পরিস্থিতি যা হয়েছে তাতে তাঁর দিবানিদ্রা ভঙ্গ হচ্ছে বার বার। এ ধরনের শঙ্কিত পরিস্থিতির আবসান না হলে শেষমেষ তাকে শরাব আর সাকী নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিতে হবে — এই দুঃখের কথা জানিয়ে বন্ধুকে লিখছেন —

বন্ধু, কি লিখি, দুঃখের কথা বলি শোন;
আজকে দুপুরে হয়নি আমার একদম ঘুম

... ...

এত সব বাজে বকতেও পারে ওরা।
দিনরাত শুধু কচি ছেলেগুলো করছে উত্তেজিত।
ধর্ম লড়াই ইনশাল্লাহ ও বক্তৃতায়
বলে নাকি ওরা মিলতে পারে না মিলেনীয়াম
ঘাটের ধানই নয়
হাটের জানও বর্গীরা খায়।
পাড়ার নিরীহ লোকগুলো গেছে একেবারে সব ক্ষেপে
ও ধারের মেসে তাসের আড্ডা বসে না আর,
বাসার পার্শ্বে গলিটাও নিঝঝুম
পরিস্থিতি যা হয়েছে বেজায় শঙ্কিত
দিবানিদ্রাটা মাটি বুঝি হয় ভাই

Dhaka University Institutional Repository

দোহাই তোমার উপায় একটা বার কর।

(জবানবন্দী : বিরস সংলাপ)

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা — প্রতিটি মুহূর্তে কবি উপলব্ধি করেন রাজনৈতিকভাবে চেপে আসা ধেয়ে আসা এই ঘুটঘুটে অন্ধকার সময়কে —

ঘন ঘুট ঘুট চারধার
আম জাম ঝাউ দেউদার
আর শাল তাল
তমাল গহন
নির্জন বন।
... ...
হঠাৎ বাঁশের জঙ্গলে
শ্যাল ডেকে ওঠে দলে দলে।
হুম হুম দেহ ভুলে যাই নাম।
ভুতুড়ে বন না, এও এক গ্রাম।

(দেয়াড়ায় : বিরস সংলাপ)

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের এই উত্তাল সময়কে আজীজুল হক তাঁর 'দর্পণে স্বগত' নামক কবিতায় বর্ণনা করেন এভাবে —

রোমশ সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে ওঁৎপেতে বসে থাকা হিংস্র সময়
শ্বাস নেয়
গন্ধ খোঁজে
ধারালো থাবায়
অবিরত তাড়ায় জোনাকী।

অতঃপর, বন্ধুর উঠানে শুয়ে সকালের দুটি লাশ,

নীল কবিতার খাতা, গাঢ়তর খাকীরঙ ছায়া,
দ্যাখো না রোদ্দুর কত আকাশে এখন,

(দর্পণে স্বগত : বিনষ্টের চীৎকার)

৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে, বাষট্টিতে শিক্ষার জন্যে আন্দোলন, ছেষট্টিতে স্বায়ত্তশাসনের জন্যে আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান — পরিশেষে একাত্তরে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করে এদেশের জনগণ বার বার শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। শাসকের হাত কখনো একটুও কাঁপেনি এদেশের জনগণেরর বুকের পাঁজর ভেদ করে গুলি ছুঁড়তে। 'আমরা অজস্র-হাজার-লাখো' নামক কবিতায় জাহানারা আরজু এই বক্তব্যেরই ভাষারূপ দিয়েছেন এভাবে —

Dhaka University Institutional Repository

সেই থেকে আমরা ওদের বুনো-ইচ্ছের শিকার
হয়েছি কতবার, ওদের এতটুকু হাত কাঁপেনি
ছোট্ট পাখির মতো আমাদের নরম বক্ষ-পাঁজর
বুলেটে উড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিতে–
অথচ আমরা তো বেশি কিছু বলতে চাইনি,
শুধু আমাদের স্বদেশকেই ভালবাসতে চেয়েছিলাম
আর মায়ের পবিত্র স্তন্যধারার ঋণ-শোধ করার
অংগীকার নিয়েছিলাম।

(আমরা অজস্র-হাজার-লাখো : শোনিতাক্ত আখর)

'আমরা ঠিক সূর্য নই' কবিতায় নিপীড়ন, নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত জঞ্জালকে পুড়িয়ে কোটি সূর্যের শিখার মতো জ্বলে উঠবার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত হয়েছে।

আমরা ঠিক সূর্য নই,
অথচ আমরা জ্বলে উঠতে পারি পৃথিবীটা জুড়ে
আমাদের বুকের তপ্ত দহনে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল
দিতে পারি আজ পুড়ে।
... ...
এই মৃত্তিকা গর্ভ হতে
আমরা আনি প্রখর দহন উত্তপ্ত লাভাস্রোত
আমরা ফোটাই রক্ত কুসুম আঙ্গিনায় থরে থরে,
প্রোজ্জ্বল শিখায় আলো দিয়ে যাই মানুষের ঘরে ঘরে।

(আমরা ঠিক সূর্য নই : শোনিতাক্ত আখর)

আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখিত কবিতাগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এগুলোর অধিকাংশ রচিত হয়েছে তরুণদের দ্বারা, যাঁরা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে শরীক হয়েছিলেন। ফলে তাদের আবেগ হয়েছে আন্তরিক ও বক্তব্য দ্বিধাহীন। কবিতাগুলো বক্তব্যপ্রধান এবং সে বক্তব্যের জোয়ারে গৌণ হয়ে পড়েছে কবিতার শিল্পাঙ্গিক। মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙক্ষার গন্ডী অতিক্রম করে এই বক্তব্য স্পর্শ করেছে বৃহত্তর জনজীবনের স্বপ্নকে এবং এভাবে বাংলা কবিতা সম্পৃক্ত হয়েছে জনগণজীবনের সঙ্গে।

Dhaka University Institutional Repository

পহেলা বৈশাখ ও বাংলা কবিতা

পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ বাঙালী জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের এক প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি। এর মূলে রয়েছে বাঙালীর দীর্ঘকালের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। কেবল লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতির পটভূমিকায় নয়, বাংলা নববর্ষের দিনটি জড়িয়ে আছে এদেশের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে। ষাটের দশকে পাকিস্তানী শাসকদের বাঙালী-সংস্কৃতি-বিরোধী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মহাসমারোহে পালিত হতে শুরু করে নববর্ষ। ষাটের এই ক্রান্তিলগ্নে 'ছায়ানট' রমনার বটমূলে নববর্ষ পালনের ব্যতিক্রমী আয়োজন করে, বস্তুত ঐ বছর থেকেই ঢাকা নগরবাসীর কাছে নববর্ষ উৎসব পালনে এক অভিনব মাত্রা সংযোজিত হয়। এবং ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৬৪ সাল থেকেই পহেলা বৈশাখ সরকারী ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। সেদিক থেকে পহেলা বৈশাখ সচেতনতার, আত্মোপলব্ধির এবং আত্মজাগরণের দিন।

ইংরেজী, হিজরী এবং বাংলা এই তিনটি সালই আমরা গণনা করতে অভ্যস্ত হয়েছি। মোহাম্মদের (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরতের আলোকে হিজরী সাল গণনা এবং এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে খৃষ্টীয় সালকে গণনা করে থাকে। তবে বর্তমানে এ সাল শুধু আমাদের দেশে নয় সমগ্র পৃথিবীতে একটা সাধারণ সাল করে গণনা হচ্ছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বের এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফসলী সনের উৎপত্তি। এ ফসলী সনই পরে বাংলা সালে পরিবর্তিত হয়েছে।[১]

বাংলা সালের অনুসরণে সুদূর অতীতেও নববর্ষের উৎসব হতো। তবে তা ছিলো ভিন্ন ব্যঞ্জনায় মুখরিত। মহাধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো এই উৎসব। জমিদাররা করতেন পূণ্যাহ, ব্যবসায়ীদের হালখাতা, মিষ্টি বিতরণ; এবং মেলার আয়োজন গোড়া থেকেই ছিলো। জমিদারী প্রথার সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পূণ্যাহ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে ব্যবসায়ীদের হালখাতাও ক্রমশ যাচ্ছে উঠে; আধুনিক মহানগরে তা নেই-ই। গ্রামীণ সমাজেও ক্ষীয়মাণ, শুধু মফঃস্বলের কিছু কিছু স্বর্ণকারের ভেতর এবং পুরোনো ঢাকায় এর প্রচলন রয়েছে; তা-ও ভিন্ন আঙ্গিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থাৎ নগরায়ণের ফলে গ্রামের উৎসব-পদ্ধতি কালে কালে নাগরিক মাত্রা পেয়েছে, নান্দনিক চারিত্র্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে; সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু বাহ্যিক আড়ম্বর। বাঙালীর নববর্ষ জমিদারের রাজকোষ আর ব্যবসায়ী দোকানীর অঙ্কের খাতা থেকে এখন ঐতিহ্য অনুভবের প্রাণময় স্ফূর্তি এবং বর্ণাঢ্য উৎসবের দিকে ধাববান। উৎসব হচ্ছে এক প্রকার অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার হচ্ছে ক্ষুধাকে নির্বাসিত করবার অঙ্গীকার, স্বার্থকে বিলুপ্ত করার অঙ্গীকার এবং অকল্যাণকে অস্বীকার করার অঙ্গীকার।

এই অঙ্গীকার হিসেবেই নববর্ষ এদেশের জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ১৯৪৭-এর পর থেকে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিজয়ের কারণেই বাংলাদেশের বাঙালীর কাছে নববর্ষ উৎসব প্রাণের সবটুকু আনন্দ ও জঙ্গমতার এবং মহামিলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার মযার্দা প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে বাঙালীর কাছে অসাম্প্রদায়িক উৎসব পহেলা বৈশাখ উদযাপন পৃথক মহিমায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

---

১. বাঙলা সন ও পহেলা বৈশাখ, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা বসন্ত সংখ্যা ১৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে ওঠার প্রাক্কালে 'হিন্দুমেলা' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা হতো। নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয় 'হিন্দুমেলা'। ধারাবাহিক ভাবে চৌদ্দ বছর ধরে চলেছিল এই মেলা। এক্ষেত্রেও মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশীয়দের দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন। স্বদেশীয় বিদ্যানুশীলনে উৎসাহ দান, শিল্পকর্মে আনুকূল্য এবং শরীর চর্চার আয়োজন দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হয়।"[১]

পরবর্তী সময়ে হিন্দুমেলার আনুকুল্যে নবগোপাল মিত্র ন্যাশনাল স্কুল, ন্যাশনাল সোসাইটি ও ন্যাশনাল জিমনেসিয়াম স্থাপন করেন। ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনেও হিন্দুমেলার প্রেরণা ছিলো। পূর্বে স্থাপিত ন্যাশনাল পেপার ছিল হিন্দুমেলার মুখপত্র।

নববর্ষের মেলার মতো হিন্দুমেলারও প্রধান অঙ্গ ছিলো কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের প্রদর্শন, বক্তৃতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ এবং শরীর চর্চার আয়োজন। কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীরা যোগ্যতানুসারে পুরস্কৃত হতেন। এই মেলা একদা ভারতবাসীর প্রাণে অভূতপূর্ব উন্মাদনা এনেছিল। ফলে একে জাতীয় মেলা আখ্যা দেয়া হয়।[২]

ঢাকা শহরে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হতো কীভাবে তার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় মুস্তাফা নূরউল ইসলামের স্মৃতিচারণে —

নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ নিয়ে ইতিহাস নির্মিত হবে, কদাপি কেউ কী তেমন কল্পনাও করেছিলেন। শেষ অবধি তাই হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সময় গেছে যখন অনুষ্ঠান করতে গিয়ে পেটোয়া পেশীশক্তির হাতে প্রহৃত হয়েছি। পেছনে থাকতো এস্টাব্লিশমেন্ট আর মুসলিম রেনেসাঁর ধ্বজাধারীরা। সেই প্রথম যুগে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান করতে হতো খানিক সরে গিয়ে মধুর দোকানে, কার্জন হলের বারান্দায়, কিংবা লিটন হলে। পুরনো ঢাকায় ঠাঁই পেয়েছি জগন্নাথ কলেজের কোনো ক্লাসরুমে, সওগাত অফিসে, কখনো বা রামমোহন লাইব্রেরীতে, কী নর্থ-ব্রুক হল লাইব্রেরীতে। অংকুরোদগম হয়েছিল এভাবে। আমাদের বাংলার সনাতনী ট্র্যাডিশনের গ্রাম থেকে পয়লা বৈশাখের শহরে রাজধানীতে আগমন যথার্থ করে বলতে গেলে সেই প্রথম বর্ষবরণ এসেছিল যুবাতরুণদের অঙ্গনে, কিয়ৎ পরিমাণে মধ্যবিত্তের জীবনে। তারপর বায়ান্নর ফেব্রুয়ারীর পর থেকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এতদিনে বাংলা সন নববর্ষ উদযাপন বিচ্ছিন্ন কোনো এক অনুষ্ঠান মাত্র নয়, যেখানে আলোয় উজ্জ্বলিত মঞ্চ, সঙ্গীতে-নৃত্যে-আবৃত্তিতে কারুশীলিত অনুপম আয়োজন। রাজনীতির জোরালো সমর্থন যুক্ত হয়েছে তাতে। সমগ্রতায় আন্দোলনই বটে খরতর নতুন মাত্রিকতার যোজনায়।

সাংস্কৃতিক সংকটের মুহূর্তে, বাঙালী জাতিসত্তার বিকাশে এদেশের কবিরাও নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখের উৎসবকে উদযাপন করেন শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে — অকল্যাণ ও

---

১. বাঙলা সন ও পহেলা বৈশাখ, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা বসন্ত সংখ্যা ১৩৭৪

২. যোগেশ চন্দ্র বোগল, ভার কোষ (৫ম খন্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ১৯৭৩, পৃ. ৬৫১

Dhaka University Institutional Repository

অসুন্দরকে অস্বীকার করার অঙ্গীকারে নববর্ষ বরণ চেতনা যদিও বাঙালীর এক প্রাচীন ঐতিহ্য — তবু যেকোনো আন্দোলনের মুখে, সংকটের মুহূর্তে, স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে নতুন করে দীপ্ত হয়ে ওঠে আমাদের ঐতিহ্য চেতনা। অবচেতনে, অন্তর্লোকে আমরা যে কী গভীরভাবে লালন করি আমাদের নিজস্বতা, তা বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে বৈশাখের গান, কবিতা এবং আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন বাংলার পুথি ও পালায়, মধ্যযুগের গানে ও গাথায় কবিকঙ্কন–দৌলতকাজীর বারমাস্যায় বৈশাখীর যে চিত্তউৎসার অনুরাগ; পুরাতন জীর্ণ স্তূপকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যে ভৈরবী রুদ্ররূপী বৈশাখের আগমন– রবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞায় আবিষ্কার করেন বৈশাখের রুদ্ররূপ ও কল্যাণ রূপের অপূর্ব ব্যঞ্জনা। বৈশাখের এই দ্বৈতসত্তার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ষশেষ ও বৈশাখ কবিতার পূর্বিকায় বলেছিলেন, বিশ্বের মূল ভিত্তি ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্যে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়ার উপরে তারই প্রকাশ বর্ষশেষ ও বৈশাখ — এ যেন অন্নপূর্ণার ও রুদ্র ভৈরবের মিলন রূপ।[১]

রুদ্ররসের কবি নজরুল বুঝেছিলেন বাঙালীর শৈত্যপ্রবাহে বৈশাখী তপ্ত বাতাবরণ বইয়ে দিতে না পারলে এই হিমশীতল জাতির উদ্ধার নেই। তাঁর সমগ্র অগ্নিবীণা তাই বৈশাখের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর। তিরিশের সমাজমনস্ক কবি বিষ্ণু দে-র কাছেও বৈশাখ সংগ্রামের প্রতীতিতে আন্দোলিত অর্থাৎ বাংলা কবিতার উত্তরাধিকার–বাহিত তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের কবিদের অধিকাংশের কবিতায় বৈশাখ এসেছে নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা মাত্রায়। আমাদের আলোচ্য পর্বের কবিদের কারো কারো রচনায় বৈশাখ এসেছে আত্ম-আবিষ্কারের চেতনায় দীপ্ত হয়ে কখনো জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে, কেউ কেউ আশাবাদী উচ্চারণে, আবার কেউ হতাশ নিরাসক্ত, নির্মমতাকে আবিষ্কার করেন বৈশাখের রুদ্র রোষে, খরায়, দাবদাহে কেউ কেউ আবার সুদূর প্রবাস থেকে নববর্ষে অনুভব করেন ঘরে ফেরার টান। এক্ষেত্রে আহসান হাবীবের বৈশাখ সম্পর্কিত কবিতায় যে কাব্য–সুষমা এবং দূরস্পর্শী তত্ত্বের সংমিশ্রণ পাওয়া যায় — তা যেন কবির অকৃত্রিম ভালোবাসারই অপর নাম বৈশাখ —

মৃগনাভি ছলনায় নিজেকেই নিজে
মুগ্ধ রেখেছো।
উষার লালিত্যে আর মধ্যদিনের
আগুনে তুমি অকৃত্রিম
তোমাকে আমি কী দিতে পারি
কী দেব বল হে বৈশাখ।
আমি তোমার সঙ্গী অথবা তুমিই
আমার।

ফররুখ আহমদ দুর্বার দুর্ধর্ষ বৈশাখকে ধ্বংসের নকীব হিসেবে আহ্বান জানালেও তিনি ধ্বংসের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন সেই শক্তি — যা মৃত্যুম্লান পৃথিবীতে নতুনের স্বপ্ন জাগায় — রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের বাঁকে —

ধ্বংসের নকীব তুমি হে দুর্ধর্ষ বৈশাখ

---

১. রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের বালুচরে তোমার কঠোর কণ্ঠে
শুনি আজ অকুণ্ঠিত প্রলয়ের ডাক ।

... ...

বিদায় বিগত বর্ষ! হে বিশীর্ণ পুরাতন আলবিদা জানাই
নতুনের স্বপ্ন জাগে মৃত্যুম্লান পৃথিবীতে রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের বাঁকে,
নিষ্প্রাণ এ জড়তার বুকে জাগে তীব্র গতি, জাগে ঝঞ্ঝা রব
দুরন্ত ঝড়ের বেগে অচল স্থাণুর বুকে ওঠে উদ্দাম বিপ্লব,
সুখবিলাসীর স্বপ্ন ভেঙে যায়, ভেঙেপড়ে কারুণ্যের সঞ্চিত মৌচাক
সুপ্তির সমুদ্র থেকে জাগ্রত প্রাণের দ্বারে হানা দেয় প্রমত্ত বৈশাখ ।

সৈয়দ আলী আহসান 'বৈশাখ-করাচীতে' নামক কবিতায় করাচী শহরের ঋতুচক্রে তিনি যেন বিভ্রান্ত হচ্ছেন, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না আজন্মের সেই বৈশাখ। বরং প্রতিদিন সেখানে তিনি মুখোমুখি হচ্ছেন তাপদগ্ধ মধ্যাহ্নের। খররৌদ্র বঞ্চনার ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে করাচীর নিষ্ঠুর মাটিতে। রুক্ষতার হতাশ্বাসে ক্লান্ত কবি সেই বৈশাখের কথা স্মরণ করছেন একদা যে বৈশাখ বিদ্রোহ-দিবসে পরিণত হয়েছিলো এবং পরিণামে প্রলয় ঝড় আর বজ্র-বহ্নির ভেতর দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিলো মুক্তি :

একদা বৈশাখ ছিলো বসন্তের স্বপ্ন
ক্ষান্ত বিদ্রোহ দিবসে : পরিবর্তনের
সূত্রে যে বৈশাখ আনলো প্রলয়-ঝড়
আর বজ্র-বহ্নি, নির্যাতনের আচ্ছন্ন
প্রদোষে আনলো অধৈর্য মুক্তি। দিনের
বিলাস-শান্তিতে এলো প্রলয়ের ঝড়।
(বৈশাখ-করাচীতে : একক সন্ধ্যায় বসন্ত)

স্বদেশ স্বভূমি থেকে একজন কবি যতদূরেই অবস্থান করেন না কেন শেষাবধি তিনি ঐতিহ্য-সংলগ্ন হয়েই খুঁজে পান বেঁচে থাকার সার্থকতা। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পাশ্চাত্য সভ্যতার তাৎক্ষণিক জীবনের সান্নিধ্যে বাস করেও ভুলতে পারছেন না নববর্ষ, শহীদ মিনার, রমনার রাজপথ এমন কি সূর্যের প্রত্যাশী সেই মশাল মিছিলটিকে। 'নববর্ষ ১৯৭০' কবিতায় ট্রাফালগার স্কোয়ারের আলোকিত ঝর্নাধারায় রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত তরুণ-তরুণী যখন বলে —

প্রেম করো, প্রেম করো শরীরের স্বর্গে এসো
বন্ধু, আর যুদ্ধে যেও না — এই বাণী
দেহ থেকে দেহে গেল রক্তের প্রবাহে।
(নববর্ষ ১৯৭০ : প্র. প্র.)

তখন ঐতিহ্যসংলগ্ন একজন কবি স্বভাবতই সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন তাঁর স্বদেশ ও স্বভূমির দিকে —

এইসব তুলকালাম ঘটবার আগের প্রহরে

Dhaka University Institutional Repository

নববর্ষের খোঁজে শহীদ মিনার ছুঁয়ে
রমনার রাজপথ আলো করে দিয়ে গেল
সূর্যের প্রত্যাশী এক
মশাল মিছিল।

(নববর্ষ ১৯৭০ : প্রতনু প্রত্যাশা)

বৈশাখী ঝড়ের তান্ডবে অসংখ্য গ্রাম, জনপদ, রাজধানী, মাটি-মাঠ, নদীনালা, ক্ষেত-খামার সভ্যতার স্বাক্ষরিত নাম যা কিছু- — সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মুহূর্তে। ছত্রখান হয়ে যায় মানুষের সাজানো সংসার । ঝড়ের এই ধ্বংসাত্মক রুদ্ররূপের চিত্র ভাষা পেয়েছে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর "ঝড় : পহেলা বৈশাখে : ১৩৬৭" কবিতায় —

ঝড়ের আগ্নেয় পাখা ছুঁয়ে যায় সংখ্যাহীন গ্রাম
জনপদ, রাজধানী মাটি-মাঠ বেবাহা প্রান্তর
অরণ্যে তরুর শীর্ষ, নদী-নালা, ক্ষেত ও খামার
মুহূর্তে পোড়ায় সব, সভ্যতার স্বাক্ষরিত নাম
মুছে ফেলে অনায়াসে গড়ে এক অন্তিম কবর
ছত্রখান হয়ে যায় মানুষের সাজানো সংসার।

(ঝড় : পহেলা বৈশাখ : ১৩৬৭, রক্তিম হৃদয়)

তিমিরান্তিক (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থে সিকান্দার আবু জাফরের 'বৈশাখ' নামক কবিতাটি আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা মনে হলেও এটিকে রূপক কবিতা হিসেবে ধরা যেতে পারে। বৈশাখের প্রচন্ড নৃত্যের মধ্যে কবি প্রভুত্বের প্রমত্ততা এবং ভাঙনের প্রচন্ডতা লক্ষ্য করেছেন এবং তারই মধ্যে কখনো বলাকা, কখনো বসন্তের রূপকে আনন্দ এবং বিজয়ের উত্তরীয় প্রসারিত দেখেছেন। 'তের শ ষাটে' কবি নতুন বছরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিগত বছরগুলোর সমস্ত হতাশা এবং গ্লানি ঝেড়ে ফেলে নতুন করে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে চান। যদিও তিনি মানেন, শুভদিন এখনো আসেনি, তবু তিনি হতাশাগ্রস্ত নন। তাঁর বিশ্বাস —

নিশ্চিত জানি একদিন
সহ্যের সীমানা
অতিক্রান্ত হবে।
(তেরশ ষাট)

এবং এই অতিক্রান্ত সীমানা আগামী ভবিষ্যতেরই সূচনা করবে। সেদিনের সে নববর্ষকে, সে শুভদিনকে অভ্যর্থনা করে কবি তাকে চিরন্তন করে যাবেন —

মৃত্যুহীন করে যাবো তাকে
বহ্নিমান ভাস্করের অন্তহীন
পরমায়ু দিয়ে —
(তেরশ ষাট)

Dhaka University Institutional Repository

সেদিন অতীতের সমস্ত হতাশা এবং গ্লানি ইতিহাস হবে, সে ইতিহাস অসহায় মানুষের পীড়নের ইতিহাস। হাসান হাফিজুর রহমান ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও প্রচন্ড আশাবাদী। তিনি নদীকে ডেকে বলেন —

নদী, এ ঝড়ে অন্তহীন প্রাণ পাবো ফিরে
তারপর চিরন্তন নন্দিত সুন্দর
তোমাকেই আমি
আবার পাবোই ফিরে।

শামসুর রাহমান বৈশাখ প্রশ্নে বেদনায় ক্লিষ্ট, বিমর্ষ — অতঃপর তিনি যেন হয়ে ওঠেন অদৃষ্টবাদী :

রাত্রি ফুরালে জ্বলে ওঠে দিন
বাঘের থাবায় মরছে হরিণ,
কালবৈশাখী তান্ডবে কাঁপে পড়ো পড়ো চাল
শূন্য ভাঁড়ারে বাড়ন্ত চাল
ইচ্ছে তাঁর ইচ্ছে।

আল মাহমুদের কাছে বৈশাখ প্রচন্ড শক্তিমন্ত। বিপ্লবী চেতনার দুঃসাহসী সৈনিকরূপে তিনি দেখতে চেয়েছেন বৈশাখকে। স্পষ্টতই পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণকারী শাসকগোষ্ঠী যারা বিভেদকারী এবং পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমে-গড়া সম্পদ লুটে নিয়ে তিলোত্তমা ক'রে গড়ে তুলছে করাচী আর ইসলামাবাদ — তাদের সেই বাহাদুরীকে গুঁড়িয়ে ফেলার জন্যে বৈশাখের তুফানকে আহবান জানান এভাবে —

ধ্বংস যদি করবে তবে শোনো,
তুফান
ধ্বংস করো বিভেদকারী পরগাছাদের
পরের শ্রমে গড়ছে যারা মস্ত দালান
বাড়তি তাদের বাহুদুরী গুঁড়িয়ে
ফেল।

বস্তুত, এদেশের মানুষের কাছে 'বৈশাখ' কেবল একটি মাসের নাম নয়, বরং বলা যায় সঞ্চরণশীল এক ঐতিহ্যের চেতনা। বাঙালীর জীবনবেদ এবং জীবনতত্ত্বের ধারক যেন এই বৈশাখ। এই জনপদের মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, নিরন্তর ভাঙা-গড়া, সর্বোপরি আজীবন সংগ্রাম-সাধনা, বিদ্রোহ-বিপ্লব — এই সমস্ত কিছুর মধ্যে বৈশাখের স্বভাব নিয়ত পরিদৃশ্যমান। বৈশাখ এখানে ঝড় হয়ে, উদ্যত ফণা তুলে আসে ঠিকই। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসে সংগ্রাম করে বাঁচবার এবং শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শিক্ষা। বৈশাখের ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, দুপুরের তপ্ত হাওয়ায়, মেঘের গর্জনে বাঙালী যেন ডাক শুনতে পায় দিন-বদলের, শব্দ শোনে নতুন প্রাণের স্পন্দনের। কবিরাও এইদেশের এই সমাজেরই মানুষ। তাঁরাও শুনতে পান মানুষের প্রাণের স্পন্দন এবং তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁদের কবিতায়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়বস্তু ও রূপ—প্রকরণ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ

আধুনিক কবিতা জটিল যুগেরই প্রতিবিম্ব। সমকালই আধুনিক কবিতার জনক। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটা প্রচন্ড ভাঙা-গড়ার যুগ। এই সময়কালে রাষ্ট্র, সমাজ ও তার অর্থনৈতিক ভিত্তি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। এ সময়ের মধ্যে ঘটেছিল দু'দু'টো মহাযুদ্ধ, ঘটেছিল একাধিক বিপ্লব। পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও তুলনামূলক নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে নানা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটেছিল। তার ফলে মানুষের জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে প্রাক্তন ধারণা ও বিশ্বাস ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। যদিও এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল ইউরোপে, তার আকৃতি এবং প্রকৃতি প্রথমে খুব স্পষ্ট ছিল না এবং বাঙলা সাহিত্যে তার ঢেউ পৌঁছেছিল আট দশ বছর পরে, তবু আধুনিক বাঙালী কবির চিন্তাধারার গঙ্গোত্রী সেইখানে।[১] তাই আধুনিক বাঙলা কবিতার পটভূমিকা বিস্তৃত হয়ে আছে দুই মহাদেশে। বিপর্যস্ত মূল্যবোধেই আধুনিক কবিতার জন্ম। আধুনিক যুগের সংঘাতমুখর পরিস্থিতি পৃথিবীজোড়া অর্থনৈতিক সংকট, চিরন্তন মূল্যবোধের, বিশ্বাসের জগতের দ্রুত অবলুপ্তি কবিতাকে নিয়ে এসেছিল আধুনিক বোধের কাছাকাছি।

এই সঙ্গে এলো পাশ্চাত্ত্য কাব্য-আন্দোলনের ব্যাপক ঢেউ। বিশেষ করে টি.এস. এলিয়ট এবং তার 'ওয়েষ্টল্যান্ড' বা 'পোড়োজমি' বাঙলা কবিতাকে এক তীব্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, তার নৈরাশ্য ও নিরাসক্তি 'ফাঁপা মানুষে'র চিত্রকল্পে প্রকাশিত হলো। এলিয়ট নতুন বিশ্বাসের সঞ্জীবনী ধারায় পূর্ণতর মানবতাকে পুনরুজ্জীবিত করবার আশা নিয়ে 'পোড়োজমি'তে প্রবেশ করেছিলন। তবে এলিয়টের রচনাবলী আমাদের দেশে ১৯৩০-এর পূর্বে তেমন সাড়া জাগায়নি। বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'লরেন্সী উন্মাদনার অবসানে পাউন্ড আর এলিয়ট একই সঙ্গে বাঙলাদেশে পৌঁছল।' বিষ্ণু দের ভাষায় : "এই য়ুরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিকে প্রতিভাত হলো দেরিতে, বলা যায়, প্রায় টি.এস. এলিয়টের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়।"

আমাদের আধুনিক কবিরা কাব্যরচনার প্রাক্কালে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যুগন্ধর প্রতিভা, অথচ অনুভব করেছিলেন তাঁদের যুগসমস্যার সঙ্গে মহাকবির কাব্যস্বভাবের পার্থক্য। তাঁরা বুঝেছিলেন ইংরেজী তথা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অফুরন্ত আকর থেকে আহরণ না করলে নতুন নির্মিতি সম্ভব হবে না। এলিয়টী দীক্ষার প্রাক্কালে সুধীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন : "বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মান্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে, কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না।" জীবনানন্দের মতে, "আধুনিক বাঙালী কবিরা কিছুটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমার জন্য এলিয়ট, পাউন্ড প্রমুখের পন্থা নিলেন। অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিশিষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভের্লেন, চসার বা ইয়েটস ও এলিয়টের সদর্থক বা নঞর্থক মননবৈচিত্র্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।" কিন্তু একসময় এলিয়টের উপর থেকে আস্থা সরে গেল। এসময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু আধুনিক কবিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। বিষ্ণু দে অডেন-স্পেন্ডারের খেয়ালী সাম্যবাদী আস্থা হারিয়ে এলুয়ার ও আরাগঁর কাব্যে আশ্রয়

---

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলকাতা-১৯৫৮, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

খুঁজেছেন। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে আসতে চেয়েছেন। জীবনানন্দ আত্মপরিক্রমা ছেড়ে ক্রমশ সমাজসচেতন হয়ে উঠছেন, তাঁর ছোট নীড় থেকে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন 'মহাপৃথিবী'র বুকে, 'সাতটি তারার তিমিরে' সন্ধান করেছেন ভোরের আলো। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে এসেছে বেদনার স্পৃহা, সুধীন্দ্রনাথে অস্তিত্ববাদী প্রভাব।

আধুনিক কবিতার এই পটভূমিতে আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এভাবে, "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্ততঃ মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।[১] এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রধান তিনটি লক্ষণ ধরা পড়ে —

ক. কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী।

খ. ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তি প্রয়াসী।

গ. সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক।

এই প্রধান তিনটি লক্ষণ ছাড়াও বাঙলা কাব্যের অতি আধুনিকতার আরো কিছু সাধারণ লক্ষণ হলো ঃ

১. নগর-কেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত।

২. বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্য বোধ।

৩. আত্মবিরোধ ও অনিকেত (rootless) মনোভাব।

৪. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সচেতন ভাবে তথ্য/ভাব গ্রহণ।

৫. ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়ার ফলে চিন্তাধারার অসংবদ্ধতা।

৬. ফ্রেজার সহ অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক, এবং প্ল্যাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রমুখ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীর প্রভাব।

৭. মার্কসীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার, প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা।

৮. মননধর্মিতা — অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে দুরূহতার সৃষ্টি।

৯. বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে, যথা — প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম প্রভৃতিতে সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তায় উদ্বেগ।

১০. দেহজ কামনা-বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতির অলজ্জ প্রকাশ।

১১. ঈশ্বর ও প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস।

১২. রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথ সন্ধান।[২]

---

১. আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাঙলা কবিতা, ভূমিকা, পৃ. ১১০।
২. আধুনিক বাঙলা কাব্য পরিচয়, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তুগত দিক থেকে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রধান চারিত্র্য লক্ষণ। তবে বিষয়ই একমাত্র কথা নয়। শিল্পের পূর্ণতা বিষয় এবং আঙ্গিকের হর-গৌরী মিলনেই সম্পন্ন হয়। তাছাড়া আঙ্গিক কোনো নিরপেক্ষ ব্যাপারও নয়। এমনও নয় যে, যে কোনো আঙ্গিকেই যে কোনো বিষয়বস্তুকে পুরে দেয়া যায়। বিষয়বস্তুর চাহিদার প্রয়োজনেই কোনো শিল্পকর্মের আঙ্গিক নির্ধারিত হয়। তিরিশোত্তর আধুনিক বাঙলা কবিতাও তাই নতুন চেতনার প্রয়োজনে নতুন আঙ্গিকের সন্ধান করে নিয়েছিল। অর্থাৎ ভাবধর্মের সঙ্গে শৈলী ও প্রকরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলেই আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রকরণেও বহুবিধ পরিবর্তন দেখা দিলো। নতুন কলেবরের জন্যে প্রয়োজন হলো নতুন পোশাকের। আধুনিক কবিতার এই প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা এভাবে চিহ্নিত করতে পারি —

১. বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য-পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা। পরবর্তী পর্যায়ে অতিব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ অর্থাৎ ভাষা সম্পর্কে সর্বপ্রকার শুচিবায়ু পরিহার।

২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পুরাণ এবং বিখ্যাত কবিদের কাব্য ও ভাবনা থেকে উদ্ধৃতির যত্রতত্র প্রয়োগে সিদ্ধরসকে চূর্ণ করা বা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অনুভূতির সমন্বয় সাধন।

৩. প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধি, উপমা ও বর্ণনার বিরল ব্যবহার। প্রচলিত কাব্যিক শব্দ যথা — ছিনু, গেনু, সনে, হিয়া প্রভৃতির বর্জন।

৪. প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ ও তৎসহযোগে নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি।

৫. শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা।

৬. এই মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বাহুল্য বর্জনের ফলে মধ্যবর্তী চরণের অনুল্লেখ। তজ্জন্য চিন্তাধারার মধ্যে একটা উল্লম্ফনের সৃষ্টি।

৭. নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ।

৮. প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর এবং মধ্যমিলের সৃষ্টি।

৯. গদ্য ছন্দের ব্যবহার।

১০. ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার।

১১. শব্দালঙ্কার অপেক্ষা বিরোধাভাস, বক্রোক্তি, স্মরণ প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের ব্যবহার।

১২. বিষয়-বৈচিত্র্য।[১]

প্রকরণগত এইসব লক্ষণ কোনো একজন বিশেষ কবির মধ্যে প্রকাশ পায়নি। তবে উল্লেখিত লক্ষণগুলির অধিকাংশ যেসকল আধুনিক কবির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীই প্রধান। এই পাঁচজন কবি জীবনানুভূতির সীমা বিস্তৃত করেছেন ও মার্জিত করেছেন নতুন ছন্দ ও চিত্রকল্পের উদ্ভাবনে। আধুনিক

---

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাঙলা কাব্য পরিচয়, কলিকাতা পৃ: ১৪

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যসৃষ্টি আন্দোলনে এঁরাই ছিলেন পুরোধা। এঁরাই প্রথম নির্দেশ করেন রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভাদীপ্ত কর্মের পথে আধুনিক কবিতার মুক্তি অসম্ভব, কারণ আধুনিক জীবনের মূল্যবোধ আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এঁদের কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আজও তার শেষ হয়নি। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের শেষ দিন পর্যন্ত এই স্বেচ্ছাগৃহীত সৃষ্টির ব্রত পালন করে গিয়েছেন। আধুনিক কাব্যে পূর্বোল্লেখিত প্রধান লক্ষণগুলি এদের কাব্যে সর্বাধিক এবং সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে দৃষ্ট হয় বলে পরবর্তী প্রজন্মের কবিরাও এই লক্ষণসমূহ আত্মস্থ করেই তিরিশোত্তর কবিতার ধারাকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আজো।

বিভাগোত্তর পূর্ব বাঙলার কবিতায় বিষয়-বৈচিত্র্য এবং প্রকরণ-শৈলীতে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে। দেশ-বিভাগের পর প্রথম দশ বছর পূর্ব বাঙলার কবিতার ঐতিহ্য ও ভাষা ছিলো কবিদের কাছে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। "নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশ পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ কী হবে তার রাজনৈতিক ইঙ্গিত ভাষা-আন্দোলনের ঘটনাতেই মেলে, কিন্তু তবু প্রশ্ন ছিলো — পূর্ব বাঙলার কবিতা কি বাঙলা কাব্যের মূল ঐতিহ্যের সঙ্গে লগ্ন, নাকি মধ্যযুগে মুসলমান-রচিত দোভাষী পুথির পুনরুজ্জীবন ঘটবে এই বাংলার কবিতায়? এই মতবিরোধের শৈল্পিক প্রতিফলন যেন ফররুখ আহমদ–আহসান হাবীব কিংবা তালিম হোসেন-আবুল হোসেনের কবিতা। এরা সবাই চল্লিশের দশকের কবি। বিভাগপূর্ব বাঙলাদেশে কলকাতা-জীবনেই এঁদের কাব্য সাধনার শুরু। কিন্তু পাকিস্তান-আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রভাবে ফররুখ-তালিমের কবিতা গোড়া থেকেই আহসান হাবীব-আবুল হোসেনের ধারা থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সেই পার্থক্য প্রথমত প্রেরণাগত, দ্বিতীয়ত প্রকাশগত।[১] ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উদ্বেল ফররুখ আহমদ মূলত তিরিশের ঐতিহ্য-সংলগ্ন হয়েও কাব্যবিশ্বাসে অচিরেই স্বাতন্ত্র্যবাদ অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর প্রিয় কবি কোলরিজের নাবিক ফররুখের কবিতায় নতুন ভূমিকায় ফিরে এসেছে। আরব্য-উপন্যাসের সিন্দাবাদের মতো সে এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী। নতুন দেশের সন্ধানে তার যাত্রা। পক্ষান্তরে আহসান হাবীব ও আবুল হোসেন আবহমান বাঙলা কাবিতার যে-ধারাটি তিরিশের শক্তিমান কবিদের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছিলো, তারই উত্তর- সাধক। সৈয়দ আলী আহসান আবার ইসলামী মনোভঙ্গির পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য কাব্যবোধে হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক। অচিরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পাশ্চাত্য-শিল্পভাবনা ও আঙ্গিকের দ্বারা কবিতাকে বিজড়িত করে নিতে না পারলে আধুনিকতায় উত্তরণ সম্ভব নয়। প্রকৃত বিবেচনায় আধুনিক বাঙলা কবিতার ধারায় চল্লিশের কবি আহসান হাবীব, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিকতার সূচনা হয়েছে তাঁদেরই হাতে। পঞ্চাশের দশকে অর্থাৎ এই পর্বে সৈয়দ আলী আহসান ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে আধুনিক। অন্যদিকে আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সানাউল হক একই বোধে উজ্জীবিত হয়ে কবিতা রচনায় গ্রহণ করেছেন মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। আবহমান বাঙলা কবিতা এবং তিরিশের ও চল্লিশের আধুনিকতার ঐতিহ্য গ্রহণ করেই কাব্যচর্চায় সক্রিয় থাকতে চেয়েছেন তাঁরা।

কবিতার শরীরে সঙ্কেত ও প্রতীকের যে লীলা তা কখনোই দুর্বিশ্লেষ্য নয়। এইসব আপাত জটিলতার নেপথ্যে কবিতার মর্মে কাজ করে সমাজ, দেশ, কাল। একজন নজরুল ইসলাম কেন রাবীন্দ্রিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হতে পারেন না — তার উত্তর মেলে উভয়ের কালিক ও সামাজিক ব্যবধানের ভেতরে। গোলাম মোস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, অথবা আবদুল কাদিরের কবিতায় একই কারণে তিরিশোত্তর কবিতার স্বভাব অনুপস্থিত। এমনকি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও পূর্ব বাঙলার

---

১. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, কথা ও কবিতা, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় এদের পক্ষে মৌলিক ধারার উদ্বোধন কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেই দায়িত্ব যাদের উপর বর্তায় তাঁরা বয়সে তরুণ এবং শিল্প-সাধনায় নবীন একদল কবি। নতুন কবিতা এদেরই অবদান। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ- আবেগ জীবনের অভিব্যক্তি এই নতুন কবিতা। নতুন কবিদের নাম জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। লক্ষণীয় যে, এই আগন্তুক কবিকুল যেমন সমকালীন প্রধান কবি ফররুখ আহমদের আদর্শ থেকে দূরে তেমনি তিরিশের নাগরিক বিষাদ ও একাকিত্ব থেকেও বিচ্ছিন্ন। কেবল শামসুর রাহমানের বাকভঙ্গিতে ছিলো জীবনানন্দের প্রতিধ্বনি, কিন্তু তা-ও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[১]

প্রত্যাশিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অভাবই ছিলো নতুন মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক বিক্ষোভের উৎস। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিতায় সেই অসন্তোষের পরিচয় মেলে। ক্রমাগত বিপর্যয়ের আঘাতে মধ্যবিত্ত মানসের স্বপ্নাবলি কেবলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও অভিব্যক্তি বাংলাদেশের কবিতার সাধারণ লক্ষণ। সামাজিক অভিজ্ঞতা অভিন্ন হলেও সকল কবির প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না এবং সেটা আকাঙ্ক্ষিতও নয়। শামসুর রাহমান থেকে নির্মলেন্দু গুণ পর্যন্ত কবিকর্মীদের আবেগ তাই বিচিত্র ধারায় উৎসারিত। কবিতার সনাতন বিষয় প্রেম ও নিসর্গকে এরা প্রত্যাখ্যান করেননি। কিন্তু এই কবিদের রচনায় পূর্বসূরী জসীমউদদীনের একমাত্রিক এলিজি যেমন অনুপস্থিত তেমনি শাহাদৎ হোসেন অথবা আবদুল কাদিরের রূপ-তন্ময় ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গিও।[২]

আহসান হাবীবের কবিতার মুখ্য ব্যাকরণ সমাজসচেতনতা। তাঁর কবিতার Social Sence[৩] প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের Simple Songs[৪] লোকজ বাস্তবতার অতি সাধারণ অথচ হৃদয়গ্রাহী ছবি, ঐতিহ্য সচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মৃত্যু-ভাবনা, প্রেম-ভাবনা-ইতিহাস-সচেতনা, অবচেতনা কাল বা সময় কিংবা স্বদেশ ভাবনা — তাঁকে তিরিশোত্তর কবিতায় এক বিশিষ্ট (উচ্চকণ্ঠ নয়) নম্র অথচ শক্তিশালী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

আহসান হাবীব শব্দ সম্পর্কে সচেতন। সে সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে পরিচিত শব্দের সার্থক ব্যবহারে। হাসান হাফিজুর রহমান বাঙলা কবিতার ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন — প্রথম থেকেই এর ভাষা লোকের মুখের ভাষা।[৫] এই লোকমুখের ভাষা আহসান হাবীবের কবিতাকে একদিকে যেমন বিশিষ্টতা দিয়েছে অপরদিকে সমাজ-বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্তে রচিত 'হুহি জঙ্গনামা' কবিতার কুমির ও বাঘ অত্যাচারী এবং শোষকের প্রতীক হিসেবে এসেছে, অপর দিকে 'হুজ্জুত সরদার' সংগ্রামী চেতনার বলয়ে নিজের অহংকে প্রকাশ করে এক দার্ঢ্য উচ্চারণে —

জ্বি হুজুর একদিন এই দুইহাতে = ৮ + ৬
লড়েছি এগারো হাত কুমিরের সাথে, = ৮ + ৬
গাঙের কুমির টেনে তুলেছি ডাঙায় = ৮ + ৬

---

১. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, কথা ও কবিতা, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ১৩৯
২. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, কথা ও কবিতা, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ১৩৯-৪০
৩. Literature of Bangladesh and other Essays; Zillur Rahman Siddique-P.5
৪. Bangla Academy Journal (ed) Kabir Chowdhury, Summer, 1970. P.95
৫. হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলা কবিতা : জীবনীশক্তির একটি দিক, আলোকিত গৃহবর, পৃঃ . ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙ্গেছি বাঘের মাথা এই বাম পায়ে = ৮ + ৬
এক হাতে ঠেকিয়েছি পঞ্চাশ লেঠেল = ৮ + ৬
দশখানা লাঠি নিয়ে দেখিয়েছি খেলা = ৮ + ৬
হুজ্জুত সরদার আমি মানুন একিন। = ৮ + ৬
(ছহি জঙ্গনামা)

'প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা' কবিতায় হাবীব পুঁজিবাদী সমাজের অপরিসীম লালসাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। কারণ সম্পদের লালসা মানুষে মানুষে গড়ে তুলেছে বিভেদের প্রাচীর, বৈষম্যের দালান, এবং সম্পদগর্বে ভুলেছে 'আপন আত্মীয় এবং শিশুপুত্র কিশোরী কন্যার মুখ : এবং 'একদা/ ....সোনার কুৎসিত কর্কশ কাঠিন্যে প্রাণ-ওষ্ঠাগত'। ফলে কবির প্রাণ ধনবাদী বিশ্বে একবিন্দু নির্মল জলের প্রার্থনায় ব্যাকুল। 'মিডাসের' প্রতীকের আড়ালে ধনবাদী বিশ্বের কুৎসিত চেহারাকে তিনি কবিতায় মূর্ত করেন এভাবে :

কেটেছে কৈশোর
কৈশোরের আরাধনা করেন যৌবনে
বিলিয়ে নিঃশেষ করে সুচতুর বরদাতা বাক্কাস-এর পায়ে
প্রমত্ত মিডাস আমি দেহের প্রাণের
সব সুধা লাবণ্যের বিনিময়ে অন্য এক বন্দরের ঘাটে
কুড়াই অশেষ সোনা দিনরাত্রি।

এখানে মিডাস[১] পুঁজিবাদী সমাজের অপরিসীম লালসার প্রতীক। মিডাস গ্রীকপুরাণে ফ্রিজিয়ার রাজা। সুরাদেবতা বাক্কাস[২]-এর বন্ধু। মিডাস বাক্কাস-সহচর সইলেনাসকে[৩] এক বিপদ থেকে রক্ষা করার প্রেক্ষিতে বাক্কাস তাকে বর দিয়েছিল যে, মিডাস যা স্পর্শ করবে তাই সোনা হয়ে যাবে। মিডাসের মতো ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সম্পদ লেলিহানজিহ্বা কবিকে এখানে ক্ষুব্ধ করেছে।

বিভিন্ন অলংকার প্রয়োগের ভেতর থেকেও উঠে এসেছে এই সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের চলচ্ছবি। রাগ-অনুরাগ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, সংগ্রাম-প্রতিবাদ, ভালোবাসা-অভিমান — সর্বোপরি স্বদেশের প্রতি আহসান হাবীবের অকৃত্রিম ভালোবাসা কাব্যরূপ পেয়েছে এইসব পঙক্তিতে।

স্বভাবোক্তি অলংকার : শহর পিরোজপুর,
সরকারী স্কুলের খেলার মাঠ
পশ্চিমে প্রশাসকদের বাড়ি-ঘর।
পূর্বে স্কুল-বাড়ি, সামনে বাগান, তার সামনে পুকুর
উত্তরে আদালত কাছারি
দক্ষিণে উকিল মোক্তার ইত্যাদি
মাঠে রাত ন'টার অন্ধকারে পাথরের মত ভারি
সেই মাঠের মাঝখানে দু'হাঁটুতে জোড়াহাত
তার ওপরে কপাল
আমি একদিন কেঁদেছিলাম।

---

১. মিডাস, প্রতীচ্য পুরাণ, ফরহাদ খান - পৃ. ১৭২-১৭৩
২. বাক্কাসের অন্য নাম ডায়োনিসাস - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৬
৩. সাইলেনাস : কৃষকদের সঙ্গে ঝগড়া করায় কৃষকেরা তাকে বেঁধে রেখেছিল গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে। পূর্বোক্ত-পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

উপমা :

১. দিনগুলি মোর বিকল পক্ষ পাখির মতো (রা. শে)
২. এবার বন্যার মতো আঁখিজল আনুক বিদ্রোহ (রা. শে - ৫৪)
৩. বিনয়ী মোষের মতো সন্ধ্যাবেলা একে একে/সার বেঁধে রাস্তায় দাঁড়াই। (ঐ-৩৮)

উৎপ্রেক্ষা :

১. এ মানুষ চলে যেন মৃতের মিছিল, (রা. শে. ৪৩)

২. চিত্রিত দেশের
চূর্ণ আভা জ্বলে দেখ
মিছিলের সব মুখে মুখে
সব মুখ দেশের আত্মার আরশি যেন।
সব মুখ দেশের আরশিতে আঁকা যেন
সারাদেশ সবই মিছিলে (আ. ব. ৪৬)

অনুপ্রাস :

ভয়ে ভীত শত শত সভ্যতার চতুর দালাল।

শব্দের সাঙ্গীতিক ধ্বনিকে আশ্রয় করে গদ্যছন্দের কবিতায় পাওয়া যায় সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অসন্তোষ ও সংক্ষোভের চিত্র :

পৌরসভার সভাপতি মহোদয়,
মানি, রাস্তা থেকে জঞ্জাল সরাবার ব্যবস্থা আপনার পরিপাটি
পানি সরবরাহের ব্যবহার (যেমন ওয়াসা ব্যর্থ)
আপনার ত্রুটি নেই কোনো
বসন্ত রোগের গতিবিধি আপনার চোখ এড়ায় না
নিয়মিত শুনতে পাই আপনার হুঁশিয়ারি
ছড়িয়ে পড়ে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়
..... আপনাকে ধন্যবাদ
(মে ব চৈ যা, ১৫)

পঞ্চাশের দশকের শেষ ও পুরো ষাটের দশক জুড়ে যে সময়টি অতিবাহিত হয়েছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে ঐ সময়টিই আমাদের জাতীয়-চৈতন্যের মৌলিক চরিত্রটিকে প্রকটিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে এ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির বিকাশ ও পরিণতি ঘটে ঐ সময়েই। আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশের বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের বাংলাদেশে বোধ ও চেতনায় বিপুল পটপরিবর্তন ঘটেছে। সাতচল্লিশের তথাকথিত স্বাধীনতার পর একদিকে যেমন

Dhaka University Institutional Repository

কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ঘটেনি, তেমনি ক্রমাগত ঔপনিবেশিক শক্তির অশুভ আক্রমণে আমাদের মানসজীবন ছিলো পর্যুদস্ত। এই অবস্থার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াতেই ষাটের দশকে আমাদের জাতীয় চেতনা দানা বেঁধে ওঠে এবং ধীরে ধীরে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে জাতির অন্তরাত্মা। আমাদের সেই সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক উদ্বর্তনে 'সমকালের' অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[১] ১৯৫৭ সালে সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় 'সমকাল' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। "এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে নতুন লেখক সৃষ্টি ও মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা হিসেবে তাঁর (সিকান্দার আবু জাফরের) দান অবিস্মরণীয়, আর সমকাল তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।[২]

সিকান্দার আবু জাফরের অধিকাংশ কবিতায় সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কবি লিখেছেন, 'সমাজের সঙ্গে কথা বলতেই আমার বেশী আনন্দ।'[৩] এ সমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর কাব্যজগৎ। প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই প্রকাশিত হয়েছে চাপা বিক্ষোভ ও অসন্তোষ, কিন্তু কবি হতাশায় আচ্ছন্ন হননি। অসন্তোষের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে একটা আশ্বাসের আভাস। এদিক থেকে সিকান্দার আবু জাফরকে নিঃসন্দেহে সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বার বার দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ কখনই বৃথা যেতে পারে না। তাই তাঁর উচ্চারণ :

প্রদীপ্ত ইঙ্গিতে তার পার হবো একদা এ রাত্রির আকাশ বারবার
ভুলে যাবো ব্যর্থতার তিক্ত ইতিহাস। অকম্পিত আমার এ হাতে
রাখো পূর্বাশার প্রভাদীপ্ত হে প্রভাত। নতুন প্রভাত।

(প্রভাত, প্রসন্ন প্রহর)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত 'ফাল্গুন হক গান' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। অতীত স্মৃতিচারণার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের দুঃসহ যন্ত্রণার তুলনা করে সাম্রাজ্যলোভীদের বীভৎস আচরণের প্রতি ব্যঙ্গ- মুখর হয়েছেন এবং পরিশেষে মানবতার অসম্মানে ব্যথিত হয়ে বলেছেন —

মারণমন্ত্রে মুখর কণ্ঠ বোমারু বিমানগুলো
সেদিন আকাশে হয়নি হাজার তারা।
সেদিন ছিলো না জীবনধাত্রী ধরা।
নির্মম এতোখানি,
মানুষের ছিলো বুকভরা প্রীতি প্রেম।

(ফাল্গুন হক গান, প্রসন্ন প্রহর)

সমাজচিত্রমূলক বেশকিছু কবিতায় বিম্বিত হয়েছে কখনো সমকালীন রাজনৈতিক ধূর্ততা ও স্বার্থপরতার চিত্র, কখনো গ্রামীণ জীবনের কুটিল রাজনীতি, দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। এধরনের কবিতার মধ্যে 'অগ্নিগিরি, তিমিরান্তিক, দিগন্ত কারাগার, সমস্বর, বিক্ষুব্ধ ঘোটক, পথ হাঁটছে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'তিমিরান্তিক' কবিতাটিতে কবি সমাজের একটি অন্ধাকরময় দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অনিবার্যভাবে এসেছে সেইসব শব্দ যা দৈনন্দিন জীবন থেকে আহৃত। ঘেয়ো কুকুর, কুকুর শাবক, প্রভৃতি এসেছে রূপক হিসেবে —

---

১. হায়াৎ সাইফ, উক্তি ও উপলব্ধি, শিল্পতরু, ১৯৯২, পৃ: ৩
২. মাহবুবা সিদ্দিকী, সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকর, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ: ১১
৩. সিকান্দার আবু জাফর, প্রসঙ্গ কথা, প্রসন্ন প্রহর, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বসন্ত পূর্ণিমার প্রস্তুতির জন্যে
ধৈর্য ধরবে না বলে
রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুর
তাকে টেনে নিয়ে যাবে
ডাস্টবিনের অন্ধকারে
উপহার নেবে
অনেকগুলো বিধ্বস্ত মুহূর্ত।
(তিমিরান্তিক, 'কবিতা ১৩৭২')

'দিগন্ত কারাগার' কবিতাটি সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশ অবলম্বনে রচিত। সাম্রাজ্যবাদী শোষক ও শাসক শ্রেণী, যাদের শোষণ এবং শাসনে সাধারণত জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, অবারিত দিগন্ত আবৃত করেছিলো যাদের কুটিল মন্ত্রণা তাদেরই উদ্দেশে এ কবিতাটি রচিত। এরা শোষণ ও শাসনের অত্যাচারে মানুষের সহজ সূর্যের হাসির মতো আনন্দকে রূপান্তরিত করেছে ব্যর্থতার কান্নায় —

আমি ত' জানিনে কোথা আছে সেই যন্ত্রাগার
যেখানে আগুন গলিয়ে গলিয়ে প্রত্যহ
সহজ হাসিকে কান্নায় করে রূপান্তর।
(দিগন্ত কারাগার, 'কবিতা ১৩৭২')

উপমা —

১. ভাঙ্গা শামুকের খোলার মতন
যে আমার পায়ে পায়ে
ধারালো দাঁতের ছোবল বসিয়ে
রক্ত ঝরায়
কি করে ঢাকব — আড়াল করব তাকে?

২. বহু বুভুক্ষা ছেয়ে
অনেক নিথর মৃত্যু নামছে
দীর্ঘ ঘুমের মত।

রূপক —

১. সে রাত্রির নীরবতা রোমাঞ্চ আনেনি
রক্তপায়ী শকুনেরা দিয়েছিল হানা

২. অধিকার নিতে এসে যারা দিল প্রাণ
তাদের ক্রন্দসী ডাকে আজি পূর্বাশার
নৈশাচারী পেঁচকের অমঙ্গল গান।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু সিকান্দার আবু জাফরের কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষ তথা জনতা। এই জনতা ও তাদের সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যের বিভিন্ন ধরনের উপমা ও রূপকে ব্যবহৃত হয়েছে এই সমাজ থেকে উঠে আসা শব্দাবলী। বিশেষত শকুন, কুকুর, রক্তপায়ী বাদুড়, রাত্রি, আলো, প্রভাত, যোগ, স্বপ্ন, পূর্ণিমা, সূর্য প্রভৃতি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে এইসব উপমা ও রূপকে। স্বর, মাত্রা ও অক্ষরবৃত্ত — এই তিন ধরনের ছন্দই সিকান্দার আবু জাফর ব্যবহার করেছেন সফলতার সঙ্গে।

আবুল হোসেনের কবিতায় যেমন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দেশকাল সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজ- বাস্তবতার চিত্র প্রতীকায়িত হয়েছে তেমনি তার আঙ্গিক নির্মাণে আছে সযত্ন প্রয়াস। কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ : "আমার চিন্তা, আমার ভাবনা, আমার অভিজ্ঞতা, সবই তো আমার প্রতিবেশের হয়ে রঞ্জিত হতে বাধ্য। .... যতই ব্যক্তিগত হোক আমার প্রতিক্রিয়া, আমার অভিজ্ঞতা, প্রাত্যহিক জীবনে যাদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় অথবা আমি যা যা দেখি, তাদের সকলের বিবেক এবং চেতনা আমার কবিতায় প্রতিফলিত, প্রতিধ্বনিত হবেই।"[১] আর এ কারণেই সমসাময়িক দেশকাল তাঁর কবিতার একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে —

আমার মন এক ছোট দ্বীপ
নিঃসঙ্গ নির্জন।
... ...
শুনিনি পাখির ডাক বাঘের গর্জন
মানুষ তো আরো দূর।
শুধু আছে সমুদ্দুর যতদূর দেখা যায়।
আর আছে তারও চেয়ে নিষ্ঠুর সময়।
(দ্বীপ)

সময়ের পটভূমিতে ব্যক্তিক নৈঃসঙ্গ্যবোধ এবং মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধ জীবনকেই উপজীব্য করে তোলা হয়েছে এখানে। আধুনিক মানুষের জীবন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে। আর এ রকম পরিস্থিতিতে সব কিছুই কবির কাছে মনে হতে পারে অসহনীয়, অস্তিত্বের বিরোধী বলে। আবার এই পরিবেশকে বদলে নেওয়ার ক্ষমতা নেই বলে তিনি জর্জরিত হতে পারেন আত্মবিদ্রুপের শানিত ব্যঙ্গবাণে :

তবু বেঁচে আছি।
সকালে নাস্তা, দুপুরে বালিশ,
মাঝে মাঝে ছুটি হাওয়া বদলানো,
ঘরোয়া তর্কে আকাশ ফাটানো।
কখনো ঢাকা কখনো করাচি।
(বাঁচবো কি)

---

১. আবুল হোসেন, 'আত্মবিবৃতি', স্বনির্বাচিত, পৃ: ২২

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন মধ্যবিত্তের জীবনচরিত ব্যক্ত হয়েছে এখানে। এই সহজ সরল বাণীর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে সমকালীন সমাজের চিত্র। তবে একথা বলা যায়, আবুল হোসেনের কবিতা প্রথমত দেশ-চেতনা এবং দ্বিতীয়ত জীবনপ্রীতির কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে—

ধান তো আর নেই পাটও শেষ
বছর বছর ডোবে দেশ।
(দেবো, সব দেবো)
আমাদের গান মেশে
উত্তরে পশ্চিমে পুবে চলতি হাওয়ায়,
আওয়াজ ছড়ায়
দেশে দেশে, আমাদের প্রাণের স্বদেশ।
(স্বদেশী কোরাস)

জাতীয়তাবাদী সংগ্রামই মূলত এইসব কবিতার উৎস। "আবুল হোসেনই বাঙলাদেশের প্রথম আধুনিক কবি। আধুনিক কবিতার মৌল স্বভাবটি তিনি সবচেয়ে ভালো বুঝতে পেরেছিলেন।"[১] আমাদের মধ্যে আবুল হোসেনই প্রথম কবি যিনি সাম্প্রতিক আঙ্গিককে অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে ব্যবহার করে আপন স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। — বাঙলা কবিতার উচ্ছ্বাস এবং উচ্চসুরকে সর্তকতার সঙ্গে পরিহার করে আধুনিক কালের সময় সচেতনতায় তিনি তাঁর কবিতাকে উন্মুখর করেছিলেন।[২] কবিতার ভাষা-ব্যবহারেও তিনি সচেতন ছিলেন। তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী বা লোকজ ও বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে তৎকালীন সমাজের নানা চিত্র তিনি অকাতরে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লাইন ধরে কুলিরা দাঁড়ায় কিচির মিচির সারাক্ষণ
চ্যাঁচায়, খাবার চাই, টাটকা খাবার, সাঁচী পান, তানসেন
ট্যাবলেট, চাই সিগারেট, বিড়ি, পাউরুটি ফিরপোর,
গরম চা, শোরাবজীর তকমা-আঁটা খানসামার ট্রের উপর
(নব, ভত)

উপমা :

বেলাভূমিতে ঝিনুকের মতো অগণ্য দ্বীপ হঠাৎ/মেঘের ফাঁকে দেখা দিলো চাঁদ/ডাফরীনে মুমূর্ষু পাণ্ডুর মেয়ের মতো।

(ঘোড়সওয়ার, নববসন্ত)

হয়তো সন্ধ্যায় ডেকে উঠবে শেয়ালের পাল
ভূতের মতন অন্ধকারে, সোনালী ধানের মতো রোদ আসে।
(উত্তরাধিকার, নববসন্ত)

---

১. হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, ঢাকা, দ্বি. স. ১৯৭৩, পৃ: ২৫৪।
২. ফজলে রাব্বি (সম্পাদক, বই, জুলাই ১৯৮২, পৃ: ১।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপ্রেক্ষা :

বালুকার ব্যাকুলতা, ক্লান্ত রাতে মায়াময় চাঁদ
আমার মনের পাতে পড়ে যেন তাহারই প্রসাদ।

স্বভাবোক্তি :

আমরা তো ডুবে আছি মৃত্যুর অতল অন্ধকারে"

নিশ্চয় :

'তোমরা যাও'
আমি বরং এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো।

আবুল হোসেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বিরস সংলাপে অনেক সার্থক ও সুন্দর চিত্রকল্পের সাক্ষাৎ মেলে। যার ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে তৎকালীন সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি —

ঢাকার গর্তে ভরা রাস্তায় ঠেলাগাড়িতে
যেমন হড়হড় করে গরুর গোশত নিয়ে যায়
রঙচটা স্ট্রেচারে দুমড়ানো সাদা চাদরে মুড়ে
হাসপাতালের ট্রলি ডাক্তার নার্স আয়া আর
ওয়ার্ডবয়দের ভিড় ঠেলে সরু করিডর দিয়ে
এঁকে বেঁকে নিয়ে গেলো তাকে।

অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ,স্বরবৃত্ত, গদ্যছন্দ এমন কি ফ্রীভার্সে কবিতা লিখে আবুল হোসেন শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চাশের মধ্য পর্যায়ে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সূত্রে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সৈয়দ আলী আহসানের কাব্য-ভাবনা। ইতোপূর্বে দোভাষী পুথি অবলম্বনে লেখা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চাহার দরবেশ' (১৯৪৫) তাঁকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেনি। ফলত, ইসলামী ভাবাবহ অনুষঙ্গ ত্যাগ করে তিনি আধুনিক বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতি গ্রহণে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। বহির্জাগতিক কোনো সংকট নয়, মানুষের সকল চৈতন্যকে অনুভব করার চেষ্টায় দেহকেই অস্তিত্বের সারাৎসার হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। এই অস্তিত্ব অনুভবের অর্থ হলো দেহ, প্রেম, হৃদয়, কামচেতনা, সৌন্দর্যতৃষ্ণা, প্রকৃতি এসবকে ঘিরেই মানবিক আবর্তন, অন্বেষা ও আস্বাদন। স্বদেশ চেতনার অন্তরঙ্গ অনুভবও তাঁর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

হোরেস (খ্রি. পূ. ৬৫ — খ্রি. পূ. ৮) তাঁর Ars Poetica-য় বলেছেন, কবিদের জন্য আমি এই অবশ্য পালনীয় সূত্র নির্দেশ করছি যে, অভিজ্ঞ কবি সর্বদাই আদর্শের জন্য মনুষ্য জীবন ও চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন এবং তা থেকে জীবনের সত্যিকার রূপের ব্যঞ্জনা দিতে সমর্থ ভাষাভঙ্গি আবিষ্কার করবেন।[১] সৈয়দ আলী আহসান কাব্যসাধনার প্রারম্ভে এই ভাষাভঙ্গি আবিষ্কার করতে না পারলেও তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অনেক আকাশ' -এ প্রচলিত শব্দকে নতুন ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছেন।

---

১. হোরেসের কাব্যতত্ত্ব, অনু. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ : ২৬

Dhaka University Institutional Repository

এরিষ্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) বলেছেন — কবিতার ভাষায় সবচেয়ে বড়গুণ হচ্ছে এই যে, তা হবে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। এই স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার মৌলধর্ম। অতি পরিচিত শব্দে গঠিত 'আমার পূর্ব বাঙলা' শিরোনামে তিনি যে তিনটি কবিতা লিখেছেন তার প্রথম কবিতার অংশ —

আমার পূর্ব-বাংলা কি আশ্চর্য
শীতল নদী
অনেক শান্ত আবার সহসা
স্ফীত প্রাচুর্যে আনন্দিত।

(আমার পূর্ব বাঙলা, একক সন্ধ্যায় বসন্ত)

সৈয়দ আলী আহসানের দৃষ্টিতে এই হচ্ছে ষাটের দশকের পূর্ব বাঙলা। বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ নিয়ে যখন সমকাল-সম্পৃক্ত, ঘটনামুখ্য কবিতা লেখা হচ্ছে, তখন সৈয়দ আলী আহসান শান্ত সমাহিত দৃষ্টিতে দেখছেন পূর্ব বাঙলার সজীব প্রগাঢ়রূপ। রাজনৈতিক বা জাগতিক কোনো সংগ্রাম নয় চিরায়ত সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন তিনি। হয়তো সমকালীন সমাজ-বাস্তবতাকে তিনি কবিতায় প্রতিফলিত করতে চাননি। কেননা, পূর্বাপর তিনি জনতার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে শাসকচক্রের সঙ্গেই সম্পৃক্ত থেকেছেন। ফলে তাঁর কবিতায় সমকালীন সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-দারিদ্র্য, সংগ্রাম-প্রতিবাদের কোনো চিত্র প্রতিফলিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, জীবনানন্দের কাব্যভঙ্গির প্রভাব তাঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট।

বাংলাদেশের বর্তমান কালের যে কবিকৃতি তা বোধগম্য কারণেই এদেশের জীবন-যাপনের বৈশিষ্ট্য- সমূহকে নানাভাবে ধারণ করে আছে। আর এই ধারণকৃত বিষয়-আশয়ে যে জীবনবোধ ও বিশ্ববীক্ষা তা এদেশেরই জাতিগত চৈতন্যের প্রতিভাস, যদিও তা বিভিন্ন সময়ের নান্দনিক উৎকর্ষের প্রতুলতা বা অপ্রতুলতার ও অন্যান্য বহুবিধ বিশিষ্টতায় বিচিত্রভাবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু নান্দনিকভাবে উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ হওয়াটা মূলত আমাদের যৌগিক অবচেতনের জীবন প্রত্যয় ও চূড়ান্ত বিচারে পুরুষার্থের উদ্বোধনের ওপরেই প্রধানত নির্ভরশীল । বলাবাহুল্য, জাতীয় চেতনার যে বিপুল জোয়ার একাত্তরের যুদ্ধে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছিল তার তরঙ্গভঙ্গ সময়ের ব্যবধানে আজকে থিতিয়ে এলেও ঐ সময়ের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষা এদেশের বর্তমান সমাজের আত্মপরিচয়ের স্থায়ী চিহ্নসমূহকে সনাক্ত করেছিল নিঃসন্দেহে। এবং সেই চিহ্নসমূহ প্রধানত এই মাটি ও মানুষেরই জীবন ও জীবিকার মধ্যে গভীরভাবে নিহিত।[১]

বিভাগোত্তর বাঙলা কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিচারে কবিকৃতির কয়েকটি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়ে বর্তমান কালের দিকে অগ্রসর হলে অবশ্যম্ভাবীরূপে লক্ষ্য করা যাবে এই সময়ে রচিত কবিদের কাব্যের যে চারিত্র্য তা প্রকৃতপক্ষে যে সমাজ থেকে তাঁদের উদ্ভব সেই সমাজ-বাস্তবতা, তার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। কবি যেহেতু সমাজ বহির্ভূত কোনো মানুষ নন। তাই এই সমাজেরই হাসি-কান্না, দুঃখ-সুখ, বিদ্রোহ-বিপ্লব এবং রক্তপাতের ভেতর দিয়ে সমৃদ্ধ হয় তাঁর অভিজ্ঞতালোক। কবিতা এক অর্থে অভিজ্ঞতারই নির্যাস। সমাজ-জীবনের এই পটভূমিতে কবি আবদুল গনি হাজারীকে কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণী কিংবা স্কুলভুক্ত করা কষ্টসাধ্য। তিনি

---

১. হায়াৎ সাইফ, উক্তি ও উপলব্ধি, শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ: ৩০

Dhaka University Institutional Repository

লিখতে শুরু করেন চল্লিশের দশকের শেষ দিকে, লিখেছেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, মৃত্যুর পূর্ব অবধি, সত্তর দশকের গোড়ার দিকেও। স্পষ্টতই ধর্মীয় ঐতিহ্য যাঁদের কবিতার অন্যতম মৌল প্রেরণা, যেমন ফররুখ আহমদ, তাঁদের সঙ্গে হাজারীকে এক পঙক্তিতে ফেলা যাবে না। অথচ হাজারীর অনেক কবিতায় মুসলিম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত শব্দাবলি, চিত্রকল্প ও উপমা, মাঝে মাঝে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে হুবহু 'আরবী চরণে'র সংযোজন লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু তাঁর কাব্যে এই ধর্মীয় অনুষঙ্গের উপস্থিতি পুনরুজ্জীবনবাদী নয়, পুনর্জাগরণবাদীও নয়, তা তির্যক, কখনো কখনো ব্যঙ্গধর্মী, কখনো কখনো ভিন্ন পরিবেশের পাশে বৈপরীত্যের চিত্র নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। এক কথায় তা গতানুগতিক, প্রাচীনপন্থী, প্রধানত অনুভূতি আশ্রয়ী নয়, তা নিরীক্ষাধর্মী, আধুনিক এবং প্রধানত বুদ্ধি নির্ভর।[১] আবদুল গনি হাজারীর কবিতায় চল্লিশের কবিতার অনেকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ ফুটে বেরিয়েছে — গদ্য কবিতা, সাধারণ মানুষের জন্য মমত্ববোধ ইত্যাদির দিক থেকে তাঁর অবস্থান চল্লিশের বামপন্থী কবিতার পাশেই। ..... আর কাব্যিক কুশলতা হিসাবে এসেছে গদ্যআত্মকতা, শব্দে, বাক্যে, ছন্দহীনতায়, জীবন ব্যবহারে, নাট্যীভবনে, পুরাণের প্রয়োগ, উপমার পৌনঃপুনিকতা, উপর্য্যুপরি বিচ্ছিন্ন উল্লেখ।[২]

আধুনিক কবিতার অন্যান্য লক্ষণ যা আমরা আবদুল গনি হাজারীর কবিতায় লক্ষ্য করি, তা হচ্ছে নাগরিক আবহ, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সমাজের ভাঙ্গা-গড়া তথা শ্রেণী বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং এই সবের প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও একটা তির্যক ব্যঙ্গের সুর। রাজনীতির আবহও তাঁর কাব্যে উপস্থিত কিন্তু তা মৃদু এবং পরোক্ষ। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব তাঁর কবিতায় দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারিত। শোষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নগর-সভ্যতার পচন সম্পর্কে কিন্তু হাজারীর প্রতিক্রিয়া তীব্র। ঐশ্বর্যের ঝিলিমিলি শহরে তিনি দেখেছেন :

কারখানার নর্দমা
শতাব্দীর শরীরে সভ্যতার নিষ্ঠীবন
পাট কোম্পানীর লঞ্চে
অপ্রাসঙ্গিক উৎসব
(অপ্রাসঙ্গিক উৎসব)

হাজারী বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের বিবিধ সংকটের অনবদ্য রূপকার। 'প্রেসক্লাবে তোমরা' কবিতায় একদিকে ব্রিজের হুল্লোড়, অন্যদিকে দরিদ্র পিওনের ওভারটাইমের দেনা, বাড়িতে অসুস্থ কন্যা, শিয়রে ম্লান প্রদীপ আর দাগকাটা শিশি, এবং

মায়ের প্রার্থনা,
দয়ালু ডাক্তার
(এম. বি. হোমিও)
হাতযশ
আর সব আল্লার হাত।

---

১. কবীর চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, শি.ত.প্র. ঢাকা, ১৯৯২, পৃ: ৭৪
২. আ. মা. সৈ, আ. গ. হাজারী, বা/এ, ১৯৮৯, পৃ: ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী-বৈষম্যের চিত্রটিতে আরো তীক্ষ্ণতা এনে দিয়েছে এই সত্য যে, পিওনের পকেটে রয়েছে বাড়ি পৌঁছে দেবার চিঠি, ককটেল নিমন্ত্রণের। অসুস্থ কন্যার কাছে তাড়াতাড়ি তার ফেরার উপায় নেই, মালিকের কাছ থেকে আগাম বেতন বাবদ কিছু পাবার সম্ভাবনাও শূন্য, তাতে নাকি প্রভুর নিশ্চিত ক্ষতি।

সমাজের একটি ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের নিপুণ চিত্রাঙ্কনে হাজারী বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তা হলো জাগতিক সাফল্য-অভিসারী উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্র। এ প্রসঙ্গে কবির জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি বহন করে আনা 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। হাজারীর অন্যান্য কবিতার মতো এটাও ড্রামাটিক মনোলগ, যদিও কথাগুলি কোরাসে উচ্চারিত বহুবচনে। উক্তিটি কতিপয় ধনী গৃহিণীর, উচ্চপদস্থ আমলার স্ত্রীদের। টাকা-পয়সার অভাব নেই, কসমেটিকসের অভাব নেই, স্বামীর পদাধিকার বলে নানা সামাজিক ক্রিয়াকান্ডে সম্মানিত অতিথির আসন লাভে ঘাটতি নেই, কিন্তু শান্তিও নেই; তৃপ্তিও নেই, জীবনে কোন আনন্দ নেই। এই কতিপয় আমলার স্ত্রী বিশ্রামে বিধ্বস্ত।

কোমরের উপত্যকায় মেদের আক্রমণ
উদরের স্ফীতি
চিবুকের দ্বিত্ব
স্তনের অস্বাস্থ্যে শঙ্কিত

প্রায় সমধর্মী কবিতা হচ্ছে 'সেই লোকটি'। এটাও নাট্যরসাত্মক কবিতা। বক্তা এখানে একটি লোক, একজন স্বামী, নিজের উন্নতির জন্য যিনি স্ত্রীকে পর্যন্ত ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি —

কোনোদিন নিয়ে গেছে সাকুরা-চু-চিনে
কখনো সুযোগ বুঝে মনে হয় আরণ্য ভোজে
শ্রীপুরের বনে —।'

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা প্রশান্ত চিত্তে আর এখন তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না, অসম্ভব জ্বালা ধরছে সারা শরীরে, ক্ষোভ ক্রোধ-ঈর্ষা-বিদ্বেষ উপচে পড়ছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

তৎকালীন সময়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বৈষয়িক উন্নতির জন্যে এধরনের আচরণ ছিলো সমাজ-বাস্তবতারই একটি স্তর। এই চিত্রেরই অনবদ্য রূপকার আবদুল গনি হাজারী। অধিকাংশ কবিতায় হাজারী গদ্যকবিতার ধারাকে অনুসরণ করেছেন। সম্ভবত বিষয়বস্তুর কারণে, আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে, নাটকীয়তার দাবিতে তাঁর কবিতায় মুসলমান ঘরোয়া পরিবেশে ব্যবহৃত অনেক শব্দের সঙ্গে ইংরেজী শব্দ ও ব্যাকাংশও তিনি ঈর্ষণীয় সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন —

সুনামাজীর তৃপ্তির মত
আজানী কণ্ঠের প্রতিধ্বনির মত
মসজিদের কুণ্ঠিত ডালিম গাছের
আরক্ত লজ্জার মত
তোমার সুরের রোয়াকে আমি

Dhaka University Institutional Repository

ভীরু গোনাগার হয়ে
প্রতীক্ষা করি :
আমি তোমার বিশ্বাসের শরীর
অবিশ্বাসের সাহস
আমি তোমার সুন্দরের স্পর্ধা
(সঙ্গীতাকে – ৩)

প্রায়শ প্রশ্নের ভঙ্গিতে বিষয়বস্তু ও ভাবমন্ডলে তীক্ষ্ণতা এনেছেন। টাইপোগ্রাফিক্যাল বৈচিত্র্যের মাধ্যমেও তিনি কোথাও কোথাও তাঁর বক্তব্যকে তীব্রতর করেছেন। কোথাও খুব ছোট হরফ ব্যবহার করেছেন 'প্রত্যুষের অন্ধকারে দু'টি হাত' (পঞ্চম স্তবক), আবার কোথাও লাইনকে ভেঙ্গে-চুরে আঁকাবাঁকা করে সাজিয়েছেন (ফ্রাংকফূর্ট ১৯৬৮-২)।[১] কাব্য-ভাবনা সম্পর্কে তাঁর নিজের বিশ্লেষণ :

'আমি যে কবির কথা ভাবি সে হলো আধুনিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ — শিক্ষিত, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, ঐতিহ্য, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে অবহিত এবং তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল অথচ বিশ্লেষণী মনের মালিক। এই সব মিলিয়ে তার সমাজ-চৈতন্য রচিত, তার সামাজিক কর্তব্যবোধ বিবেক সংহত। এমন এক কবি যখন সৃষ্টিশীলতায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তার কবিতায় আমরা সমাজের হৃদপিন্ডের স্পন্দন শুনতে পাই।[২]

এই উক্তির মধ্যেই হাজারীর সমাজ-সচেতনতার ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

সমকালীন ঘটনাবলির অভিঘাতে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ ও শহীদ কাদরীর রূপান্তর নানা কারণেই স্মরণীয়। এঁরা তিনজনই পঞ্চাশের দশকে লিখতে শুরু করেছিলেন — যদিও এই দশকের শেষ দিকে কেবল শামসুর রহামানের একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু সেই কাব্যে শামসুর রাহমান যতোটুকু পরিশীলিত ততোটুকু স্বতন্ত্র নন। কবিতার ভাষা, ছন্দ, উপমা রচনায় যতো প্রযত্ন ও প্রসন্নতা, দ্যুতি তার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু পরবর্তী দশকেই তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের গড়ে ওঠার কাল। স্বদেশ সমাজ ও সময় শামসুর রাহমানের কবিতায় ক্রমশই নতুন উপাদান ও ভাষা যোগ করেছে। একই শহরের পটভূমিতে তিনটি আলাদা ভঙ্গিতে ফলে উঠেছে শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী ও আল মাহমুদের কবিতা।[৩]

আলোচ্য তিনজন কবিই নাগরিক। প্রথম দু'জনের বাচন-ভঙ্গির যে সপ্রতিভতা নগরজীবনের স্বপ্ন ও বাস্তবের ভেতর থেকে উচ্ছ্বসিত, আল মাহমুদে তার অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। আবার পুরোনো ঢাকার স্মৃতি, ছবি, কিংবদন্তী — শামসুর রাহমানের কবিতায় বিশ্ব-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সহযোগে যে পেশীশক্তির উদ্বোধক, শহীদ কাদরীর পঙক্তিমালায় তার উপস্থিতি নেই। ধাতব নগরের ধ্বনিকে তিনি ধরতে চেষ্টা করেন সুনির্বাচিত শব্দাবলিতে, কিন্তু এইসব শব্দ উঠে আসে অব্যবহিত সমাজ-পরিবেশ থেকেই। এবং প্রধানত গদ্যভঙ্গিতে ভারী তৎসম শব্দের পাশাপাশি

---

১. কবীর চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, শিল্পতরু, ঢাকা ১৯৯২, পৃ: ৮১
২. আ. শ. হা. বন্দী বিবেক, সমাজ ও কবিমানস, সমকাল, কবিতাসংখ্যা, ১৩৭১-৭২
৩. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কথা ও কবিতা, মু. ধা.১৯৮১, পৃ: ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

আটপৌরে কথ্য-বুলি আর নির্ভেজাল গাদ্যিক ইংরেজী শব্দের মিশেল দিয়ে শহীদ তৈরী করে নেন তাঁর কবিতার ভাষা। কিন্তু আল মাহমুদ মূলত সুরেলা স্নিগ্ধ। বাঙলাদেশের লোকজ জীবনের অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় বার বার ফিরে আসে শব্দে, উপমায়, প্রতীকে, চিত্রকল্পে।[১]

বাংলাদেশের কবিতাকে যাঁরা নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পঞ্চাশের কবিদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কোনো ধারাবাহিক কাব্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নয়, অনেকটা যেন সমসাময়িকতার আঘাত থেকে উৎপন্ন ব্যক্তির অহংবোধ ও অধিকার চেতনা কবিতাকে বিষয়বস্তু ও প্রকরণ, এই দুটি ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট করে তোলে। পরবর্তীকালে ষাট ও সত্তরের দশকে এই ধারারই বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় ব্যাপকভাবে। এই কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা কখনোই যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় ধারাকে অনুসরণ করেনি; নবোদ্ভূত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবনবোধ, যেমন জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এবং শ্রেণী বিকাশের প্রাথমিক আবেগকে ধারণ করেছিল। এই পর্যায়ে আঘাত করা শুরু হয়েছিল ইসলামী বা পাকিস্তানী মনোভঙ্গি অর্থাৎ একধর্ম, একজাতির অলীক ধারণাসূত্রটিকে।

ষাটের দশকে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বাঁক নিল ভিন্ন এক গতিপথে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই পর্বটিও বিভক্ত হয়ে পড়লো প্রগতিশীল চেতনার স্তরে। প্রথমার্ধে লক্ষ্য করা যায়, বন্দিত্ব, পরাজয়-চেতনা বা আত্মসংকটের শ্বাসরুদ্ধকর রূপ, আর দ্বিতীয়ার্ধে উজ্জীবনের, সংগ্রামী চেতনার অবিনাশী চেহারা। পঞ্চাশের দশকের যে সব কবি এই সময়ে কবিতা লিখছিলেন তাঁদের রচনাতেও লক্ষ্য করা যাবে এর প্রতিফলন। শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, একই কবির ভিন্ন ভিন্ন রচনায়ও মিশে আছে এই দ্বৈত বোধ। সমসাময়িক সংকটকে বর্জন করে বা একমাত্র আরাধ্য ভেবে নয়, সমকালীনতাকে অতিক্রম করবার দুর্বার চিত্তশক্তির মধ্যেও ধরা আছে তাঁদের কবিতার স্বরূপ, আধুনিকতার সাম্প্রতিক ধরন। শিল্প বা কাব্য অভিজ্ঞতাও বদলে দিচ্ছিল কবিদের ভাষাভঙ্গি এবং প্রকরণ-বিন্যাসের চারিত্র্য। সংকট ও চৈতন্যের অবদমন থেকে কবিতা কখনো কখনো যেমন হয়ে উঠেছিল ইঙ্গিতধর্মী, বিদ্রুপাত্মক, প্রতীক ও প্রতিমা-নির্ভর তেমনি উজ্জীবনের বোধও হয়েছে বিস্তারিত এবং উন্মুক্ত। এই ধরনের কবিতার সারৎসার হলো মানবিকতা বা অস্তিবোধ। শামসুর রাহমানের রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩) বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৬) নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮) নিজবাসভূমে (১৯৭০) ও বন্দীশিবির থেকে (১৯৭২); হাসান হাফিজুর রহমানের অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮) ও যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২); আবদুল গনি হাজারীর সূর্যের সিঁড়ি (১৯৬৫); মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের শঙ্কিত আলোকে (১৯৬৮) বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮) ও প্রতনু প্রত্যাশার (১৯৭৩) একাংশ; সৈয়দ শামসুল হকের বিরতিহীন উৎসব (১৯৬৯) বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৬৯); ফজল শাহাবুদ্দীনের আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর (১৯৬৯) এবং আল মাহমুদের লোক লোকান্তর (১৯৬৩) কালের কলস (১৯৬৬) সোনালি কাবিন (১৯৭৩) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এই দ্বিমুখী চৈতন্যের দ্বন্দ্ব ও সমীকরণ লক্ষ্য করা যাবে বিশেষভাবে।

শামসুর রাহমান আলোচ্য সময়ের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবি যিনি উল্লেখিত কাব্য-বৈশিষ্ট্যের গুণে অর্জন করেছিলেন সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা। ইতোপূর্বে তাঁর কবিতায় তিরিশের কবিদের যে প্রভাব এবং রোমান্টিক চেতনা লক্ষ্য করা গেছে ষাটের দশকে এসে একদিকে যেমন তিনি তিরিশের

---

১. পূর্বোক্ত, কথা ও কবিতা, পৃ: ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবমুক্ত হয়েছেন তেমনি রোমান্টিকতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিপার্শ্বের সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর প্রথম দু'টি কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে' এবং 'বিধ্বস্ত নীলিমা' আত্মগত কথনে ভারাক্রান্ত হলেও পরবর্তী গ্রন্থ 'নিরালোকে দিব্যরথ' থেকে প্রথমত, কিছুটা ব্যাপকভাবে সদর্থক জীবনবোধের উল্লেখ দেখা গেল; দ্বিতীয়ত, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আগের তুলনায় অনেক বেশি জড়িয়ে গেলেন তিনি। একথা বলা যায়, 'নিরালোকে দিব্যরথ'ই হচ্ছে শামসুর রাহমানের কবিচৈতন্যের ক্রান্তিকালীন রচনায় ভরপুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। এই সংকলন পর্যন্ত তাঁর কবিতা ছিল প্রধানত অন্তর্লীনতার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল — প্রতীকে, প্রতিমায়, ইঙ্গিতে, আত্মসম্বোধনে অন্তর্মুখী। কিন্তু আবার এই গ্রন্থ থেকেই তিনি সম্পৃক্ত হলেন বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে, বস্তু-পরিবেশের সঙ্গে বিজড়িত হতে থাকলেন ক্রমশই। আত্মকথনের বদলে প্রধান হয়ে উঠলো সমষ্টির ভাবনা; প্রতীক, প্রতিমা, ইঙ্গিতের স্থলে বাগবাহুল্য, বিবরণ ও বিস্তার।

স্বদেশচেতনা, মধ্যবিত্তের পরাজয়, সমষ্টির সংকট, গণ-আন্দোলন, অভ্যুত্থান, স্বাধীনতার তীব্র জটিল সংগ্রামে ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়ে উঠলো শামসুর রাহমানের কাব্যজগৎ। বিশুদ্ধ রোমান্টিক বোধ থেকে বিমুক্ত হয়ে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করেন বাস্তবতার রূঢ় পটভূমিতে। প্রকৃতি, প্রেম, দৈনন্দিনতা এমনকি ঈশ্বর-ভাবনাতেও সমকালীন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের দংশন লক্ষ্য করা যায় তাঁর এই সময়ের কবিতায় —

যখন তোমার সঙ্গে আমার হলো দেখা
লেকের ধারে সংগোপনে,
বিশ্বে তখন মন্দা ভীষণ, রাজায় রাজায়
চলছে লড়াই উলুর বনে।
(প্রেমের কবিতা, নিরালোকে দিব্যরথ)

আত্মসংকটের গহীন গহ্বর থেকে তিনি উচ্চারণ করেন —

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশ শো বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষ মাস।
তোমার মুখের দিকে এখন আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা আমার, দুঃখিনী বর্ণমালা।
(বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা , নি. বা.ভূ)

পিতৃপুরুষের সনাতন বিশ্বাসে আস্থা নেই, দেশকে ভালোবাসেন, ভালোবাসেন দুঃখিনী বর্ণমালাকে, কিন্তু ভালোবাসার ব্যবসায়ীদের প্রতি দুর্মর সন্দেহ, সভ্যতার বিপর্যয়ে শঙ্কিত চতুষ্পার্শে দেখছেন শত্রুর

Dhaka University Institutional Repository

ছায়া, গভারের যাতায়াত — এই হচ্ছে শামসুর রাহমানের মানসিক পরিমন্ডল। মুখে শুধু বংশের বিষাদ বয়ে বেড়াচ্ছেন না, যুগের উদ্বেগ ধারণ করেছেন।[১]

বর্তমানে আমি ফাটল-ধরা এক দেয়াল যেন একা দাঁড়িয়ে আছি —
আমাকে ঘিরে বয় ঝড়ের মাতলামি এবং অভাবিত ভূকম্পন।
কখন ঢলে পড়ি, এই তো ভয় শুধু, কালের চত্বরে হাত-পা ছুঁড়ি,
বিপুল সমারোহ জরিপ করে দেখি বিশ্বে চার ভাগই শূন্য।

(দু' এক দশকের, নিরালোকে দিব্যরথ)

এ যেন শুধু আত্মসংকট নয়, সমষ্টির মধ্যেও তিনি দেখতে পাননি জীবনাসক্তির আকাঙ্ক্ষা। ফলে যারা 'ক্ষত' দেখে, বিনা প্রতিবাদে শবানুগমনে যায়, সম্মিলিত হওয়ার পরিবর্তে দলছুট হয়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য থেকে সরিয়ে নেয় দৃষ্টি, নখ দিয়ে মাটি খুবলে তোলে তারার কবর। দেখতে চায় না 'চাঁদ ভেসে যাক অবারিত নীলে'। এ ধরনের কাবিতা যখন লেখা হচ্ছিল তখন আইয়ুবী কালো দশক ছিল তার দুঃশাসন ও প্রতিপত্তির মধ্যগগনে। বিরোধী রাজনীতিবিদরা অনৈক্যের কারণে সংগঠিত হতে পারছিলেন না কিছুতেই। ইসলামী মূল্যবোধ ও সামন্তচেতনাও জেগে উঠছিল নতুন করে। কবি সেই পরিবেশকেই এখানে গেঁথে তুললেন কবর, চাঁদ প্রভৃতি প্রতীক- প্রতিমার আদলে।

বিভাগোত্তর সময় থেকে এ পর্যন্ত দেশের এমন কোনো ঘটনা নেই যার দ্বারা প্রভাবিত হননি এই কবি। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিটি আন্দোলনই আলোড়িত করেছে তাঁকে। বিশেষত 'নিরালোকে দিব্যরথ' কাব্যপর্যায় থেকেই এর সূত্রপাত। জাতীয় জীবনও এই সময় থেকে নানা ঘটনায় হয়ে উঠেছিল উন্মুখর। হরতাল, বিক্ষোভ, রবীন্দ্র-বিতর্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। শামসুর রাহমানের বিশেষত্ব হচ্ছে এইসব ঘটনাকে কবিতা করে তুলতে পেরেছিলেন। বলা যায়, তাঁর কবিতা সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার দলিল। সংবেদনশীল কবিসত্তা, জীবনাসক্তি এবং আধুনিক কবিতার নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে সচেতন থাকবার কারণেই তিনি অর্জন করে নিচ্ছিলেন বিশেষ ভাষাভঙ্গি। "সামগ্রিকভাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভাষার অঙ্গ থেকে ভদ্র পোষাক খুলে ফেলে তাকে আটপৌরে পোষাকে দেশ-বিদেশ ঘুরিয়ে আনার সাহস এই প্রথম দেখা গেল শামসুর রাহমানের কবিতায়। শুধু মাত্র 'প্রথম গানেই' তিনি রক্ষা করেছিলেন ভাষার নিরঙ্কুশ আভিজাত্য। সেই বনেদিয়ানা সর্বত্র সমান সার্থক ছিল না, কিন্তু যেখানে সার্থক সেখানে এক নিবিড় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। 'রৌদ্র করোটি'র সময় থেকেই তিনি ভাষার পোষাকিপনা আস্তে আস্তে ছেড়েছেন, ঠিক যেমন আস্তে আস্তে তিনি বদলে নিয়েছেন তাঁর নিজের মুখের আদল। 'নিরালোকে দিব্যরথ'-এর পর্যায়ে কিছু শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন, অনেকটা যেন পূর্বপুরুষের তোরঙ্গ থেকে বের করে আনা সাজ-পোষাকের মতো। অনেকটা কৌতুহলের খেলা, কিন্তু খেলাটা জমেনি :

১. মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুরিয়ে নিই আপিলা-চাপিলা শৈশবের প্রচন্ড আহ্বানে

২. কিন্তু কি জানেন, অদৃষ্টের ফেরে নই অনখোলা তাই বেলা অবেলায় আতকা মুখ থেকে ফেটে পড়ে/কথা।

৩. আজাড়া কথায় কাজ কি তোমার।[২]

---

১. জি. র. সি., শব্দের সীমানা, মুক্তধারা, ১৯৭৬, পৃ: ৯১
২ পূর্বোক্ত, শব্দের সীমানা, পৃ: ৮৫-৮

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া একধরনের প্রাকৃত ভঙ্গির দিকে ঝুঁকেছিলেন তিনি। এই প্রাকৃত ভঙ্গি কোনো বিশেষ অঞ্চলের বা মহানগরের বা শ্রেণীর কথ্য ভাষার উপর গড়ে ওঠেনি। শব্দের নির্বাচনে এই ভঙ্গির কোনো সংস্কার নেই, সাধু, সংস্কৃত, কথ্য, খেউড় স্বচ্ছন্দে একসঙ্গে চলে। এ এক অপূর্ব এবং নিজস্ব গুরুচন্ডালী — তরল পরিবর্তনশীল, স্থিতিস্থাপক। কখনো বনেদী কখনো মিশ্র। শব্দের এই মিশ্র রীতির মধ্যেই একটা পরিষ্কার কথ্য সুর সঞ্চারিত হয়ে যায় কখনো কখনো :

আমি ত পুলিশ নই নাগরিক দ্বীপে,
তবু সে শব্দের পিছু পিছু
ছুটে যাই, দিগ্বিদিক ঘুরে কিছুক্ষণ ফিরে আসি ক্লান্ত, ব্যর্থ।
আমার ত খুব বেশি দেরী করা চলবে না। অথচ অমন
আচমকা বিপন্নতা কিছু
কখনো না কখনো আড়ালে
আমাদের প্রত্যেকের জন্য জমা থাকে

[একধরনের অহংকার / ৩৬]

"এই প্রাকৃত ভঙ্গি তাঁর এক ধরনের এবং বিশিষ্ট প্রকাশ। এই রীতি শেষপর্যন্ত গুটিকয় দেশজ-আঞ্চলিক শব্দের দিকে না তাকিয়ে সাধু-প্রাকৃত-মৌখিকের সমন্বয়ে এক নিজস্ব বাগধারা সৃষ্টি করে নিল। এর খানিকটা শব্দচয়নের ব্যাপার খানিকটা ছন্দ-শাসনের ব্যাপার। এবং সবটাই কবিতাকে জৈব নিয়মে তৈরি করার ব্যাপার। যখন থেকে এ ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে এল, তখন তার আলাদাভাবে কোনো পংক্তির বা স্তবকের প্রাধান্য গৌণ হয়ে গেল তাঁর জন্য ।[১]

এই প্রাকৃত ভঙ্গিকে আয়ত্ত করে ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শাসনে বেঁধে যখন তিনি স্বাধীনতার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন তখন সেই আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি সঞ্চারিত হয়ে যায় জনমানুষের চেতনাস্তরে :

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান,
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।

(স্বাধীনতা তুমি, বন্দী শিবির থেকে)

---

১. জি র সি, শব্দের সীমানা, পৃষ্ঠা: ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তিনি রচনা করেন 'হরতাল'-এর মতো কবিতা। যা একই সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতাকে যেমন ধারা করে আছে তেমনি সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহারও লক্ষণীয় —

রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা সঙিন হয়ে বুকে
গেঁথে যায়; একটি কি দু'টি
লোক ইতস্তত
প্রফুল্ল বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।
(হরতাল, নিজবাসভূমে)

উপমা :

ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ
ঝুলে আছে আকাশের বিশাল কপাটে; আমি একা
খড়ের গাদায় শুয়ে ভাবি
মুমূর্ষু পিতার কথা ....

অনুপ্রাস :

১. কাটাই প্রহর একা ঘরে আর তুমি দেশান্তরে
২. মাথার ভেতর ঝড়ো মেঘ ওড়ে—

সমকালীনতার প্রয়োজনে, বিশশতকী বিরূপ ও জটিলতর জীবনের রূপায়ণে তাঁর কবিতার আঙ্গিকেও এসেছে নানা বৈচিত্র্য। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ছাড়াও পয়ারে, ভাঙা পয়ারে এমনকি গদ্যছন্দে রচিত অনেক কবিতা স্পর্শ করেছে উপজীব্য সামাজিক সচেতনতা। ব্যক্তি-সামাজিকের দ্বন্দ্ব, আত্মক্ষরণ এবং সামাজিক সমস্যার উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে কবি আজীজুল হকের কবিতায়। ঘটনার প্রত্যক্ষ রূপায়ণে নয়, মানবিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল আজীজুল হক একজন অত্যন্ত সংবেদনশীল কবি। সমসাময়িক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাহ্যিকভাবে এই কবি আলোড়িত না হলেও এই সব অনুষঙ্গকে আত্মস্থ করে নিজের ভেতর তৈরি করে নেন এক আত্মজৈবনিক দৃষ্টিকোণ। আর এক্ষেত্রে সমাজ, জীবন, প্রকৃতি, মানুষ এমনকি মহাকালও উঠে আসে এক ভিন্ন মাত্রায়। গভীরতর ব্যঞ্জনায় পারিপার্শ্বিক সমস্যাকে ছুঁয়ে দেন এই কবি —

সুপক্ব রক্তিম ফল ঠোঁটে বিঁধে হেঁটে গেলে,
যেন এক রূপসীকে ছিঁড়ে খায় অতিশয় কদর্য শুয়োর
শৃগালেরা উঁড়ে যায় হামাগুড়ি গাছ তার
পাতার আড়ালে,
সাদা খুলি শকুনের ডিম, আর নখ দিয়ে
সময়কে রেখে দেয় কুন্ডলিত লেজের ভিতর
কুকুর লুকিয়ে।
(শবাধারে রাত)

Dhaka University Institutional Repository

এই চিত্রকল্পে পাওয়া যায় এক ভয়াবহ সময়ের উল্লেখ। কাক, শৃগাল, শকুন, কুকুর, রূপসীর হত্যা সময় ও সমাজের সংকটকেই প্রতীকায়িত করে পরোক্ষে। প্রত্যক্ষ সামাজিক সংকটের ছবি যেন হঠাৎ-হঠাৎই উঠে আসে তাঁর কবিতায় —

একটি মৃত্যু পাঁচটি লাশ অসংখ্য কবর
পাঁটটি কবর অসংখ্য মৃত্যু একটি লাশ
অসংখ্য লাশ একটি কবর পাঁচটি মৃত্যু
মৃত্যু
লাশ
কবর
মানুষ — খাদ্য ও খবর।

(নামতা)

প্রতীক, প্রতিমা, ইঙ্গিতের বিস্ফুরণের সাহায্যে কবিতায় আজীজুল হক ব্যক্তিক ও পারিপার্শ্বিক সংকটকে এমনভাবে মূর্ত করে তোলেন, যা তাঁকে পঞ্চাশের অন্যান্য কবির থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। যেহেতু প্রতীক-প্রতিমার সাহায্যে কবিতায় তিনি সংকটকে গেঁথে তোলেন, ফলে তাঁর কবিতা সমকালকে অতিক্রম করে প্রসারিত হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আজীজুল হকের প্রায় অধিকাংশ কবিতা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উনসত্তরের সময়-পর্বের উত্তাপ, বিক্ষোভ, ঘৃণা ও উজ্জীবন। কিন্তু যেহেতু ঘটনার বিবরণে তা সীমাবদ্ধ নয়, ফলে এখনো কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনায় শিহরিত হয়ে ওঠে পাঠকের মন। বলা যায়, কবিতাকে স্মরণযোগ্য করে তুলবার জন্য কবিতা-নির্মাণের আঙ্গিকগত পদ্ধতিগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। প্রতীক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পরাবাস্তব ভাষা-সৃষ্টিতেও বিস্ময়কর কল্পনা-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। আর এই কল্পনাতেও ছিল বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বোত্তরণের সূক্ষ্ম-ভাবনা, যার সূত্রে তিনি পৌঁছে যান আধুনিকতাবাদ থেকে আধুনিকোত্তর বোধে —

ঘড়ির ডায়ালে দুই কাঁটা
ক্রমান্বয়ে দীর্ঘতর স্থূলতর হয়ে
ঘড়ি থেকে বেরিয়েই বসলে টেবিলে
এক বিরাট শকুন
তারপর উড়ে গেল কোথায় ওদিকে।

এই কাব্যাংশটুকু পরাবাস্তব হলেও অর্থের দীপ্তিতে সমান উজ্জ্বল। ঘড়ির শকুনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে যেমন ধরা আছে সমকালীন সংকটের চেহারা, তেমনি এর উড়ে যাওয়ার মধ্যে আভাসিত হয়ে আছে সংকট-মুক্তির ইঙ্গিত।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুর রাহমানের মতোই দেশ-চেতনা এবং ব্যক্তিক-প্রসঙ্গের সংমিশ্রণে মানবিক আত্মজৈবনিক ধারাকে ষাটের সময়পর্বে অন্য যে কবি সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিলেন তিনি হাসান হাফিজুর রহামান। পঞ্চাশের দশকে তিনিই ছিলেন দায়বদ্ধ মানবিক কাব্যধারার প্রধান কবিপুরুষ। সমাজ, মানুষ ও শিল্পকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একসূত্রে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু এই পর্বে ভাষা-আন্দোলন ও কালো দশকের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর কবিতাবলিতে যুগপৎ ফুটে উঠল জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, ভাষা সংরক্ষণের বোধ, রাজনৈতিক ঐক্যহীনতা, স্বপ্ন-ঘৃণা-পরাজয়, আত্মসংকট, স্থবিরতায় — তীব্র সংগ্রামময় ছবি। কালো দশকের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার সূত্রে ষাটের প্রথমার্ধে তাঁর কবিতা যেমন নিমজ্জিত হয়েছিল তীব্র নেতিবোধে। তেমনি দ্বিতীয়ার্ধে সংহত, ঋজু, অস্তিবোধে উদ্ভাসিত হয় তাঁর কবিতাবলি। হাসান হাফিজুর রহমানের কবি-চৈতন্যের দুই প্রান্তে স্থাপিত হতে পারে 'অন্তিম শরের মতো' এবং 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' নামক এই পর্বে রচিত দু'টি কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম স্তরে জাতীয়তাবাদের পরাজয়, পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির স্ফীতি এবং কালো দশকের সর্বগ্রাসী বিস্তার কবির মনে জন্ম দিয়েছে আত্মসংকটের। তাঁর মনে হয়েছে 'নষ্ট এক সময়ের জালে' বন্দী তিনি, সমকালীন সময়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মানবতা যেন —

আমি ব্যথিত পূর্ব বাঙলার ঈপ্সিত আলেখ্যের
চৌচির প্রতিলিপি; মুখ থুবড়ে থাকা মানবতা
উদ্বাস্তু প্রগতির ধৃতরাষ্ট্র রাহু বেষ্টনে।
(জীবনের ঘন্টারোল, অ.শ.ম)

আত্ম-সংকটের যে পরিচয় এখানে বিধৃত আছে তার সঙ্গে প্রবল ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে স্বদেশের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের বহুধা বিক্ষোভ।

বলা যায়, তাঁর ব্যক্তিক জীবনবোধ ও সমাজমনস্কতা হাসান হাফিজুর রহমানকে স্বকাল ও সমাজ-ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে অনন্যতা দান করেছে। তাঁর কবিতায় জীবন এক কেন্দ্রীয় প্রতিভাস। বস্তুত তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, হতাশা এবং ক্রোধ, উত্তেজনা এবং ক্লান্তি সমাজ ও স্বদেশ — ব্যক্তিকতা থেকে উৎসারিত। "দেশজ বোধ ও সময়-বোধে তিনি উন্মথিত; অস্থির; সেজন্যেই অবক্ষয়ের করুণ আর্তির বদলে মানবিক কিংবা বস্তুগত সম্পর্কের যন্ত্রণা তাঁর কবিতার পরতে পরতে লুকানো — দেশ তাঁর রক্তে গান করে, সময় তাঁকে ভাবতে শেখায়, সেজন্যে তাঁর স্বপ্ন কিংবা জীবনতৃষ্ণা প্রগতি বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে, তাই তিনি বক্তব্য ছেঁকে তোলেন লৌকিক জীবনযাত্রা থেকে। জীবনের বাস্তবে তাঁর কবি-মানসের শেকড়, সেজন্যে বিষয় নির্বাচনের নৈর্ব্যক্তিক বিস্তার তাঁর অন্যতম স্বাদ। জীবন এবং জীবনের চাপ তাঁর কবিতার রূপ গড়ে তোলে। কবিতাকে তিনি এভাবে ব্যবহার করে বক্তব্যনিষ্ঠ করে তোলেন, তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা-বেদনা-সংহতি নয়, সামাজিক সার্থকতা, নৈর্ব্যক্তিকতা বিশাল সততার মধ্যে তিনি বিষয় ও বিষয়রূপকে গ্রথিত করে অগ্রসর হন, তাই আবেগ তাঁর কাছে ভাবের উন্মাদনা নয়, কবিতার বিষয়ধৃত বাস্তব, প্রাত্যহিক জীবনের প্রচন্ড অভিঘাত।[১]

---

১. বো. খা. জা., হাসান হাফিজুর রহমান, পৃ: ২০

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী গ্রন্থ 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' ভরে আছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মৌল অনুভবে। কিন্তু প্রথমদিকে কবির মনে হয় নাগরিক জীবনে অর্থাৎ 'শহুরে পাটাতনে রুটিনের অমোঘ ছকে' বাঁধা পড়বার ফলে স্বদেশকে চিনতে পারেননি তিনি। শুরু হয় আত্মবিশ্লেষণ ও শিকড়ের সন্ধান এবং এর পরেই অস্তিত্ববোধে উত্তরণ ঘটে তাঁর কবিচৈতন্যের। শামসুর রাহমানের মতোই মাতৃভাষা, স্বদেশানুরাগ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের তীব্র জটিল রক্তক্ষত-চিহ্নিত পথ বেয়ে সার্বিক মুক্তি ঘটে তাঁর।

আশ্চর্য সুগন্ধ মুক্তি আসে ভেসে হাওয়ার আভাসে,
নবান্নের মদির ঘ্রাণের চেয়েও প্রাণজয়ী মনোহর।
যেন বা রূপকথার অভিশপ্ত রাজপুত্র আমরা সবাই
একে একে আবিল খোলস খুলে
অজগর শরীর থেকে দিব্য দেহে ফিরে যাই।

(অবশেষে এল কি সময়)

যখন স্বাধীনতা অর্জিত হলো তখনি কবির কণ্ঠে বেজে উঠেছিল এই প্রগাঢ় উক্তি। বস্তুত তাঁর কবিতার স্বধর্ম বা চারিত্র্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর কবিতার বিকাশ ধারা। ভাষার যে দ্যুতি ছড়ানো ছিলো পঞ্চাশের দশকে রচিত তাঁর কবিতাবলিতে — এই পর্বে সেই ধারাবাহিকতা সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। প্রতীক, প্রতিমা, ইঙ্গিতময়তার পরিবর্তে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে কবিতার প্রধান অংশ জুড়ে থেকেছে মসৃণ বিবরণধর্মী পঙক্তিমালা। ভাষাশৈলীর দিক থেকে বলা যায়, পঞ্চাশের দশকের তুলনায় কোনো উত্তরণ ঘটেনি। এই পর্বে তিনি গদ্য ছন্দে অধিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে অলংকার প্রয়োগে শিল্পচাতুর্য প্রণিধানযোগ্য —

উপমা :

১. কিশোর চোখে রঙিন বেলুনের মতো
কতিপয় সন্ধ্যার আকাশ চরম লোভনীয় হয়ে উঠেছিলো।

২. যদ্দুর দেখা যায়
ডালির ঘড়ির মতো
বিগলিত ধ্বংস অচল স্থির হয়ে আছে।

বাকপ্রতিমা :

পৃথিবীতে এত পাতা ঝরে, এত স্রোত নদী ও নালাতে
তবু শব্দ কই শব্দ কই বলে শয্যা ছেড়ে ছটফট
উঠি মধ্যরাতে কখনো বা আকুল দু'হাতে
দেয়াল হাতড়ে বলি পথ দাও, পথ দাও, পথ দাও, যাবো
নরম জ্যোছনার ঘরে, যাবো দারুণ রৌদ্রের কলস্বরে,
যতদূর ইচ্ছা হয় যাবো দূরে দূরান্তরে।

(আমার ভেতরের বাঘ/আ.ভে.বা.)

Dhaka University Institutional Repository

সমকালে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতার স্রোত এক মোহনীয় মোহানায় উপনীত। তাঁর কাব্য- কুশলতা ও আঙ্গিক নির্মাণের উপর্যুপরি সচেতনতা যেমন কবিতাকে নবমূল্যায়নে সহায়তা করেছে তেমনি সমাজ-সংলগ্ন উচ্চারণ ও প্রকল্পনা তাঁকে ক্রমাগত কাব্যপ্রেমীদের আত্মার আত্মীয়ে পরিণত করেছে।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কাব্য-বিশ্বাসে যেমন সমাজ-সংলগ্ন তেমনি কবিতার মেজাজ ও আয়োজনে, প্রতিন্যাস ও প্রতিতুলনায় চিত্রকল্প ও শব্দবিন্যাসে আতীব্র রোমান্টিকতার অভিসারী। বাস্তবতার অনুরাগ ও সৌন্দর্যলিপ্সার সম-আকাঙক্ষা থেকেই তিনি কবিতা নির্মাণে এ দুইয়ের প্রতি যত্নশীল; অর্থাৎ আধার ও আধেয়কে তিনি সমান গুরুত্বপূর্ণ মানেন। বস্তুত হৃদয়বাদী কাব্যধারার তীর্থযাত্রী হিসেবেই তিনি সবিশেষ গৌরবদীপ্ত; ফলে লৌকিক আচার ও লক্ষণে এবং লিরিক-প্রিয় প্রবণতায় তাঁর কবিতা ক্রম-উদ্দীপিত, উত্তরণধর্মী ও ক্রম-প্রসারমাণ। বলা যায়, তিনি যে মানুষ ও মানব-আর্তিকে কবিতায় প্রার্থনা করেছেন, যে শৈল্পিক চাতুর্যে নির্ণয় করেছেন যাদের অস্তিত্ব — তারা দেশ, সময় ও প্রতিবেশেই সম্পৃক্ত; আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পীড়নে বিপর্যস্ত, বিদ্রোহে অক্লান্ত মানুষ। ফলে রাজনীতি ও সমাজ-সজাগতার চিত্র প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে তার কবিতায় —

আমি যখন নগরীতে এলাম
তখন সময় খুব বিশৃঙ্খল, চতুর্দিকে ক্ষুধা।
আমি যখন মানুষের কাছে গেলাম
তখন বিদ্রোহের কাল, তারা, আমি
সকলেই বিদ্রোহী।
পৃথিবীতে আমার দিন এবং রাতগুলি
এভাবেই কেটে গেল।

(আমার উত্তরপুরুষকে, স.প্র)

একুশের ভাষা-আন্দোলন আমাদের জাতীয় সত্তা ও চেতনার সংবেদনশীল প্রতিফলন উদ্ধারের একটি অনন্য উৎসার নিঃসন্দেহে। সেই একুশের বিত্ত ও ঐশ্বর্য আমাদের সাহিত্যের অন্তঃস্রোতধারা উজ্জীবন ও তীক্ষ্ণ মেধা-বিজড়িত অপরিমেয় শক্তি সঞ্চার করেছিলো। বস্তুত সেই শক্তির ধারাবাহিকতায় লিপ্ত থেকেই আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কাব্য-জগতের নির্মাণ। তাঁর মানসভূমিতে যে সামাজিক ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রবহমান তিনি তাকে ঐতিহ্যমনস্ক বিভায় ও লৌকিক আধারে পর্যবসিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর একমাত্র চিন্তার সারৎসার দেশ ও মানুষ। '৫২-এর ভাষা-আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে তাঁর উচ্চারণ লক্ষণীয় —

কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,
আর আমি
ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।
খোকা, তুই কবে আসবি?
কবে ছুটি?
চিঠিটা তার পকেটে ছিল
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

(মাগো ওরা বলে, কমলের চোখ)

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ ও প্রকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তাঁর উদ্দীপনা ব্যতিক্রমী। লৌকিক ছড়ার ছন্দকে তিনি ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত করেন পাঠকের সামনে। প্রতীকের আয়োজনেও তিনি অতি চেনা জগৎ থেকে তুলে আনেন তাঁর শব্দ এবং তার প্রতিবেশ—

১. মা কি শালিক পাখি?
খয়েরি শাড়িতে তাঁর
হলুদের ছোপ
তারপর একদিন তিনি
শেফালির ফুল
(মা তুমি/২, কমলের চোখ)

২. ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে, ভালোবেসে
মায়ের ছেলেরা চলে যায়।
(মা তুমি/৩, কমলের চোখ)

কবিতায় প্রতিমা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, তুলনা-প্রতিতুলনা নির্মাণেও তিনি সিদ্ধহস্ত :

১. তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিলো।
২. উৎক্ষিপ্ত নক্ষত্রের মতো
কমলের চোখের কথা বলছি।

মালোপমার ব্যবহার,

পিতামহের স্রোতের মতো
আলোকিত বজ্রের মতো
আন্দোলিত বৃক্ষের মতো
মন্দ্রিত প্লাবনের মতো
সহিষ্ণু ধরিত্রীর মতো
পবিত্র কবিতার মতো
আমরা প্রার্থনা করছি
আমরা দিন এবং রাত প্রার্থনা করছি।
(বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা, স. প্র.)

ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনা, সময়ের বৈরী স্বভাব, জীবন ও সমাজমগ্নতা ও আধুনিক শিল্পধ্যান একদিকে যেমন তাঁর কবিতার ভূমিকে ঋদ্ধ করেছে তেমনি স্বরবৃত্ত ছন্দের মুক্ত উচ্চারণে আমাদের কবিতার একটি বিরল ও ওজস্বীধারার গতিকে অধিক তীক্ষ্ণ শব্দবাণে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ বেগবান করে তুলেছেন। বস্তুত পঞ্চাশের পুরো কাব্যধারায় সহজ স্ফূর্ত মসৃণ অজটিল কলাকুশলতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি প্রবল প্রতাপে।

পঞ্চাশের দশকের আরেকজন কবি সৈয়দ শামসুল হক ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে আমাদের অভিনিবেশ দাবি করেন। মনে হয় কবিতার আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষার কাজ তিনিই সবার চেয়ে বেশি

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। চৌদ্দ মাত্রার পয়ারে লেখা দীর্ঘ কবিতা 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' কিংবা কাব্য-নাটক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়" তারই প্রমাণ। এই দুটি কাব্য নব্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক সত্তার ক্রম-উদ্বোধনের ভাষ্য। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক বিষয় থেকে শিল্পের নির্যাস এমন কুশলী হাতে নিঙড়ে নেন যে তাঁর কবিতায় বিষয়োত্তর মহিমার স্বাদ জড়িয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত।[১]

আত্মগত প্রসঙ্গ, আত্মজৈবনিকতার সূত্রে সমকালীন সময় এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন বাঙলাদেশ যথাক্রমে উপজীব্য হয়ে উঠেছে — 'বিরতিহীন উৎসব', 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা', এবং 'প্রতিধ্বনিগণ' নামক তিনটি কাব্য সংকলনে। আত্মগত বিষয় কবিতার প্রসঙ্গ হয়ে ওঠায় বিরতিহীন উৎসব এবং পঞ্চাশের দশকে রচিত 'একদা এক রাজ্যে' কবিতাগুলির মধ্যে বহিরাবরণে কোনো উত্তরণ লক্ষ্য করা যায় না। তবে 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' বিষয়-বৈচিত্র্যে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আত্মজৈবনিক স্মৃতিচারণমূলক ভঙ্গিতে রচিত একটিমাত্র দীর্ঘ কবিতা সংবলিত এই রচনাটির পরতে পরতে মিশে আছে পাকিস্তান-উত্তর পূর্ববাঙলা, বিশেষ করে ষাটের দশকের বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, স্ফীতকায় মধ্যবিত্তের নতুন সৃষ্ট ঢাকা শহর, নিজের সৃষ্টিশীল জীবন প্রভৃতি অনুষঙ্গ। গ্রন্থটির শুরু শৈশবের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে উঠে আসে যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষা —

> ইস্টিশানে আমি একা দাঁড়িয়েছিলাম
> চলে গেছে বেলা তিনটার গাড়ি
> দূরে রঙিন রুমাল লাল শিমুলের গাছে।

কিন্তু পিতার মৃত্যুতে জীবনে কখন যেন ঘনিয়ে ওঠে সংকট : 'পিতাকে যখন দেখি নত সেজদায়, কাফনের ঘ্রাণ পাই'। অথচ এই পিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির —

> অনুপম শান্তি সমর্পণে বলতেন পিতা
> একসাথে থাকিস বাছারা।

কিন্তু আজ ঔপনিবেশিক শাসনের কূটচালে অথবা পাকিস্তানী রাষ্ট্রের নামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন, ধ্বস্ত মানুষের মন। সামাজিক, রাজনৈতিক বিকাশও অসংগতিপূর্ণ, কালো দশকের আবির্ভাবে 'অক্টোবরে কাঁদে দেশ'। ভদ্রাসন বিক্রি করে ভাই। মন্ত্রীরা শপথ নেয় গাঢ়স্বরে দরবার ঘরে — 'আমার সন্তান যেন বাঙলার শ্মশানে থাকে দুধে ভাতে'। বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীও অসঙ্গতিতে আক্রান্ত, কারো কারো বাড়ি গাড়ি হয়। আমেরিকা ইউরোপ ছোটে ছাত্র, অধ্যাপক, ছাপা হয় ছবি; ইলিশের গন্ধে আজো ডুবে যায় কত ঝাঁঝালো বিক্ষোভ, অশ্রু, দুঃখ, পরাজয়। আর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রতি দিন পাজামার ছাঁট বদলায়, উদযাপিত হয় জন্ম রবীন্দ্রনাথের, পৈতৃক তন্দুরে সেঁকে আব্দুল্লাহ রুটি'। ঢাকা শহর বেড়ে উঠছে দ্রুতগতিতে। গ্রামজীবনের সঙ্গে নাগরিক জীবনের যেন তৈরি হতে চলেছে এক ধরনের সংঘাত। কিন্তু কিছুদিন আগেও এমন ছিলো না। কবি তাঁর 'নীল সুটকেসে' বহন করে এনেছিলেন 'কুড়িগ্রাম' থেকে তার ক্রুদ্ধ ধরলার একটি কল্লোল, আর আকন্দের পাতা আর শ্যামলের ছবি'। কিন্তু এখন নাগরিকতার চাপে সরে যাচ্ছে সেই অনুভব, জেগে উঠছে বিষাদ। কেননা "পংক্তিমালার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সেই বাংলাদেশ — যা একদিকে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা আর স্বাধীনতার স্মৃতি ভারাক্রান্ত, অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও ঔপনিবেশিক

---

১ . আ. হে.মো.কা., কথা ও কবিতা, পৃ: ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

নিপীড়নের টানাপোড়েনে রুদ্ধশ্বাস। চলচ্চিত্রের মতো ছবির পর ছবি সাজিয়ে কবি তাকে ধরে রেখেছেন চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ পয়ারে। মধ্যবিত্ত মানুষ, উদ্বাস্তু মানুষ, বিভ্রান্ত মানুষের ছবি 'পংক্তিমালা'। এসবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণার গরলে নীলকণ্ঠ কবি দেখেছেন পুরোনো মূল্যবোধের বিনষ্টি, নতুন মধ্যবিত্তের উচ্চাশা — কলাকৈবল্যবাদের পতন। কাব্যের প্রথমে প্রায় আদিকবির মতোই সৈয়দ হকের জিজ্ঞাসা : তাহলে একে কি বলি? এই যা লিখেছি। শোকগ্রস্ত জননীর মতো? এবং এই প্রশ্নের পৌনঃপুনিক অভিঘাতে পংক্তিমালার মর্মমূল উচ্চকিত। কবিতা কি আপনভাষণ নাকি বিবেকের কণ্ঠ, অবিনাশী সখা? এই জিজ্ঞাসার পটভূমিতেই ক্রমশ তিনি বুনে তুলেছেন তাঁর স্মৃতি-স্বপ্ন-প্রত্যাশামদির বাঙলাদেশের চিত্রনাট্য।[১] কাব্যের অন্তিম স্তবকে সৈয়দ হকের প্রার্থনা ছিলো :

আবার উঠবো জেগে খর চৈত্রে চর
হয়ে তোমার পদ্মায়। পিঙ্গল জটায়
স্রোতের প্রপাত নিয়ে হেঁটে যাবো আমি
স্মৃতির বাসরে জন্মে জন্মে বার বার
কবি হয়ে ফিরে আসবো আমি বাঙলায়।

কিন্তু তখন কি তিনি জানতেন কোন বাঙলায় তাঁকে ফিরে আসতে হবে? অবশ্য 'পংক্তিমালা'য় ইতস্তত তার সংকেত ছিলো। বাংলাদেশের তৎকালীন ক্ষোভ, ব্যর্থতা ও সংগ্রামের কথা এই কাব্যের নেপথ্যে ধ্বনিত হয়েছে একটানা। "একজন কবি যিনি অতীত ও বর্তমানে বেঁচে থাকেন — ভবিষ্যতে নিজেকে সম্প্রসারিত করে দেন, তিনি দাঁড়াবেন কোথায়? সৈয়দ হক সচেতনভাবেই একাব্যে বাঙলা কবিতার আদি ছন্দ চৌদ্দ মাত্রার পয়ারকে বেছে নিয়েছিলেন। অবিশ্রান্ত জল-কল্লোলের মতো এই পয়ার মধুসূদনের বহমানতা, রবীন্দ্রনাথের সংগীতময়তাকে আত্মসাৎ করে শাশ্বত ও আধুনিক চৈতন্যের সেতুবন্ধ রচনায় সিদ্ধি লাভ করেছে, সন্দেহ নেই। পুরোনো আঙ্গিকের এই নতুন উজ্জীবনের ভেতর যেন কবির পরবর্তী পরিণামেরই প্রতীকী আভাস।[২] বলা যায়, পরিণামে 'পায়ের আওয়াজ'-এর আঙ্গিকে যে ঐশ্বর্যের দ্যুতি ঝিকিয়ে উঠেছে বাঙলাদেশের কাব্যে তা তুলনারহিত। বনেদী অক্ষরবৃত্তের শরীরে দেশজ অভিব্যক্তির রঙ ফলিয়েছেন তিনি, ঘরোয়া ছড়ার ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কবিগান ও কথকতার ধারা। পীর-বাবার সংলাপে সেই কথকতা লীন হয়ে গেছে গ্রামীণ মিলাদ মহফিলের আবহে। এইসব ক্ষেত্রে উপমার চমৎকারিত্ব ও মৌলিকত্ব লক্ষণীয় :

কি হইলো এতগুলো জুয়ান-মরদ?
শিঙ তুইলা ছুইটা আসলে পাগলা বলদ
একাই সামাল দিছ, ডর করছ না;
যখন উঠছে খলখলায়া যমুনা
জিনে ধরা যুবতীর লম্বা কালা ক্যাশের লাহান
চৈতের ঝড়ের ঝুঁটি ধইরা দিছ টান
ফিরা আইসছো ঘরে।
আর আজ লোক নাই এতগুলা লোকের ভিতর?

---

১. কথা ও কবিতা, ১৯৮১, পৃ: ১৪৭
২. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

গোঁয়ার বলদ অথবা যুবতী নারীকে শাসনের উপমান মাতবরের সামাজিক ভূমিকার সঙ্গে চমৎকার সংগতিপূর্ণ। লোকসংস্কৃতির উপাদানের সঙ্গে আধুনিক চেতনার সমন্বয়ে 'পায়ের আওয়াজ' এক ভিন্ন স্বাদের কাব্য। মানতেই হয় যে, 'পংক্তিমালা' থেকে 'পায়ের আওয়াজ' পর্ব পর্যন্ত সৈয়দ হকের সৃষ্টিশীলতার এক নতুন ও পেশল নিরীক্ষা শক্তি-সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে।

পঞ্চাশের অন্যতম কবি আল মাহমুদ স্বদেশ-চেতনা ও স্বকাল নিঃসরিত হৃদয়-অনুভবকে আলিঙ্গন করে কাব্যযাত্রা শুরু করেন। শামসুর রাহমানের কবিতায় যেমন আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিক অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছিল, তেমনি ওই একই মনোভঙ্গির অনুসরণে আল মাহমুদের কবিতায় অন্যদিকে উপজীব্য হয়ে উঠেছে গ্রামীণ অনুষঙ্গ। কাব্যযাত্রার প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ কালো দশকের প্রাথমিক স্তরে তিনি ছিলেন আত্মসংকট এবং নেতি চেতনায় আমূল নিমজ্জিত; আর দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ কালো দশকের শেষ দিক থেকে তিনি ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়েছেন স্বাদেশিক বোধে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' (১৯৬৩)-এ ব্যক্তির নৈরাশ্য, ক্রোধ, ক্ষোভ বিচ্ছিন্নতাবোধ, শূন্যতা এবং বেদনার আর্তি প্রতিফলিত হলেও শেষাবধি জীবন ও পৃথিবীর টানে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, 'শিশু আর পশুর বিরোধ'-এ তিনি সঙ্গীহীন, জর্জরিত, উদ্বেল — আকৃতিতে পরম্পরাহীন। নৈরাশ্যের পীড়ন উপেক্ষা করেও শেষাবধি স্বদেশ ও গ্রামজীবনকে আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তিতাস ও তিতাস বাহিত প্রকৃতি ও জনজীবনের উত্তাপ ও বৈভবকে স্থাপিত করেছেন বাংলাদেশের সমগ্রতায় — এই সমগ্রতাই আল মাহমুদের উত্তরণের বীজ —

কেন যে আসতে চাও। এ যে বড়ো ভয়ানক দিন,
চালের লতানো ফুল মরে যাবে বৃষ্টির অভাবে,
দুঃখের চৌকাঠ ভেঙে যদি আসো, দাঁড়াবে কিভাবে?
এখানে যৌবন দ্যাখো, কাঁটা ঘাসে এমন মলিন!
বাতাসে বিশ্বাস নেই, আঙ্গিনার ধবল পাথরে
আগুন ঠিকরে ওঠে, বুঝি এ-ই দুঃসহ দোজখ!
তবু যে আসতে চাও, বুঝি না তো এ কেমন সখ
তোমাকে সাহস দেয় দেহ দিতে আমার বাসরে।
নির্জল নির্দয় দেশে পেটে নেবে আমার সন্তান —
আঙ্গিনায় রক্ত ঢেলে বসন্তকে ফেরাবে কি নারী
জলের প্রার্থনা ছেড়ে আকাশে তুলবে তরবারি?
মানবে না তুমি বলো নিয়তির নিরুপম গান।
তাই হোক! তুমি এসো কোমরে পেঁচিয়ে নীল শাড়ি
দুঃখের ঘরকে করো শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগান।

কবিতাটির প্রথম পঙক্তিতেই এক অদ্বিতীয় বিশ্লেষণ 'বড়ো ভয়ানক দিন' এবং পরের পঙক্তিতে 'চালের লতানো ফুল মরে যাবে বৃষ্টির অভাবে' — লক্ষণীয় কবিতাটি রচিত হয়েছে সেই পটভূমিতে যখন আইয়ুবী সামরিক শাসনে জনজীবন শ্বাসরুদ্ধকর — এই পরিবেশ যে কোনো শিল্পের জন্যেও অস্বাস্থ্যকর, যে কারণে চালের লতানো ফুল মরে যায় বৃষ্টির অভাবে। প্রতীকে ও ব্যঞ্জনায় মূলত সেই সময়-সংক্রান্তির কথাই বলা হয়েছে এখানে। বস্তুত আল মাহমুদের ব্যক্তি-চেতনা স্বদেশ-চেতনারই সমান্তরাল, তিনি ব্যক্তির অফুরন্ত অগ্নি প্রোজ্জ্বলনে দেশকাল-সমাজকেই বিভিন্ন বহুবর্ণিল

Dhaka University Institutional Repository

চেতনা-সংক্রামে রণিত ধ্বনিত করেছেন। তাঁর কবিতার স্বদেশ-চেতনা ও কাল-যুগ-যন্ত্রণার মন্থন একই প্রতিসাম্যে উপজীব্য হয়ে উঠেছে —

একটু উত্তাপ নেই কারো মুখে, কোনো উচ্চারণ
পবিত্র করে না এই নির্বান্ধব প্রকোষ্ঠের কারা?
অথচ ঘটবে কিছু, যা ঘটার বিভিন্ন কারণ
উপস্থিত পড়ে আছে এলোমেলো, শুধু নেই তারা
যাদের বিহনে এই অন্ধকার স্বরূপ ধারণ
করে আছে চরাচরে। ঘরে ফেরে ভয়ের ছায়ারা।
(লোকালয়)

'সোনালি কাবিন' লৌকিক জীবনের যে হার্দ্য-করুণ-ভূমির উপর স্থাপিত — তারই বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে যাদের অধিবাস সেই কৃষকদের প্রাণবন্ত জীবন-সংগ্রাম উঠে আসে এই উচ্চারণে —

নদীর সিকস্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে মধ্যরাতে কেউ
যেমন শুনতে পেলে অকস্মাৎ জলের জোয়ার,
হাতড়ে তালাশ করে সঙ্গিনীকে, আছে কি না সেও
যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার —

একটি জনগোষ্ঠির মানস-প্রতিবেশ, প্রেম ও দ্রোহ, ক্ষোভ ও সংরাগ তার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। বাঙলা-ভাষী জনগোষ্ঠির সংগ্রাম, প্রাকৃতিক ও সামাজিক রাজনৈতিক বৈরিতা ও সংদমনের বিরুদ্ধে তার দ্রোহ — সব কিছুই চেতনার গভীরে মিশে থাকে। বাধ্য হয়ে বাধা পেলে উশকে ওঠে সে আগুন; তখন সে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার অধিকার। সেই অর্থে 'সোনালি কাবিন' বাঙালী সংগ্রামী মানসের বিশ্বস্ত উচ্চারণ। বাঙালীর চিরায়ত সংগ্রামের সঙ্গে আল মাহমুদ অবশ্য বৈশ্বিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অতিরিক্ত মাত্রাও যোগ করেছেন :

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
হিয়েন সাঙের দেশে শান্তি নামে দ্যাখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাঁদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।

সাম্যবাদী চেতনার প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত ঘোষিত হয় এভাবে। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা : "ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কবির অসহায়তা ও জীবিকার অনিশ্চয়তা অন্যান্য কবির মতো আমাকেও কোথাও স্থিরভাবে দাঁড়াতে দেয়নি। আর আমি তো জন্মেছি পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশে। কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছে এর প্রতিকার চিন্তায়।[১] এই প্রতিকার প্রক্রিয়াটি যেহেতু কখনোই সম্পন্ন হয় না, ফলে দেশের প্রতি অনুরাগ ও তার সংকটে সমানভাবে কেঁপে ওঠেন তিনি। সফলতার বোধও তাঁকে উদ্দীপ্ত করে তোলে অনেক সময়, ফলে সাম্যবাদী চেতনার প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত ঘোষিত না হয়ে পারে না।

---

১. আল মাহমুদ, আল মাহমুদের কবিতা, ভূমিকা, পৃ: ৬

Dhaka University Institutional Repository

আল মাহমুদের কবিতার অন্যতম সম্পদ এর শব্দসম্ভার। তৎসম-তদ্ভব শব্দের সঙ্গে লোকজ এবং মুসলিম জীবনের অন্তরঙ্গ শব্দরাজির সহাবস্থান ঘটেছে তার অধিকাংশ কবিতায়। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যখন যুক্ত হলো আঞ্চলিক ভাষারীতির ধরন তখন তাঁর কবিতা শুধু অভিনবই হয়ে ওঠেনি, বাংলা কবিতায় আধুনিকতাকে তিরিশি কবিতার পর কিছুটা প্রসারিত করেছিলেন তিনি। এ সম্পর্কে আল মাহমুদ নিজেই বলেছেন : 'আমি আমার কবিতার জন্য একটি পছন্দমত ভাষাভঙ্গি উদ্ভাবন করতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দরাজির সন্ধান পাই। অকস্মাৎ আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বাঙলা ভাষার সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দরাজি বহু বিচিত্র ব্যবহারে ও যথেচ্ছ আচরণে তিরিশ দশকেই বিস্বাদ, এমনকি পরবর্তী কবিদের জন্য গন্ধহীন পুষ্পের পচা স্তূপে পরিণত হয়েছে। এখন বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দৈনন্দিন ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দের যে অক্ষয় ভান্ডার রয়েছে সেখান থেকে ব্যাপক ভাবে শব্দ আহরণ করে সাহিত্য রচনা করতে না পারলে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একঘেয়েমি কাটবে না। এই আহরণ নির্বিচার হলে চলবে না। প্রতিভাবান কবি ও কথাশিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি সেখানে একান্ত দরকার। অনেকে আমার কথা শুনে তাদের সামগ্রিক রচনা শৈলীকেই আঞ্চলিক ভাষায় দাঁড় করাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। মনে রাখতে হবে আধুনিক বাঙলা ভাষার চলতি কাঠামোকে পরিত্যাগ করে নয় বরং এই কাঠামোর মধ্যেই আঞ্চলিক শব্দের কাব্যময় প্রয়োগকে নিশ্চিত করতে হবে। তবেই ভাষা লাফিয়ে উঠবে সমুদ্র তরঙ্গের মতো।[১] আল মাহমুদের কবিতাও যে এভাবেই তাঁর বক্তব্য অনুসারে নতুন ভাষারীতি ব্যবহারে সচকিত হয়ে উঠেছিল, তা তাঁর অধিকাংশ কবিতার ক্ষেত্রেই এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

অসংখ্য চক্ষু যেন ঘিরে ফেলবে এখুনি আমাকে
শস্যের সবুজ থেকে ক্রমাগত উঠে আসে গোসার গোঙানি
করোগেটে ঢেউ তুলে চাবকে দেবে আমাকে নির্মম।
তন্ন তন্ন করে দেখে নেবে বাসন-কোসন
পুথিপত্র ছারখার ছড়িয়ে চৌদিকে
শিকার পাইলা খুলে দেখবে নেই, ভাত বা সালুন।
(আমিও রাস্তায়, সোনালি কাবিন)

সনেটের আঙ্গিকে রচিত 'সোনালি কাবিন' কবিতায় উপমা, রূপক এবং শ্লেষোক্তির গ্রন্থনায় গড়ে উঠেছে সার্থক বাকপ্রতিমা —

হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী, পাটিতে আমার
এবার গুটাও ফণা কালো লেখা লিখো না হৃদয়ে,
প্রবল ছোবলে তুমি যতটুকু ঢালো অন্ধকার
তারও চেয়ে নীল আমি অহরহ দংশনের ভয়ে।

অনুপ্রাসের ব্যাপক ব্যবহার ভাষাভঙ্গিকে করেছে শ্রুতিমধুর —

১. পূর্ব পুরুষেরা ছিলো পাট্টিকেরা পূরীর গৌরব
২. তোমার শরীরে যদি থাকে শস্যের সুবাস,
৩. বাঙালী কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী,

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং গদ্যছন্দকে তিনি সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কবিতার ধারা স্রোতে তিনি জাগিয়েছেন নিজেকে স্বকাল ও সমকালের জগৎ ও জীবনকে।

পঞ্চাশের অপর এক কবি ফজল শাহাবুদ্দীনের কাব্যচর্চা শুরু হয়েছিলো ভিন্ন পথে। নারী ও প্রকৃতির যৌথ উপচারে তিনি তার কাব্যের ডালা সাজিয়েছিলেন। বস্তুত, নারীর জন্যে পুরুষের এবং পুরুষের জন্য নারীর শরীর স্পর্শের যে আকাঙ্ক্ষা জাগে, সেই আকাঙ্ক্ষার 'অতৃপ্ত তরঙ্গে একা' 'মোহাবিষ্ট' হয়ে বিরতিহীন ভাবে তিনি রচনা করে গিয়েছেন কবিতার পর কবিতা। বিষয়-বৈচিত্র্য খুব বেশি না থাকলেও তাঁর বেশ কিছু কবিতায় লক্ষ্য করা যায় মানুষ, প্রকৃতি, দেশ-চেতনা বা আন্তরিকতার ইশারা। প্রকৃতির উল্লেখে নিসর্গের পটে মানুষের চলমান জীবন-সংসারকে দেখতে চেয়েছেন কখনো কখনো। স্বদেশ চেতনার ক্ষেত্রেও দেশের সংগ্রামী মানুষের চাইতে এর নিসর্গ-মৃত্তিকার প্রতিই কবির আগ্রহ লক্ষ্য করা যাবে বেশি। নাগরিকতার প্রতি তাঁর বিপন্ন বোধ প্রতিফলিত হয় এভাবে :

হামাগুড়ি দিতে হয় দুপুরের তৃষ্ণার্ত গলিতে ...
বিহ্বল চৈতন্যে আসে সন্তর্পণে কুকুরের দীর্ণ
ক্লান্তি। আমের গলিত খোসা, মাছ, কীট, ফেরিঅলা
ছড়ানো নগর পথে — বায়ু দিগ্‌ভ্রান্ত যেন কোনো
উন্মাদ উদ্বাস্তু নৃত্যে দিগম্বর গ্রীষ্মের দুপুরে।

[দুপুরের কথা]

দুপুরের এই বর্ণনায় কবির অস্তিত্বের বিপন্নতা, সভ্যতার প্রতি ঘৃণা, এমনকি আত্মরতিমূলক নির্বিকার বোধও পরিলক্ষিত হয়। বিংশশতাব্দীর বণিক-সভ্যতার আলোকে বিভ্রান্ত দিশেহারা কবি-চৈতন্যের উচ্চারণ মানুষের নিষ্ঠুরতার বলয়ে উপস্থিত হয় এভাবে :

হে আমার অস্তিত্ব আমাদের আজ অন্ধকার দাও
কেননা এই বিংশ শতাব্দীর সুতীব্র আলোকে
আমরা আজ বিভ্রান্ত দিশেহারা এই যান্ত্রিক উজ্জ্বল
বিবিক্তি মত্ত নগ্নতার চাবুকে —
আমরা আজ ছিন্নভিন্ন
আমরা শঙ্কিত নিজেদের নিষ্ঠুর নিঃস্বতায়।

বলাবাহুল্য, এরকম পরিস্থিতিতে কবি-চৈতন্য আক্রান্ত হয়ে পড়বে আত্মরতিতে : "আমি মগ্ন তৃষ্ণার অগ্নিতে মগ্ন/অলৌকিক নিজেরি কুহকে"। সমসাময়িক দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভ, ঘাত-প্রতিঘাতময় সময় থেকে ব্যক্তির প্রতিযোগিতার দৌড় থেকে নিজেকে আড়াল করেছেন দেহ-চেতনায়। এক্ষেত্রে তিনি সৈয়দ আলী আহসান, বিশেষত, সৈয়দ শামসুল হকের অনুসারী। সৈয়দ আলী আহসানের মতো যদিও পরিশীলিত নয় তাঁর দেহ- ভাবনা বরং তা অনেক বেশি বাস্তব, সজীব, জান্তব এবং প্রত্যক্ষ। আর এটাই হচ্ছে তাঁর কবিতায় আধুনিকতার একটা দিক। আর একটা দিক হলো তাঁর ভাষাভঙ্গি। ছোট ছোট লিরিকে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্য-জগৎ, পুরে দিয়েছেন তাঁর অনুভব, চেতনাকে। জটিলতা স্থান পায়নি এবং ভাষা অলংকারের বাহুল্যে তা ভারাক্রান্ত নয়। মাঝে-মধ্যে অনুপ্রাসের ঝংকার লক্ষণীয় :

Dhaka University Institutional Repository

হে আমার বাঙলা ভাষা, মা আমার
তোমার কাছে আমি আমৃত্যু অনন্তকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।
(বাঙলা ভাষা মা আমার)

চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে চরণান্তিক মিল দিয়ে এক ভিন্ন স্বাদ এনেছেন তিনি "অস্থিতে মজ্জায় তুমি/ছিলে চিরকাল আমার মাংসের মধ্যে আমার কঙ্কাল। চুম্বনে নিমগ্ন একা ছিলে আলিঙ্গনে উন্মত্ত বৃষ্টির গানে শ্রাবণে-শ্রাবণে"/ (রমিত বসন্তে, যা তোমার কাছে)।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ মূলত সৃষ্টি করেছেন সনেট — পঞ্চাশের আরো অনেক কবিই এই মাধ্যমটিকে ভালোবেসেছিলেন। ব্যক্তি, দেশ, সমাজ, ঐতিহ্য — এইসব তার কবিতার বিষয়; তাঁর একটি বিশিষ্ট চেষ্টা পুথির রূপায়ণে।[১] আত্মকথনের ভঙ্গিতে ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ছাড়াও সমকালীন যুগচিত্র এবং স্বদেশ-প্রেমের প্রকাশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সনেটসমগ্রে। তাঁর ১৮ মাত্রার সনেটগুলিতে অর্থ- দ্যোতনাও লক্ষ্য করা যায় :

সুন্দর বনের বাঘ যাচ্ছে কমে এবং অধুনা
হাঙর কুমীর মত্ত সমুদ্রে করে না আনাগোনা
ভোলে হিংস্রতার স্বাদ, দেখি বন্য বরাহের দল
বাঁধে না আক্রোশে আর আগেকার মতন দঙ্গল।
চিত্রল হরিণ সেও লুকিয়ে গিয়েছে ঘন বনে
ভয়াল আজদাহা ধায় প্রাণ ভয়ে গভীর গহনে।
উঁচিয়ে প্রচন্ড শুঁড় আরণ্যক হাতীও পালায়
নিধনের যজ্ঞে যেতে শিকারী চলেছে পায় পায়
চোখে তার ঈর্ষা ঘৃণা বনের বাঘের মত জ্বলে,
অরণ্যে জন্তুরা কাঁপে মানুষের কঠিন কবলে।
(সুন্দরবনের বাঘ)

আঙ্গিক-সচেতন কবি মাহফুজউল্লাহ ছড়ার ছন্দেও সিদ্ধহস্ত —

স্বপ্ন হে মোর নিত্যকালের সঙ্গী
শিখলে কোথায় কালের চতুর ভঙ্গি?
(স্বপ্ন হে মোর)

পঞ্চাশের অন্য এক কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্যযাত্রার প্রাথমিক স্তরে রোমান্টিক চেতনায় আক্রান্ত হলেও এই পর্বের কবিতায় লক্ষ্য করা যায় একধরনের উত্তরণ। রোমান্টিক বোধ থেকে যদিও মুক্ত নয় তাঁর কবিতাবলি, তবু আরো বেশি সমকাল-সংলগ্ন হতে চেয়েছেন তিনি। স্বদেশ-চেতনা, ঐতিহ্য-ভাবনা এবং বহির্বিশ্বের দিকে প্রসারিত তাঁর দৃষ্টি, পূর্ববর্তী দশকের দেশাত্মবোধ তাই হয়ে উঠেছে আরো গভীর, ঐতিহ্য চেতনায় সমৃদ্ধ :

---

১ আবদুল মান্নান সৈয়দ, কাফেলা, এপ্রিল, ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলার দুয়ার তুমি খুলে দিলে পৃথিবীর দিকে;
এবং সহস্রধার আলো এল অমেয় উজ্জ্বল
তুলনাবিহীন গানে স্পন্দমান, দ্রুত পরিমল
গন্ধবহ অচিন্ত্য সমীরে তুমি যেন অনিমিখে
স্বচ্ছন্দ বিহারী। সেই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ঐক্যধ্যানে
নবনব উত্তরণে অনিঃশেষ সৌকর্যে সুধায়
বাঙলার ভাষাছন্দ কাব্যরীতি নব-অভিধায়
নতুন আনন্দে বেঁধে দিলে এক অতুলন জ্ঞানে।

(মধুসূদন, প্রতনু প্রত্যাশা)

বাংলাদেশ ও বাংলাভাষাকে অনুভব করবার যে আকৃতি মধুসূদনে দেখা গিয়েছিলো — তেমনি মনিরুজ্জামানও এই পর্বে বিশুদ্ধ রোমান্টিকতায় সমর্পিত না থেকে স্বদেশ তথা পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। সমকালীন পৃথিবী এই সময়ে দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত। বিশ্বজুড়ে স্নায়ুযুদ্ধের চাপ। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পৃথিবীর ছবি ফুটে উঠেছে চমৎকার ভাবে —

আণবিক অস্ত্রধারী পৃথিবীর দৃপ্ত শাসকেরা
নিত্য নিত্য শানিয়ে তুলছে বোমা
নাপাম ফেলছে ভিয়েতনামে, খেলছে দাবা
মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, এশিয়ার দারিদ্র্যে নিয়ত।
কতিপয় ধড়িবাজ পৃথিবীকে করেছে ডাগাড়
প্রেমহীন নিরুত্তাপ ক্রুর লোভাতুর হাতে
ঠেলে দিচ্ছে অনিবার্য স্রোতে

(কবি, প্রতনু প্রত্যাশা)

শুধু বহির্বিশ্ব নয়, স্বদেশচেতনার সূত্রে এই পর্বের কবিতায় উঠে এসেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র :

ছুটে যাই, খবর লিখি, ছবি তুলি, কিন্তু
বাংলাদেশের মত কোথাও এমন দেখিনি।
সহস্র সহস্র শিশু যুবা বৃদ্ধ নারীর শব
দুর্গত দ্বীপাঞ্চল জুড়ে
ঝাঁক ঝাঁক মৃত মাছির মত পড়ে আছে,
নগ্ন, বস্ত্রহীন।

(জনৈক বিদেশী পর্যটক বলছেন, প্র. প্র.)

ব্যক্তিগত প্রেমও হয়ে ওঠে স্বদেশ-চেতনার সমস্পর্শী : 'আমার কবিতা সে তো তোমার প্রণয়'। 'শহীদ স্মরণে' কবিতায় পাওয়া যায় এই বোধের আরো প্রগাঢ় উচ্চারণ :

আমি কোন্ শহীদের স্মরণে লিখব?
বায়ান্ন, বাষট্টি, উনসত্তর, একাত্তর,
বাঙলার লক্ষ-লক্ষ আসাদ মতিউর আজ
বুকের শোনিতে উর্বর করেছে এই
প্রগাঢ় শ্যামল।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন পরিপার্শ্বের তাপ ও জ্বালা যেমন তার কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি তাতে যন্ত্রণা মোচনের স্নিগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে ভাষাভঙ্গির সার্থক ব্যবহারে। শব্দের যথোপযুক্ত ব্যবহার, ছন্দের নিয়মানুবর্তী দোলা, আধুনিক জীবনের স্বেদ ও সংঘাতের উপযোগী তাঁর কবিতার ভাষা।

ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত একটি চমৎকার কবিতা :

লাল গোলাপটা তোমাকে মানায় বেশ,
অথবা তুমিই গোলাপের লাল কুঁড়ি,
এ তিন ভুবনে নেই কো তোমার জুড়ি
বিদ্যুতে মেঘে অর্পিত তনু কেশ—
(রূপম, দুর্লভ দিন)

"তিনি ছন্দ সম্পর্কে সচেতন। হৃদয়ের তুলনায় কান তাঁর বেশি সতর্ক। ...তবে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জাগতিক বিষয়সমূহ এমন কি বহমান জাগতিক সমস্যাসমূহ নিয়েও কাব্যচর্চা করেছেন। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা ছড়াধর্মী হয়ে উঠেছে।[১]

দিলওয়ার সমাজ-সচেতন ও সমাজ-বাস্তবতার কবি। তাঁর কবিতার মৌল প্রেরণা হলো হৃদয় নির্ভর, রোমান্টিকতা এবং সংগ্রামী চেতনা। সমকালীন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা যেমন তাকে কবিতা রচনায় আমন্ত্রণ জানায়, তেমনি সংগ্রামী চেতনায় নির্ভর করে গড়ে ওঠে তাঁর শব্দভান্ডার। সমালোচক বশীর আল হেলাল বলেন, "দিলওয়ার তাঁর সব দুঃখ, ক্রোধ, জীবন-যন্ত্রণা, জীবনোল্লাস বাস্তবচেতনা ও আদর্শ বোধকে তাঁর সৌন্দর্য চেতনা ও একটি রোমান্টিক হৃদয় দ্বারা মন্ডিত করেছেন, সেই জন্যে তিনি সার্থক কবি"।[২] গণমানুষের স্বপ্ন-সাধের কাছে নিবেদিত তাঁর কবিতার উচ্চারণ :

যাদের চোখের মনি জ্বলে ওঠে
রাত পোহাবার আগে
পৌঁছিয়ে দিতে পৃথিবীর কথা
সূর্যের পুরোভাগে
শ্রমজীবী সেই মহামানবের
রক্তগোলাপ হাতে
ছড়িয়ে দিলাম আমার কবিতা
নিদ্রাবিহীন রাতে।

শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তাঁর এই সহমর্মিতা, এই জীবনবাদ স্বদেশের কাল-চেতনায় সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর কবিতাকে পৌঁছে দেয় আন্তর্জাতিকতায়—

ধারালো বশার মতো স্বর্ণময় সূর্যরশ্মি ফলা
কীন ব্রীজে আঘাত হানে শুরু হয় জনতার চলা।

---

১. বশীর আল হেলাল, সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা, পৃ: ৪৬
২. প্রগুক্ত, পৃ : ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

বাহান্ন থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত বাঙালী জীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন, স্বপ্ন-সংঘাত ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল। দিলওয়ার এই সময়ের সংঘাতকে ধারণ করেই দেশ, মাটি, আর দেশের মানুষকে উপজীব্য করেছেন তাঁর কবিতায়। তবে "রূপকল্প ও আঙ্গিকরীতিতে রাবীন্দ্রিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রভাব চিহ্নিত, তবে সে প্রভাব প্রায়শ কতগুলি শব্দব্যবহারেই সীমিত, মূল ভাবধারা রবীন্দ্রযুগ থেকে তেমন প্রাগ্রসর নয়।[১] তবে পরবর্তী কাব্য সংকলনে দিলওয়ার মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও ফ্রিভার্সের ব্যবহারে সফলতা অর্জন করেছেন। এছাড়া সনেটেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'উদ্ভিন্ন উল্লাস' কাব্যগ্রন্থে সনেটের আঙ্গিক সচেতনাতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের ব্যবহার সূত্রে সংগ্রামী মানুষের শক্তি ও মুক্তির জয়কে তিনি উচ্চকিত করে তোলেন প্রগাঢ় উচ্চারণে :

অলৌকিক রোগাক্রান্ত শ্যেন তুই অন্ধ ইডিপাস
ডাকে তোরে মুক্তিদাতা বিপ্লবী মাটির স্পার্টাকাস।

শহীদ কাদরীকে পঞ্চাশের দশকের সবচেয়ে মেধাবী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনেকেই। তাঁর কবিতার তীক্ষ্ণ নাগরিকতা, নির্মেদ প্রকরণ এবং মননির্ভরতা তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। নাগরিক জীবনের নানাবিধ অনুষঙ্গ ও অভিজ্ঞতাকে তিনি রূপায়িত করেছেন যেখানে নাগরিক অমানবিকতার কেন্দ্রে ব্যক্তি মানুষের নিরন্তর পদযাত্রা — রৌদ্রে, বর্ষায়, ক্ষুধা ও স্বপ্নের ভেতর :

এক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু বর্ষার বিদ্যুতে
নগ্ন পায়ে ছেঁড়া পাতলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকেঝকে সদ্য নতুন নৌকার মতো একমাত্র আমি।
(বৃষ্টি, বৃষ্টি : উত্তরাধিকার)

আশৈশব শহরে বেড়ে-ওঠা শহীদ কাদরী শহরের অবক্ষয়ী অনুষঙ্গকে যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি নাগরিকতার প্রভাবেই তিনি নিসর্গ, মানুষ এমন কি নারীর মধ্যে লক্ষ্য করেন তাঁর বিরোধী কবিসত্তাকে। ফলে "নগর জীবনের সন্ত্রাস, ক্লেদ ও পতন শহীদ কাদরীর প্রথম গ্রন্থ 'উত্তরাধিকার'-এ এতটা মহামহিম যে, এই গ্রন্থের সব কবিতাকে একজন নিশাচর নগর-পথিকের দিনলিপির বিস্তারণ ভাবা যায়।"[২] তাঁর নগরচিত্র আবশ্যিকভাবেই নৈশচিত্র — "ঝুলে থাকে মাঝ রাতে রেস্তোরাঁর কড়িকাঠ থেকে/বাদুড় না বেলুন বন্ধু, স্বপ্ন না হতাশায় ঠাসা"? নামকবিতার এই অন্ধকারবোধ সারা কাব্যে লেপ্টে রয়েছে :

জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ণ থেকে নেমে —
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্পপোষ্টের নিচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু রুদ্ধচক্ষু সেই ব্ল্যাক আউটে আঁধারে।

---

১ রাহাত খান, মাসিক পূবালী, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭২, পৃ: ৯১৯
২ খোন্দকার আশরাফ হোসেন, বাংলাদেশের কবিতা, পৃ ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক জীবনে কবি যে আত্মসংকটের মুখোমুখি, বিপদাপন্ন অবস্থার শিকার, তারই সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এখানে। তাঁর অধিকাংশ কবিতার উপজীব্য বিষয়সমূহে স্বদেশ-সংলগ্ন থেকেও যেন তিনি নিজেকে ভেবেছেন 'নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু, অনাত্মীয় একক/আঁধার টানেলে যেন ভূতলবাসী'র মতো। ব্যর্থতার বোধই জীবনের সবটুকু নয়, জীবনের অপর প্রান্তে জেগে ওঠে স্বপ্ন। যে স্বপ্ন তাঁর রাজনীতি-চেতনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে ওঠে :

একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ
আমার কনিষ্ঠ আঙুলে, কখনও উদ্ধত তলোয়ারের মতো
দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোরাকাটা
জ্বলজ্বলে রূপ জ্যোৎস্নায়।
(ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়, তো. অ. প্রি.)

অথবা,

যদিও বধ্যভূমি হলো সারাদেশ রক্তপাতে, আর্তনাদে
হঠাৎ হত্যায় ভরে গেল বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
অথচ সেই প্রান্তরেই একদা ধাবমান জেব্রার মতো
জীবনানন্দের নরম শরীর ছুঁয়ে ঊর্ধ্বশ্বাস বাতাস বয়েছে।

এছাড়াও 'রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট, নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে, রাষ্ট্র প্রধান কি মেনে নেবেন, স্বাধীনতার শহর, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা প্রভৃতি কবিতায় তাঁর স্বদেশদীপক উচ্চারণ নতুন মাত্রা পেয়েছে। এক্ষেত্রে আঙ্গিক-সচেতনতার পরিচয় পাই তাঁর ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে :

বন্য শূকর খুঁজে পাবে প্রিয় কাদা
মাছ রাঙা পাবে অন্বেষণের মাছ
কালো রাতগুলো বৃষ্টিতে হবে শাদা
ঘন জঙ্গলে ময়ূর দেখাবে নাচ।
(সংগতি)

সার্থক উপমার ব্যবহারও লক্ষণীয় :

১. হে আমার শব্দমালা, তুমি কি এখনও বৃষ্টি-ভেজা বিব্রত কাকের মতো
২. চারিদিকে বিপ্লবীর চোখের মতন উদ্ধত আগুন-রঙা ফুল গাছে গাছে
৩. শিউলি গাছের মতো আমার মা দারুণ সুগন্ধ
সঙ্গে নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে টান দেন কনিষ্ঠ আঙুলে।

উপমা, প্রতি-উপমা কবিতাকে করে গতিবান, ইন্দ্রিয়ঘন ও চিত্রল। শহীদ কাদরী উপমা ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব ভুবন যেমন তৈরি করেছেন তেমনি বিষয়বস্তুর মহিমাকে ছন্দের শাসনে বেঁধেও তাকে দিয়েছেন অতুলনীয় গৌরব। এখানেই তিনি সকলের চেয়ে আলাদা।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের আলোচ্য পর্বে ষাটের দশকের কবি রফিক আজাদের কবিতা গ্রন্থভুক্ত না হলেও এই সময় পর্বে প্রকাশিত তাঁর কবিতায় তৎকালীন সামরিক শাসকের বুটের তলায় নিষ্পিষ্ট জনগণের যে অসহায় আর্তি প্রতিফলিত হয়েছে — তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। শহীদ কাদরীর মতো রফিক আজাদও আত্মসংকটে, অবক্ষয়ে বিব্রত। কিন্তু শহীদ যেখানে নগর ও পরিপার্শ্বের বাইরে নিজেকে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন না, সেখানে রফিক আজাদ পুরোপুরি নাগরিক হয়েও জনসম্পৃক্ত, মানুষের প্রত্যাখ্যান, ভালোবাসা, মৃত্যু চেতনায় ধাবিত পাতালে আমূল নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বোপরি স্বাদেশিক বোধে উজ্জীবিত —

নগর বিধ্বস্ত হলে, ভেঙে গেলে শেষতম ঘড়ি
উলঙ্গ ও মৃতদের সুখে শুধু ঈর্ষা করা চলে।
জাহাজ ,জাহাজ — ব'লে আর্তনাদ সকলেই করি
তবুও জাহাজ কোনো ভাসবে না এই পচাজলে।
(নগর ধ্বংসের আগে, অসম্ভবের পায়ে)

লক্ষণীয় 'জাহাজ' এবং 'পচাজল' প্রতীকধর্মী এই শব্দ দু'টি সবিশেষ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। 'জাহাজ' ভাসাবার জন্য সমুদ্র না হলেও দুকূলপ্লাবী জলস্রোতের প্রয়োজন। সেই বিকশিত সমাজেই এই জলস্রোত বহমান যেখানে অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্পসাহিত্যের চর্চা তথা সৌন্দর্যের অন্বেষা বর্তমান। অথচ কবিতাধৃত 'পচাজল'-এর প্রতীকে সেই উত্তাল সময়ের প্রেক্ষিতে প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে যখন সামরিক একনায়ক আইয়ুব খানের আমলের 'কালো দশকের' ডোবায় আবদ্ধ মানুষের মন ও মনন। বলাবাহুল্য, স্বৈরশাসকের পচা জলাশয়ে শিল্পের 'জাহাজ' কখনো ভাসতে পারে না। তৎকালীন এই বিবর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতটি উঠে আসে এই কবির শব্দ ব্যবহারেও —

যেন একলক্ষ দু'হাজার তিনশ চারজন রফিক আজাদ
সামরিক কায়দায় প্রতিবন্ধকহীন পাতালে নেমে যাচ্ছে!

কেবল স্বদেশের মাটিতেই নয়, বিশ্বজুড়ে হানাহানি, যুদ্ধ, রক্তপাত এবং বিপর্যয়ে বীতশ্রদ্ধ কবি অবশেষে রচনা করেন 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' নামক যুদ্ধবিরোধী কবিতা। শান্তির পক্ষে দৃঢ়তায় দাঁড়ানোর আহ্বান ধ্বনিত হতে থাকে এই উচ্চারণে :

চুনিয়া শুশ্রূষা জানে,
চুনিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধে, চুনিয়া সান্ত্বনা শুধু
চুনিয়া কখনো জানি কারুকেই আঘাত করে না;
চুনিয়া সবুজ খুব, শান্তিপ্রিয় শান্তি ভালোবাসে
কাঠুরের প্রতি তাই স্পষ্টতই তীব্র ঘৃণা হানে।
চুনিয়া গুলির শব্দ পছন্দ করে না।

'অকর্মক ক্রিয়ার উক্তি' কবিতাটিতে ষাটের দশকের সেই নারকীয় অনুভূতি, অসহায় মানুষের আর্তনাদ ও হাহাকার ভাষারূপ পেয়েছে ভিন্নধর্মী প্রতীকের মাধ্যমে :

Dhaka University Institutional Repository

অকর্মক ক্রিয়া আমি — পঙ্গু, হীন; সাহায্য ব্যতীত
চলাফেরা, এমনকি, ব'সে থাকা দেখি বেগতিক,
..... বাষ্পাতুর নেত্রে সম্মুখে তাকিয়ে দেখি :
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, চতুর্দিকে আঁধার, আঁধার —
আমার মুক্তির কোনো আশা নেই, সম্ভাবনা নেই।
(অকর্মক ক্রিয়ার উক্তি)

প্রায় সমার্থক দু'টি শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে নতুনতর নান্দনিক মাত্রা প্রয়োগ করেন তিনি তা তাঁর প্রকরণগত নিরীক্ষারই ফসল হয়ে ওঠে —

'পদব্রজ' আর 'পায়ে-হাঁটা' এই শব্দবন্ধ দু'টি নিয়ে
আমার হয়েছে মুশকিল
একটি আমাকে টানে ভেতর থেকে,
অপরটির টান বাইরের হলেও
খুউব জোরালো —

ছন্দ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সচেতন। নিরেট গদ্যাত্মক কবিতায়ও তাঁর অক্ষরবৃত্তের বুনোট অবধারিত হয়ে ওঠে। এছাড়া মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনায়াস লব্ধ ভঙ্গিটি প্রয়োগ করে তিনি জন্ম দিয়েছেন অনেক জনপ্রিয় কবিতা। রফিক আজাদের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কে খোন্দকার আশরাফ হোসেন বলেন, "অক্ষরবৃত্তীয় ছন্দ কাঠামোতে তৎসম শব্দ কখনো কখনো যুক্তাক্ষর শব্দের ব্যবহারে কবিতার গীতিময়তা ক্ষুণ্ন হয়েছে"।[১] এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারে রফিক আজাদের নিজস্ব বিশ্লেষণ : "যে সময় আমরা কাব্যচর্চা শুরু করি, সেই প্রারম্ভিক যাত্রাপথে যখন ভাষার উপর উপর্যুপরি হামলা চলে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে, অনাবশ্যকভাবে, অভিধাননির্ভর আরবী-উর্দু শব্দ ভান্ডার এসে কাব্যের বাজার দখল করতে থাকে — তখন অত্যন্ত সচেতনভাবে কবিতায় আমি তৎসম, অর্ধতৎসম শব্দ, এমনকি অনেক ভারী অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে হাজার বছরের বাঙলা ভাষার ঐতিহ্যে সংলগ্ন থেকেছি। বিশ্ব-কবিতার যে প্রধান প্রবণতা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এই প্রসঙ্গে আমি তা-ও স্মরণে রেখেছে। আধুনিক কবিতায় শুধু নয়, আধুনিক জীবনেও নিরেট গীতিময়তার কোনো স্থান নেই। কাজেই গীতিময়তাকে অপরিহার্য করে তোলে এরকম শব্দ আমি সচেতনভাবে পরিহার করে থাকি।"[২]

রফিক আজাদ স্বেচ্ছাকৃত তৎসম ভারী শব্দের সঙ্গে চলতি ভাষার হালকা শব্দাবলির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' থেকে 'ক্রমাগত দৈনন্দিন' শব্দ এবং সরল বাক্যবন্ধের দিকেই ঝুঁকেছেন বলে মনে হয়। কবিতায় তাঁর এই শব্দানুভাবনা কবিতার বিষয় হিসেবে উপজীব্য হয়ে ওঠে। নারীকে তাঁর মনে হয় মূর্তিমান অভিধান, খুচরা অথবা খুব দরকারি ভারী শব্দাবলি প্রয়োজনে পড়ে নেন নারীর শরীরে : 'তোমাকে পড়েই শিখে নিই শব্দের সঠিক অর্থ, মূল ধাতু, নির্ভুল বানান'। আঙ্গিক প্রকরণের মতো পরবর্তী সময়ে তাঁর কাব্য-বিষয়েও বৈচিত্র্য বেড়েছে, সমকালীন রাজনীতি সংলগ্ন হয়ে উঠেছেন অনেক বেশি।

---

১. বাঙলাদেশের কবিতা, অন্তরঙ্গ অবলোকন, পৃ: ৮২
২. রফিক আজাদ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মান্নান সৈয়দ ষাটের দশকের অন্যতম শিল্প-সচেতন কবি। প্রথম থেকেই তিনি কবিতাকে নিয়েছেন বোধের বিম্বিত দর্পণ হিসেবে, বহির্পৃথিবীর জানালা হিসেবে নয়। যদিও বাঙলা কবিতার ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য করা যায়, কবির অন্তর্জগতের চেয়ে কবিতায় তাঁর সামাজিক সত্তাই প্রবলতর। মান্নান সৈয়দের কবিতায় অন্তর্জগৎই প্রধান, বহির্পৃথিবী নিজ গৌরবে নয়, বরং তাঁর প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। এই শ্রেণীর কবিতায় শুধু তির্যকতাই মূল সুর নয়, নিমগ্নতা, বেদনার অভিঘাত এবং সমাজ বাস্তবতার ছায়াপাতও লক্ষ্যযোগ্য। "বস্তুত কবির অন্তঃদেশে সামাজিক বিস্ময় ও অস্থিরমতি মানুষের যে হাহাকার, মূঢ়তা, স্বার্থ-প্রয়াস, স্থূল বিবেচনা কূটাভাস আবিষ্কৃত তাই তিনি কবিতায় প্রতীয়মান করেছেন, কখনো বিনম্র মেজাজে, সংহত উচ্চারণে আবার কখনো একধরনের বর্ণোজ্জ্বল সাংকেতিক স্বরধ্বনি ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়ঘন চিত্রকল্প ও বাকপ্রতিমার নির্মাণ ও প্রতিনির্মাণের মাধ্যমে তিনি কবিতা বাস্তবতাকে অনুবাদ করে নিঃসন্দেহে তাঁর দ্রোহকে কুশাগ্রসম সূক্ষ্ম ও সঞ্জীবিত করেছেন।[১] তাঁর বাস্তবতাবোধ সংক্রামিত কবিতা ভাষারূপ পেয়েছে এভাবে :

আমাকেও তেল-নুন-মাংসের হিসাব কষতে হয়
আমি নই বায়ুভুক রবীন্দ্রনাথ,
কবিতাকেও হতে হয় পৌরুষের —
শুধু নারীলাবণ্যগ্রস্ত নয়
বস্তুর সংঘর্ষে দীপ্ত জ্বলে উঠতে হয় আগুনের মতো।

বস্তুত, চেনা-জানা পৃথিবী বহির্ভূত যে অচেনা অদেখা জগৎ কবির আন্তঃভাবনায় পরিক্রমশীল, তার অতিনির্দিষ্ট আয়তন বা বলয় যেন আধো আলো আধো অন্ধকারে নিমজ্জিত তেমনি তার অস্তিত্ব নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দ ও পরাক্রমশালী। ফলে কবিকে হতেই হয় অনুগত দাস, কেননা তাঁর বিস্ময়ের অবধি নেই। একটি টানা গদ্য-গাঁথুনি কবিতায় দেখা যায় :

দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল অনেক অনেক বছর আগে,
ঢাকায়, গোপীবাগে, কয়েকজন গ্রামীণ যুবতী খাল পেরিয়ে
এসেছিলো কুলোয় করে চাল নিতে, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা
করবে নেচে-গেয়ে।
অক্রিয় ঐ সমকামীকে দেখে কেন অনেক দিন আগের তুচ্ছ
ঐ ঘটনাটি মনে পড়ে গেল, জানিনে —

(বৃষ্টিহীন কলকাতা)

মান্নান শব্দ আর ধ্বনির কারিগর। মান্নানের মধ্যে এও একটি স্পর্ধার মতো ব্যাপার। মান্নানের সমকালীনদের মধ্যে শুধু নয়, অন্য দশকেও তাঁর মতো শব্দ-সচেতন কবি নেই। ধ্বনি-চেতনা মান্নানকে এক নিখুঁত কলার সন্ধান দিয়েছে।

---

১ আবদুল মান্নান সৈয়দ, সাহিত্য, সেলিমা স্বপ্না সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, পৃ: ২২

Dhaka University Institutional Repository

ধিতাং কুঠার বাজে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু
আজ সে সর্বতোশূন্য যাকে পুরো চেয়েছি ভিতরে,
ধিতাং কুঠার নাচে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু
রক্ত বুকে তীব্র নাদ শ্রাবণের মেঘের মাদলে।[১]

সমাসোক্তি অলংকারের ব্যবহার লক্ষণীয় —

চীৎকারের নিচে পড়ে আছে আমাদের শাদা শহর
তার পিঠ, কাঁধ, গ্রীবা, উরু, জানু —
(অমর কবিতা)

প্রতীক ও চিত্রকল্প ব্যবহারে কবিতাকে তিনি অধিক অর্থদ্যুতি দিয়েছেন এভাবে —

১. কোটরে লুকিয়ে বৃষ্টি দেখি
আমি, দুপুর বারোটা আর তিনটি কবুতর।

২. এই শস্তা হোটেলের টালির উপরে নাচে তিনটি কবুতর।

উপমা ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ততা —

১. কবির সারাদিন গেছে কুকুরের মতো ব্যস্ততায়।

২. প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তুমি অন্ধ ট্যাক্সির মতন
জল ছিটিয়ে চলে গেলে;

পরিশেষে বলা যায়, প্রাকরণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রেখেও আবদুল মান্নান সৈয়দ বাক-বিভূতিতে স্বাদেশিক রীতির অনুসারী।

নির্মলেন্দু গুণ ষাটের দ্বিতীয় প্রজন্মের কবি। যিনি দেশ-চেতনা এবং আত্মগত প্রেমের অনুভবকে যুগপৎ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। এই সময়ে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যে বাঙালী জাতিসত্তা — তাঁরই নির্যাস ছেঁকে কবিতায় তুলে আনেন সামাজিক ও রাজনৈতিকবোধের নতুন মাত্রা। সারা দেশ যখন সংগ্রামে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে, গ্রামের মানুষ কবিকে জিজ্ঞেস করে ঢাকার খবর, আমাদের ভবিষ্যৎ কি?। আইয়ুব খান এখন কোথায়? — তখনো নির্মলেন্দু গুণের উচ্চারণ দ্বিধাগ্রস্ত :

আমি কিছুই বলবো না, আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকা
সারি সারি চোখের ভিতরে
উৎকণ্ঠিত চোখে নামবে কালো অন্ধকার,
আমি চিৎকার করে কণ্ঠ থেকে অক্ষম বাসনার
জ্বালা মুছে নিয়ে বলবো
এ সবের কিছুই জানি না,
আমি এসবের কিছুই বুঝি না।

---

১ আবদুল হাফিজ, আধুনিক সাহিত্য: বিবেচনসমূহ, ১৯৮২, পৃ: ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

যদিও আমাদের আলোচ্য পর্বে গুণের প্রথম গ্রন্থটি মাত্রই প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন স্বদেশ, স্বদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বৈষম্য, শোষণ-শাসন, জীবনের ব্যর্থতা, পরাজয় প্রভৃতি এ কাব্যের উপজীব্য হলেও এই পর্বে গুণের প্রেমিক সত্তাও মুখ্য হয়ে উঠেছে। রাজনীতির মুখর বাচনভঙ্গি আয়ত্ত করলেও তিনি রাজনীতির জন্য রাজনৈতিক কবিতা খুব বেশি লেখেননি। রাজনীতি উপলক্ষ মাত্র, প্রেমিকাকে কাছে পাওয়ার আর্তিই প্রবল হয়ে ওঠে —

তুমি বললে রাজপথ মুক্তি এনে দেবে —
আমরা ভীষণ দুঃখী, নিপীড়িত শত অত্যাচারে
'গীতাঞ্জলি' অকর্মণ্য হবে।
আমরা তাই রঙিন প্ল্যাকার্ড
সাজিয়েছি মাও-সে-তুং, গোর্কি, নজরুল।
তুমি বললে প্রেম হবে প্রেমের ভুবন যদি আসে
বুকের কুসুম থেকে দেবে শব্দাবলী।
কবিতার বিমূর্ত চন্দন আমি তাই
যে কোনো কঠিন মূল্যে প্রেমের ভুবনখানি চাই।
(জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ)

মানোহরণের স্বভাবদক্ষতার সঙ্গে রোমান্টিক আবেগময়তাকে মিলিয়ে তিনি একটি হার্দ্য কবিতাভঙ্গি তৈরি করেন যার সঙ্গে স্বভাবকবির মিল রয়েছে। বস্তুত, গুণ স্বয়ং 'নির্বাচিতা'র মুখবন্ধে সরল স্বীকারোক্তিতে অপরাঙ্মুখ : "আমার যা বলবার, স্পষ্ট করেই আমি তা বলবার চেষ্টা করি; যা কঠিন আমার মন তাতে সহজে সাড়া দেয় না। সহজ করে পাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। চারপাশের কঠিনের ভিড়ে আমি চাই সহজ করে বলতে। জানি এ স্বভাব নাগরিক কবির নয়, লোককবির। ময়মনসিংহ গীতিকার কবিদের মধ্যে আমার জন্ম"।[১] লোককবির হৃদস্পন্দন গুণের কবিতার বৈশিষ্ট্য হলেও পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর দীপ্র সংগ্রামশীলতা। "তাঁর কবিতা রঙিন চটকদার আবেগে চিত্রিত, কিন্তু শৈল্পিক চাতুর্যের গহীন সুতোর এমব্রয়ডারির সাজ সেখানে দুর্লক্ষ্য। কাব্যভাষায় কোনোরকম নতুনত্ব তিনি সৃষ্টি করেননি; বস্তুত পঞ্চাশ, ষাটের চলতি প্রকাশভঙ্গির সাথে মুখরতার বাকবিভূতি মিশিয়ে তৈরি হয় তাঁর কবিতার আকর্ষণ। নির্মলেন্দু গুণের কবিতার ভেতর-বাহির বলে কিছু নেই; পুরোটাই বৈঠকখানা, সবটুকু প্রথম দৃষ্টিতেই দৃশ্যমান ও বোধ্য। অবচেতনের কারবারি নন গুণ, ধরা অধরার রৌদ্র-ছায়ার জগৎ সৃষ্টি করেন না তিনি; তাঁর কবিতা কোনো বোধ নির্মাণ করে না শেষ পর্যন্ত।[২]

বলাবাহুল্য, ধরা-অধরার রৌদ্র-ছায়ার জগৎ সৃষ্টি না করেও যারা কবি — নির্মলেন্দু গুণ সেই দলের অন্যতম কবি। কবিতায় সহজবোধ্যতার যে আবেদন, তাঁর প্রেমিকসত্তার বৈচিত্র্যময় যে রূপায়ণ, সংস্কারমুক্ত জীবন-ভাবনার নানাদিক — সর্বোপরি রাজনৈতিক-সামাজিক-ঘটনা-সংঘটনের প্রতি তাঁর যে আন্তরিকতা তারই প্রতিফলনে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতাবলি।

---

১. নির্মলেন্দু গুণ, নির্বাচিতা, মুখবন্ধ, পৃ: ৪
২. খো. আ. হো., বাংলাদেশের কবিতা, পৃ: ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

নির্মলেন্দু গুণের সমসাময়িক কবি মহাদেব সাহা, আবুল হাসান এবং হুমায়ুন কবিরের কবিতা আলোচ্য পর্বে গ্রন্থিত না হলেও এই ত্রয়ীর কবিসত্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত হয়ে ওঠে এই সময় পর্বেই। আত্ম- সংকটে জর্জরিত হয়েও সমকালীন পরিবেশ, নিসর্গ, দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় মহাদেব সাহার কবিতায় উপজীব্য হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি আবুল হাসানের কবিতা অবক্ষয় এবং জীবনাসক্তির টানাপোড়েনে তীব্র রক্তিম। সমকালের সংকট, বৈরী পরিপার্শ্ব, ব্যক্তিগত সংকট এই কবিকে গ্রাস করলেও জন্মভূমি ও জনতার সঙ্গে সংলগ্ন থাকবার আর্তি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায় —

গোলাপ ফুটছে তাও রাজনীতি, গোলাপ ঝরছে তাও রাজনীতি
মানুষ জন্মাচ্ছে তাও রাজনীতি, মানুষ মরছে তাও রাজনীতি।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ গভীরভাবে প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে হুমায়ুন কবিরের কবিতায়। দেশকালগত সংকটে গভীরভাবে বিপর্যস্ত এই কবি চেয়েছেন বিপর্যয়ের সঙ্গে বিমুগ্ধতার সমন্বয়; 'কুসুমের সঙ্গে ইস্পাতের মিলন'। সংগ্রামকে সৌন্দর্যে এবং সুন্দরকে সংঘাতে পরিণত করে তুলেছেন তিনি। সমকালীন সমাজ, জীবন-যাপনের প্রায় সকল অনুষঙ্গেই লক্ষ্য করা যাবে সুন্দর ও সংঘাতের এই সমন্বয়।

ফুলের আড়াল থেকে মানুষের বন্দুক
জনসমাগমকে ভাই ডেকে গর্জে ওঠে।

বলাবাহুল্য, এই পর্বের কবিতায় বিষয়ের যেমন বৈচিত্র্য লক্ষণীয় তেমনি ভাষা হয়ে উঠেছে অধিকতর জীবনসম্পৃক্ত ও প্রত্যক্ষধর্মী। দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত শব্দ মুখের ভাষা বা বাকভঙ্গিকে গ্রহণ করে এই পর্বের কবিকুল বিষয়বস্তুতে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন নিরাভরণ সৌন্দর্য। ছন্দের ক্ষেত্রেও অক্ষরবৃত্ত বা গদ্য ছন্দ ব্যবহৃত হওয়ায় তাঁদের কবিতা হয়ে উঠেছে আরো স্পর্শগ্রাহ্য, বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশের ধারায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ — এই সময়পর্বে রচিত বাংলাদেশের কবিদের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ-সচেতনতার বোধ কী ভাবে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে — এই আলোচনায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে সেই সময়-পরিসরে সংঘটিত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ। এই সূত্রে আলোচ্য সময়পর্বে রচিত বিভিন্ন কবির কবিতাবলির বিষয়বস্তু ও প্রকরণশৈলী বিশ্লেষণ করে আমরা এই ধারার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছি।

আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গে প্রথমেই বিভাগোত্তর পূর্ববাঙলার কবি-শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই শতকের গোড়ার দিকে বিভাগ-পূর্ব বাংলার যে মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের উন্মেষ, জীবনে ও শিল্পে তার সামষ্টিক অভিযাত্রা শুরু হয় ১৯৪৭-এর পরে — তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তথা বর্তমান বাংলাদেশে। একথা মানতেই হয় যে, উনিশ শতকে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন ঘটে, তার স্থপতি প্রধানত নবজাগ্রত হিন্দু-মধ্যবিত্ত। সে কারণে গোটা উনিশ শতকে কায়কোবাদ এবং মীর মশারফ হোসেন ছাড়া আর কারো সাক্ষাৎ মেলে না। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কাজী নজরুল ইসলাম এবং জসীম উদ্‌দীনের মতো প্রতিভাবান কবির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণ যতোই স্পষ্ট হয়েছে, ততোই নানা কর্মকাণ্ডে তাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে। শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, আবদুল কাদির, সুফিয়া কামাল থেকে ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন পর্যন্ত কবিকর্মীরা এই শতকের পঞ্চাশের দশকের ভেতরেই প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু একথা না মেনে উপায় নেই যে, ক্ষয়িষ্ণু ইংরেজ আমলের সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধা এই নতুন মধ্যবিত্তের চাহিদার তুলনায় ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে চিন্তা-চেতনায় একধরনের অগ্রসরতার ফলে মুসলমান মধ্যবিত্তের অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিকাশ ঘটলো বাংলাদেশে। বলা যায়, এদেশের সাহিত্য প্রধানত এই নতুন মধ্যবিত্ত সমাজেরই শৈল্পিক অভিব্যক্তি। বস্তুত, বাংলাদেশের কবিতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস তাই বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজেরই বেড়ে-ওঠার ইতিহাস। তার আশা-আকাঙক্ষা, হতাশা-নৈরাশ্য, স্বপ্ন-সম্ভাবনা গত তিরিশ বছরের কবিতার বিষয়বস্তুতে এবং আঙ্গিক উপকরণে নানাভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, নজরুল ইসলামেই রচিত হয়েছিল বাঙালী-মুসলমানের প্রাথমিক কাব্যভাষা। নজরুল ইসলামের আগ পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল বাঙালী মুসলমান কবির হাতে অসাহিত্যিক ধর্মকেন্দ্রী কবিতার ধারা। নজরুলের বয়োজ্যেষ্ঠ দু'জন কবি, গোলাম মোস্তফা ও শাহাদৎ হোসেন, লিরিক কবিতার মূল সূত্রটি কিছুটা ধরতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের উচ্চারণে অন্বিষ্ট গাঢ়তা ছিল না যা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

বিশ শতকের চারটি দশক জুড়ে কবিতার একমাত্র কেন্দ্র ছিল কলকাতা। চল্লিশের দশকের শেষে দেশবিভাগের সঙ্গে-সঙ্গে ঢাকা হয়ে উঠলো বাংলা কবিতার নতুন কেন্দ্র। নজরুলের পুরো সৃষ্টিকাল কলকাতাতেই কেটেছে। তিরিশের ও চল্লিশের দশকের বাঙালী মুসলিম কবিদের প্রাথমিক প্রয়াস-ক্ষেত্র বা উন্মেষ-পর্ব কলকাতাতেই। দেশবিভাগের পরে ঢাকাকে কেন্দ্র করে এঁদের সাহিত্য বিকশিত হতে থাকে। পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা অবশ্য প্রথমাবধিই ঢাকাকেন্দ্রিক।

Dhaka University Institutional Repository

দেশবিভাগের পরে ঢাকায় যখন প্রথম কবিতার চর্চা শুরু হ'লো তখনো বিশের দশকের গোলাম মোস্তফা বেঁচে, কিন্তু কবি হিসেবে তখন তাঁর আর কোনো প্রভাব নেই; শাহাদৎ হোসেন ঢাকা-কলকাতা আসা-যাওয়া করছিলেন — কিন্তু তিনি পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পাননি, কলকাতার এক হাসপাতালে নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন; কায়কোবাদ যদিও তখনো বেঁচে — কিন্তু অশীতিপর ঐ বৃদ্ধ কবি কোনো শৈল্পিক প্রভাববলয় তৈরি করতে পারেননি। বাংলাদেশের কবিতা তাই শুরু করতে হয় নজরুলোত্তর কবিদের আলোচনায়।

নজরুল তাঁর পরবর্তী যে দুই কবিকে কাব্য-ক্ষেত্রে মৃদু স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তাদের একজন জসীম উদ্‌দীন, অপরজন আবদুল কাদির — বিপরীতমুখী এই দুই কবির কবিতায় নজরুল ইসলামের প্রত্যক্ষ কোন কাব্য-প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়নি। তবে একথা বলা যায় যে, জসীম উদ্‌দীনেই গ্রামীণ পটভূমিতে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের প্রকৃত ও সত্য চিত্র প্রথমবারের মতো প্রতিফলিত হয়। এই পর্যায়ে জসীম উদ্‌দীন, বন্দে আলী মিয়া, রওশন ইজদানী লোককবির উপাদানকে ব্যাপকভাবে তাঁদের কাব্যে ব্যবহার করলেও 'লোককবি' বলা যায় না এঁদের কারুকেই। তবে গ্রামকেও এঁরা সমসাময়িক জীবনানন্দ দাশের মতো আধুনিক মানসতার অংশী করে নিতে পারেননি। সেই হিসাবে এঁরা সত্যিকার লোককবি ও জীবনানন্দ দাশের মাঝামাঝি অবস্থার কবি। এঁদের কবিতায় আছে একধরনের পরিমার্জিত গ্রামীণ পটভূমি। এঁদের বিশেষত্ব গাথাকবিতা রচনায়; সারা মধ্যযুগ ধরে বাঙলা সাহিত্যে যে গাথাকবিতা চলে আসছিল এঁরা তারই কাতারে সমবেত হয়েছিলেন। লোক-কবিতার ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাংলাদেশই ছিলো এই ধারার কবিতা রচনার উৎস ও পটভূমি। জসীম উদ্‌দীন স্বয়ং 'ময়মনসিংহ গীতিকা' থেকে প্রভূত পরিমাণে কাব্য-উপাদান গ্রহণ করেছেন। তবে একথা বলা যায় যে, জসীমউদ্‌দীন নন বন্দে আলী মিয়াই এই পরিমার্জিত গ্রামীণ গাথা-কবিতার সূত্রধারক। তাই বলে জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্ব এতে বিন্দুমাত্র কমে না। তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব আধুনিকতার প্রায় বিপরীতে দাঁড়িয়ে চিরকালীন বাংলার গ্রামকে সাহিত্যে জায়গা করে দিয়েছে। জসীমউদ্‌দীন সত্তর দশক পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। এবং তাঁর ধারাটিও অবলুপ্ত হয়ে যায়নি : পঞ্চাশের দশকের দু'তিনজন কবি আবদুল হাই মাশরেকী, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী প্রমুখ অনেক সময় ঐ গ্রামীণ সারল্যে নিজেদের সমর্পণ করেছেন; পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্য একজন কবি, আল মাহমুদও, এক হিসেবে এই ধারারই উত্তরাধিকার — বলা যায়, জীবনানন্দ দাশ ও জসীমউদ্‌দীনের প্রধান প্রবণতাকে ধারণ করেই সমৃদ্ধ করেছেন তার কাব্যভুবন। জসীমউদ্‌দীনের বিপরীত মেরুর কবি আবদুল কাদির : লিরিক কবিতাতেই তাঁর উদ্দিষ্ট ছিলো গভীর ধ্বনিময়তা। কাব্যভাষা ও বিষয়ে তিনি মোহিতলাল মজুমদার ও শাহাদৎ হোসেনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

তিরিশের কবিদের তৃতীয় ক্ষীণ একটি ধারা — জাগরণমূলক কবিতা; বাংলা কবিতার ইতিহাসে চল্লিশের কবিদের পূর্বজ এই কবিদেরকে তেমনভাবে চিহ্নিত করা যায়নি একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া। বেনজীর আহমদ, মহীউদ্দীন, মঈনুদ্দীন (খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন) এঁরা নজরুলের বিপ্লব ও জাগরণ-প্রধান কবিতার ধারাটি তুলে নিয়েছিলেন। এই কবিরা ছিলেন নজরুল ও চল্লিশের কবিদের মধ্যবর্তী অসফল সেতু।

Dhaka University Institutional Repository

তিরিশের কবিদের চতুর্থ ধারাটি লিরিক কবিতার; বেগম সুফিয়া কামালের কবিতায় নারী-সত্তার নিবিড় প্রকাশ একসময় রবীন্দ্রনাথ-নজরুলকেও মুগ্ধ করেছিল। কাদের নওয়াজের কবিতায় লিরিক কবিতার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক কবিতার সূচনা হয়েছিল তিরিশের কয়েকজন কবির হাতে। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবি আধুনিক কবিতার আয়তন নির্মাণ করেছিলেন। এঁদের সমসাময়িক হয়েও বাংলাদেশের তিরিশের কবিরা ঠিক আধুনিক হতে পারেননি। তিরিশ-বাহিত যে আধুনিকতা তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে চল্লিশের কবিদের উত্থান অবধি।

বাংলাদেশের চল্লিশের কবিরাই প্রথম আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত করলেন নিজেদের: এঁরা হলেন আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন, সানাউল হক এবং সিকান্দার আবু জাফর।

চল্লিশের দশকে সারা পৃথিবী, এবং বাংলাদেশ, ছিল উত্তাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ — এসবের ঢেউ একের এক আছড়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে ছিল নিপীড়িত মানুষের উত্থান, বাঙালী-মুসলমানের উত্থান — চল্লিশের এই কবিদের সমাজমুখী ও আত্মসচেতন করেছিল। সমাজতান্ত্রিক কবিতার ধারা এই সময়েই মোহানায় প্রবেশ করেছিল — ফলে অনেক কবি বেরিয়ে এসেছিলেন।

চল্লিশের দশকেই বিভাগোত্তর বাঙলা কবিতা স্পষ্টত দু'টি ধারায় বিকশিত হ'তে থাকে। প্রথম ধারাটি সমাজসচেতন মানবিকতাবাদী প্রগতিশীল ধারা। এই ধারার আলোচ্য কবি আহসান হাবীবের কবিতায় সমাজ ও ব্যক্তি একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিশেছে। প্রথম দিকের বক্তব্য-প্রধান কবিতার পর ক্রমশ তিনি কিছুটা দার্শনিকতায় আক্রান্ত হয়েছেন; কিন্তু সমাজ-চেতনা তাঁকে কোনো সময়ই একেবারে ছেড়ে যায়নি। এই ধারার কবিদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট ও সোচ্চার সিকান্দার আবু জাফর। সমাজের বিভিন্ন আলোড়ন-সংকট-সংক্ষোভ তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে স্পষ্ট বক্তব্যে। নানা ছন্দে লিখেছেন তিনি। সানাউল হক প্রথম থেকেই সমাজ-সচেতন। তাঁর আঙ্গিক-সচেতনতা অনেক প্রখর। তবে এই আঙ্গিক-সচেতনতা বহিরাবরণেই ব্যয়িত, তা তাঁর কবিতার কোনো উৎকর্ষ সাধন করেনি। আবুল হোসেনের কবিতার প্রধান চারিত্র্য-লক্ষণ বাকসংযম। উচ্ছ্বাস, আবেগ, কল্পনা — এইসব অর্থাৎ তথাকথিত কবিত্ব বর্জনেই তাঁর কবিসত্তার প্রকাশ। সমাজ-মানসকে আমূল গ্রহণ করেই তাঁর কবিতার আধুনিকতা।

চল্লিশের কবিতার দ্বিতীয় ধারাটি ইসলাম-চেতন কবিতার ধারা। ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসানের প্রথম পর্যায়, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আশরাফ প্রমুখ এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। এই ধারা সৃষ্টি হয়েছে নজরুলের ইসলামচেতন কবিতা থেকে। এঁদের অনেকেই কবি মুহম্মদ ইকবালকে আদর্শ হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। এই ধারার কবিতার অন্যতম উৎস ছিলো পুথিসাহিত্য ও ইসলামী পুরাণ। বাঙালী মুসলমানের পুনর্জাগরণকে এঁরা অনেকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা সাহিত্যিক মূল্যায়নে শেষাবধি টিকতে পারেননি। তবে সৈয়দ আলী আহসান প্রথম গ্রন্থ 'চাহার দরবেশ' প্রকাশের অনতিকাল পরেই ইসলাম-চেতন কবিতার বলয় ছেড়ে অন্য বলয়ে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর শুরু হয়েছিল ইসলামচেতন কবিতায় শেষ হয়েছে ব্যক্তিগত

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণে। পাশাপাশি ফররুখ আহমদ ক্রমশ ইসলামচেতন কবিতার ধারাটিকে করেছেন অনুসরণ। ইসলামী পুরাণের খন্ড ব্যবহার করেননি ফররুখ, করেছেন মাইকেলের অনুসরণে পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ। তাঁর প্রকরণ ব্যবহারও বিচিত্র; তিনি লিখেছেন অজস্র লিরিকের সঙ্গে-সঙ্গে বেশ কিছু দীর্ঘ কবিতা; সনেট লিখেছেন, লিখেছেন মহাকাব্য, আর কিছু গদ্যকবিতা ও কাব্যনাট্য। নিঃসন্দেহে এই ধারার সবচেয়ে শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদ।

বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তাৎপর্যময় দশক হচ্ছে এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক। এই দশকে সাহিত্যের অন্য শাখাগুলিতে তো বটেই, প্রধান ঢলটি নেমেছিল সৃষ্টিশীল কবিতায়। বেরিয়ে এসেছিলেন বেশ কয়েকজন নতুন কবি। তিরিশের ও চল্লিশের কবিরাও সামিল হয়েছিলেন পঞ্চাশে। ঢাকায় বাঙলা সাহিত্যের নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল সেদিন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার জন্যে যে তরুণরা রক্ত ঝরিয়েছিল রাজপথে — তা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের ধমনীতে নিত্য সক্রিয় রয়েছে। এই ঘটনা বাংলা কবিতার প্রগতিশীল ধারাটিকে একদিকে যেমন প্রাণবন্ত ও উন্মুখ করে তোলে তেমনি ইসলামচেতন ধারাটিকে ম্রিয়মাণ ক'রে মানবিকতাবাদী ধারাটিকে আরো বেগবান করে তীব্র ভাবে। ভাষাগত সঙ্কটের কারণে আবহমান বাঙলা কবিতা তথা সাহিত্যের সঙ্গে যে বিচ্ছেদের ক্ষণিক আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল, এই ঘটনায় মুহূর্তে তা কেটে গেল। পঞ্চাশের কবিতা নতুন করে যুক্ত হলো আবহমান বাংলা কবিতার সঙ্গে।

আমাদের আলোচ্য পঞ্চাশের প্রথম পর্যায়ের কবি আবদুল গনি হাজারী, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, আতাউর রহমান, মযহারুল ইসলাম, আবদুস সাত্তার, জাহানারা আরজু, প্রমুখকে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধরা যেতে পারে শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আজীজুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আবুবকর সিদ্দিক, আল মাহমুদ, জিয়া হায়দার, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, দিলওয়ার, ওমর আলী, শহীদ কাদরী প্রমুখকে।

আমাদের আলোচ্য পর্বের সময়-পরিসরে তাঁদের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশ ও সমকাল-সংলগ্নতা পঞ্চাশের প্রথম পর্যায়ের কবিদের অনেকেরই ছিল অন্যতম প্রধান চারিত্র্য লক্ষণ — নারী বা নিসর্গ এঁদের তেমন উদ্বুদ্ধ করেনি। ফলে এঁদের অনেকেই মূলত বাস্তববাদী। আবদুল গনি হাজারীর প্রধান মাধ্যম গদ্যকবিতা, আর আতাউর রহমানের মুখ্য বাহন আঠারো মাত্রার পয়ার — কিন্তু দু'জনের কবিতাতেই কল্পনার চেয়ে বেশি কাজ করেছে সমকালীন বাস্তবতা। আশরাফ সিদ্দিকীর ছন্দোরণন সেদিন অনেকের কানেই বেজে উঠেছিল, কিন্তু উত্তরকালে তিনি তাঁর পথ থেকে সরে গিয়ে লোকসাহিত্যের গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আবদুর রশীদ খান আবেগশাসিত হয়ে কিছু উজ্জ্বল কাব্য-পঙক্তির জন্ম দিয়েছিলেন।

পঞ্চাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিরা অনেক বেশি রোম্যান্টিক ও আধুনিক। তিরিশের দু'জন রোম্যান্টিক কবি, জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসু, এঁদের প্রেরণাউদ্বেল করেছে। তবে একথা বলা যায়, জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব থেকে প্রাথমিক পরিগ্রহণ করলেও এঁদের প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছিলেন। শামসুর রাহমান প্রথম দিকে ছিলেন রোম্যান্টিক — নারী ও নিসর্গে নিবেদিত, শব্দে ও ছন্দে ঝংকৃত, জীবনানন্দে নিমজ্জিত। দ্বিতীয় গ্রন্থেই শামসুর রাহমান ঐ রোম্যান্টিক অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে দেশ-কাল-সমাজের দিকে যাত্রা করেছেন। আল মাহমুদও প্রথমদিকে নারী ও নিসর্গে নিবেদিত হলেও তাঁর গ্রামীণতার সঙ্গে আধুনিক মানসতার সমীকরণ সাধিত হয়েছে। প্রকরণে কোনো পরীক্ষা বা অভিনবত্ব নেই, অনেকখানিই প্রচলনির্ভর কিন্তু তার মধ্যেই আল মাহমুদের কণ্ঠে কিছুটা ধ্বনিত হয়েছে সমকালীন সমাজের নানা সমস্যা। তাঁর শক্তি অনেকখানিই তাঁর গ্রামীণ আন্তরিকতায়।

আধুনিক নাগরিক-মনস্কতা এবং তার যাবতীয় উপকরণ, দ্বন্দ্ব ও উল্লাস নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে শহীদ কাদরীর কবিতায়। আধুনিক শহর — তার যন্ত্রণা ও আনন্দ — শহীদের রক্তে মিশে আছে। সৈয়দ শামসুল হক পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে পরীক্ষাপ্রবণ — লিরিক কবিতা, কাব্যনাট্য, গদ্যকবিতা থেকে দীর্ঘ কবিতা যা-কিছুই তিনি লিখেছেন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমকালীন সমাজ ও স্বদেশের আকৃতি বা আর্তি প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে সেখানে। ফজল শাহবুদ্দীনের কবিতা নারী ও প্রকৃতির যৌথ উপচারে সাজালেও অন্যদের তুলনায় তাঁর কবিতার শরীরী সংক্রাম তীব্রতর, প্রেম ও শরীর তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের উচ্চারণে তাঁর ব্যক্তিগত পৃথিবী, সমাজ ও পারিপার্শ্ব রূপ পেয়েছে। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ মূলত লিখেছেন সনেট — তাঁর একটি বিশিষ্ট চেষ্টা পুথির নতুন রূপায়ণে। প্রতিবিম্বিত দৃষ্টির প্রয়োগে ওমর আলীর কবিতা স্বতন্ত্র এক ভূমিকা পালন করেছে। আজীজুল হকের কবিতায় সংরক্ত ব্যক্তিবিশ্ব উপস্থিত হয়েছে তাঁর শব্দ প্রয়োগে। দিলওয়ারের কবিতায় সমাজ-সচেতনতার উপস্থিতি সবসময়েই ছিল বর্তমান।

পঞ্চাশের আলোচ্য কবিদের হাতে আধুনিক কবিতার বিষয় কিছুটা পূর্ণতা পেয়েছিল। ষাটের কবিদের সমস্যা হলো পৃথক হওয়ার সমস্যা — ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত পৃথক হওয়ার সমস্যা। সমবেত ভাবে ষাটের কবিরা আলাদা একটি আয়তন রচনা করেছিলেন। আত্যন্তিক যৌনতা, নৈরাশ্য, বিবমিষা, অবিশ্বাস ইত্যাদি ছেঁকে তুলে আনলেন এঁরা কবিতায়। যৌনগ্রসঙ্গ তাঁদের আগে এতোটা অকপটে প্রকাশ পায়নি। এ-ও এক বিদ্রোহ। প্রকরণেও দেখা দিলো বীজময় বিদ্রোহ। পঞ্চাশের সমাজ-চেতনার অতি ব্যবহারের পরে এঁরা হয়ে উঠেছিলেন ব্যক্তিগত, সচেতনভাবে শিল্পিত। তৎকালীন তারুণ্য এবং যুগের অস্থিরতা এঁদের কণ্ঠেই ভাষা পেয়েছিল। তাছাড়া সারা বিশ্বে ষাটের এই সময়েই ঘটেছিল তারুণ্যের বিস্ময়কর উত্থান। সর্বক্ষেত্রেই।

আমরা যদি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির দিকে দৃষ্টি ফেরাই তাহলে ষাটের দশকের কবিদের কাব্যিক আয়তনের প্রসারতা বা শৈল্পিক বিদ্রোহ দু'টোই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯৫৮ সালের শেষভাগে পাকিস্তানব্যাপী যখন সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে জেনারেল আইয়ুব সামরিক শাসন জারী করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। ১৯৬২ সালে রাজনীতি আবার এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। এই বছরেই একদিকে মৌলিক গণতন্ত্রী-শাসন প্রবর্তিত হয় — অন্যদিকে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রথমটির তাৎপর্য বুঝে উঠতে মধ্যবিত্তের কিছুটা বা সময় লেগেছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে সংঘবদ্ধ হয় তার মুখে আইয়ুব খান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল ঘোষিত হয়। এই বিজয়ে দেশের প্রগতিশীল যুবশক্তি নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে নতুন প্রত্যয় অর্জন করেছিল সন্দেহ নেই। ১৯৬২ সালের এই জাগরণ বৃথা যায়নি। নতুন আবেগের সঞ্চারে পুরোনো খাতে যেন প্রাণের জোয়ার বইলো। আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ এই সময়েই সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। এঁরা শিক্ষাকমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে জড়িতও

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। এঁদের অপর সহযোগী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। লক্ষণীয় যে, এঁরা সবাই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন ছাত্র। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে দেশে যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বীভৎস চেহারা ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে। ১৯৪৭ সালে যে মধ্যবিত্ত প্রধানত আর্থিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের আকাঙক্ষায় দৃপ্ত, ১৯৬৫ সালে এসে অধিকার পদদলিত, অর্থনৈতিক বিকাশ বিড়ম্বিত অথচ অন্তর্কলহে বিপর্যস্ত এই সমাজ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। এই পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী প্রভাব এই সময়ের কবিকর্মেও দুর্লক্ষ্য নয়। 'স্বাক্ষর' অথবা 'কণ্ঠস্বর' কবিগোষ্ঠির নতুন কবিকর্মীরা অতীতের দায়মুক্ত, তাঁদের বর্তমান সংকটসংকুল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অতএব তাঁদের কবিভাষায় এলো দুঃসাহসী এক প্রবণতা — যেহেতু সমস্ত গন্তব্যেই নিষেধের সর্তক সংকেত; অতএব ফেনিল হয়ে উঠলো যৌনতা। কেউ কেউ আবার বিমুখ বাস্তবের সান্নিধ্য বর্জন করে আশ্রয় নিলেন পরাবাস্তবে। রূপক ও প্রতীক ব্যবহার, অতএব, এঁদের জন্যে অনিবার্য হয়ে উঠলো। এই সময়ে পঞ্চাশের কবিদের কবিতার বিষয় ও ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটতে থাকলো। উপর্য্যুপরি রাজনৈতিক নৈরাজ্যের ফলে সমাজজীবনে যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয় — সঙ্গত কারণেই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিদের কবিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই সূত্রে দেশাত্মবোধের এক নতুন মাত্রা যুক্ত হলো। কখনো একটি সমগ্র কবিতায়, কখনো একটি উপমায়, কখনো বা একটি পঙক্তিতে তার উজ্জ্বল বিচ্ছুরণ ঘটে যায়। আত্মপ্রকাশের অনুকূল পরিবেশের অভাবে সমাজের অন্তঃস্থলে যে বেদনা দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত হয়েছিল, ক্রমশ সঙ্কেতে, শব্দে, উল্লেখ, তার উৎসারণ এইসব কবিতার স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। দেশাত্মবোধ-চেতনাকে মেধায় ও মননে জারিত করেই ষাটের কবিরা আলাদা একটি আয়তন রচনা করেছিলেন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অন্তরঙ্গ দেশপ্রেম অনেকগুলি কবিতায় খচিত হয়েছে। রফিক আজাদ প্রথমে ছিলেন শুদ্ধশিল্পে নিবেদিতপ্রাণ আত্মকেন্দ্রিক, ক্রমশ সামাজিক এবং দৈশিক ও বিশ্বচেতন। আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রকরণগত নিষ্ঠার সঙ্গে মিলিয়ে দেন তাঁর পরাবাস্তববাদী চেতনালোক। আসাদ চৌধুরীর প্রাথমিক কবিতায় দেশজতা রূপ পেয়েছিল ছড়ার আদলে, গজলের মোহনীয়তায়। মোহাম্মদ রফিক প্রথম পর্যায়ে লিখতেন গার্হস্থ্য কবিতা, পরে গ্রামীণ বাংলাদেশ। আফজাল চৌধুরীর কবিতা শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্রে — শেষ হয়েছে ইসলাম-চেতনায়। অরুণাভ সরকারের লিরিক প্রথম থেকেই তাঁর নিজের জিনিষ।

ষাটের দশকের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিদের মধ্যে অকালমৃত দু'জন আবুল হাসান ও হুমায়ুন কবির, অনেক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন। আবুল হাসানের শেষ কবিতাগুচ্ছে শিল্পময় গভীরতা দেখা গিয়েছিল। সাযযাদ কাদির কবিতার ভাষাকে আত্মকীয় করে অন্য এক জগতে পৌঁছতে চান। রাজীব আহসান চৌধুরীর কবিতায় একসময় ঝলক দিয়ে উঠেছিল প্রকৃত কবিতার বিদ্যুৎ। আবু কায়সার সপ্রতিভার আড়ালে পরীক্ষা-সমীক্ষা করেছেন নানারকম। নির্মলেন্দু গুণ প্রথম জীবনে বিপ্লবের বন্দনা করে ক্রমশ ঝুঁকেছেন লিরিকে — কিন্তু রাজনীতি তাঁকে কখনো ছেড়ে যায়নি। মুহম্মদ নূরুল হুদা কিছুদিন অনুপ্রাস-পাশে বাঁধা পড়েছিলেন — সম্প্রতি পুরাণের পুনর্ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষারত। রাজনীতি ও স্বপ্নকে সফলভাবে মিশিয়েছিলেন মাশুক চৌধুরী। ফরহাদ মজহার কবিতার সঙ্গে মিলিয়েছেন বিজ্ঞান, ইদানীং ধর্ম। হেলাল হাফিজ লিরিকের তানে বাজিয়েছেন সমাজ ও স্বদেশের সঙ্গীত। বেলাল চৌধুরীর গদ্যাত্মক কবিতায় মিশেছে ব্যক্তিগত ফূর্তির রেশ। সুরাইয়া খানমের কবিতায় নারী-কমনীয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাহসী চিন্তার চয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

বলা বাহুল্য, ষাটের দশকে অনেক সম্ভাবনাময় কবির উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটেছে। সম্ভবত বাংলাদেশের কবিতায় এঁরাই ঘটিয়েছিলেন সফল কাব্যিক বিপ্লব। যা পরবর্তীকালে তাঁদের অগ্রজ পঞ্চাশের দশকের কবিদেরও প্রভাবিত করেছিলো। আমাদের আলোচ্য সময়-পরিধিতে যেহেতু এঁদের অনেকেরই কবিতা গ্রন্থভুক্ত হয়নি; সঙ্গত কারণেই এই দশকের অনেকানেক গুরুত্বপূর্ণ কবিই ব্যাপক আলোচনার বাইরে রয়ে গেলেন।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পরিশেষে বলা যায়, বিভাগোত্তর বাঙলা কবিতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস — এই সমাজেরই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেড়ে-ওঠার ইতিহাস। তাঁর আশা-আকাঙক্ষা, হতাশা-নৈরাজ্য, স্বপ্ন-সম্ভাবনা-সংগ্রাম-বিক্ষোভ গত কয়েক বছরের কবিতায় ভাবে, উপমায়, প্রতীকে, রূপকে, শব্দে, সঙ্কেতে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকাংশ কবি এই দেশের গ্রামীণ সমাজ থেকে উঠে এসেছেন শহরে। এঁদের শৈশব-কৈশোর কেটেছে গ্রামীণ সমাজ-পটভূমিতে। যৌবন কেটেছে নগরে। নগরজীবনের ক্লেদ-ঘৃণা-বিক্ষোভ, সর্বোপরি স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে ধারণ করে স্বদেশ, সমাজ ও সমাজের মানুষকে যে যেভাবে দেখেছেন — বলা যায়, তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কবিতায়। ফলে এই কাল-পরিসরে রচিত কবিতাবলি হয়ে উঠেছে এই সমাজেরই অবিকল দর্পণ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১ মৌলিক গ্রন্থ

১ আজীজুল হক

১. *ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৯।

২. *বিনষ্টের চীৎকার*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬।

৩. *আজীজুল হকের কবিতা*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪।

২ আতাউর রহমান

১. *দুই ঋতু*, প্রকাশক : আবদুল হাফিজ, বগুড়া, ১৯৫৬।

২. *একদিন প্রতিদিন*, সাহিত্য মঞ্জিল, ঢাকা, ১৯৬৫।

আবদুর রশীদ খান

১. *নক্ষত্র : মানুষ: মন*, প্রকাশক : মোহাম্মদ মামুন, ঢাকা, ১৯৫১।

২. *বন্দী মুহূর্ত*, এশিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৫২।

৩. *বিম্বিত প্রহর*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮।

৪. *অন্বিষ্ট স্বদেশ*, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৭০।

৫. *মহুয়া*, ফেভারিট বুকস্, ঢাকা, ১৯৬৫।

আবদুল গনি হাজারী

১. *সামান্য ধন*, রিপাবলিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৫৬।

২. *সূর্যের সিঁড়ি*, সুপ্রকাশ গ্রন্থ, ঢাক, ১৯৬৫।

৩. *জাগ্রত প্রদীপে*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭০।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

১. *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*, ধ্রুপদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৭।

২. *জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা*, ধ্রুপদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৯।

৩. *মাতাল মানচিত্র*, শিল্পকলা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০।

আবদুস সাত্তার

১. *বৃষ্টি মুখর*, , প্রকাশক : (ফাতেমা সাত্তার) টাঙ্গাইল, ১৯৫৯।

২. *আমার ঘর নিজের বাড়ী*, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৭০।

৩. *অন্তরঙ্গ ধ্বনি*, সাকীব ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭১।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

১. *সাতনরী হার*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৫৩।

২. *কখনো রং কখনো সুর*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository

আবু বকর সিদ্দিক

১. *ধবল দুধের স্বরগ্রাম*, সাহিত্য শিল্প, ঢাকা, ১৯৬৯।

আবুল হোসেন

১. *নববসন্ত* , প্রথম প্রকাশ : ১৯৪০; দ্বিতীয় মুদ্রণ : মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭।

২. *বিরস সংলাপ* , প্রথম প্রকাশ : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯।

আল মাহমুদ

১. *লোক লোকান্তর*, কপোতাক্ষ, ঢাকা, ১৯৬৩।

২. *কালের কলস*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫।

৩. *আল মাহমুদের কবিতা*, সিগনেট বুকশপ, কলিকাতা, ১৯৭১।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

১. *মানচিত্র*, সাহিত্যভবন, ঢাকা, ১৯৬১।

২. *ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ*, সাহিত্যভবন, ঢাকা, ১৯৬২।

৩. *সূর্য জ্বালার সোপান*, পায়াবত প্রকাশনী, ঢাকা।

আশরাফ সিদ্দিকী

১. *তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা*, কিতাবমঞ্জিল, ঢাকা, ১৯৫০।

২. *সাত ভাই চম্পা*, সবুজ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৫।

৩. *বিষকন্যা, প্রকাশক :* সাইদা সিদ্দিকী, ঢাকা, ১৯৫৫।

৪. *উত্তর আকাশের তারা*, সবুজ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৮।

৫. *নতুন কবিতা*, সম্পাদিত, ঢাকা, ১৩৫৬।

আহসান হাবীব

১. *রাত্রিশেষ* , প্রথম প্রকাশ : কমরেড পাবলিশার্স, কলকাতা । দ্বিতীয় মুদ্রণ : ইনল্যান্ড প্রেস, ১৯৫৫, ঢাকা। তৃতীয় মুদ্রণ : মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০।

২. *ছায়াহরিণ* , প্রথম প্রকাশ : কথাবিতান, ঢাকা, ১৯৬২। তৃতীয় মুদ্রণ : মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫।

৩. *সারাদুপুর* , প্রথম প্রকাশ : কথাবিতান, ঢাকা, ১৯৬৪। তৃতীয় মুদ্রণ : মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬।

ওমর আলী

১. *এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি*, কোহিনুর লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৬৭।

২. *অরণ্যে একটি লোক*, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া , ১৯৬৬।

৩. *আত্মার দিকে*, কুষ্টিয়া, ১৯৬৮।

জাহানারা আরজু

১. *নীলস্বপ*, কবিতাঙ্গন, ঢাকা, ১৯৬২।

২. *রৌদ্র ঝরা গান*, কবিতাঙ্গন, ঢাকা, ১৯৬৪।

৩. *শোনিভাক্ত আখর*, কবিতাঙ্গন, ঢাকা, ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

জিয়া হায়দার

১. *একতারাতে কান্না*, সপ্তক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৩।

২. *কৌটার ইচ্ছেগুলো*, সাইনিং বুক হাউজ এজেন্সী, ঢাকা, ১৯৬৯।

দিলওয়ার

১. *জিজ্ঞাসা*, ভার্থখলা, সিলেট, ১৯৫৩।

২. *ঐকতান*, কবি দিলওয়ার সংবর্ধনা কমিটি, সিলেট, ১৯৬৪।

৩. *উদ্‌ভিন্ন উল্লাস*, সুরভী প্রকাশনী, সিলেট, ১৯৬৯।

নির্মলেন্দু গুণ

১. *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০।

২. *কাব্য সমগ্র (১ম খন্ড)*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

ফজল শাহাবুদ্দীন

১. *তৃষ্ণার অগ্নিতে একা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৫।

২. *আকাংখিত অসুন্দর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯।

ফররুখ আহমদ

১. *সাতসাগরের মাঝি*, প্রথম মুদ্রণ : ১৯৪৪, কলকাতা। তমুদ্দন সংস্করণ, ১৯৫২,ঢাকা। অনুসরণ : ফররুখ রচনাবলী (১ম খন্ড) মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত বাংলা একাডেমীর পক্ষে আহমদ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৯।

২. আজাদ করো পাকিস্তান, প্রথম মুদ্রণ, মৃত্তিকা গ্রন্থনী বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। সম্ভবত ১৯৪০ /১৩৫৩ সালের প্রকাশনা।

৩. সিরাজুম মুনীরা , প্রথম মুদ্রণ : তমদ্দুন প্রেস, ঢাকা, ১৯৫২।

৪. নৌফেল ও হাতেম , (কাব্যনাটক) পাকিস্তান লেখক সংঘ, ১৯৬১, ঢাকা । চতুর্থ মুদ্রণ : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮।

৫. মুহূর্তের কবিতা, প্রথম প্রকাশ : বার্ডস এন্ড বুকস, ১৯৬৩, ঢাকা। পরিমার্জিত দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৭৮, সম্পাদক, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।

৬. হাতেম তায়ী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭৩।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

১. *দুর্ভ দিন*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬১।

২. *শঙ্কিত আলোকে*, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৬৮।

৩. *বিপন্ন বিষাদ*, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৬৮।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

১. *অন্ধকারে একা*, সাহিত্য মঞ্জিল, ঢাকা, ১৯৫১।

২. *রক্তিম হৃদয়*, প্রকাশক : মাহতাব জামিল, ঢাকা, ১৯৭০।

৩. *জুলেখার মন*, সাহিত্য মঞ্জিল, ঢাকা, ১৯৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুর রাহমান

১. *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*, বার্ডস এ্যান্ড বুক্স, ঢাকা, ১৯৫৯।
২. *রৌদ্র করোটিতে*, প্রথম প্রকাশ (জুলাই-১৯৬৩), দ্বিতীয় সংস্করণ : বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৪।
৩. *নিরালোকে দিব্যরথ*, প্রথম প্রকাশ : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৮।
৪. *নিজ বাসভূমে*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭০।
৫. *বন্দী শিবির থেকে*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭১।

শহীদ কাদরী

১. *উত্তরাধিকার*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭।

সানাউল হক

১. *নদী ও মানুষের কবিতা*, ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৫৬।
২. *সম্ভবা অনন্যা*, পূর্ববাণী, ঢাকা, ১৯৬২।

সিকান্দার আবু জাফর

১. *প্রসন্ন প্রহর* , প্রথম প্রকাশ, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৫।
২. *তিমিরান্তিক*, প্রথম প্রকাশ, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৫।
৩. *বৈরী বৃষ্টিতে* , প্রথম প্রকাশ, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৫।
৪. *কবিতা ১৩৭২*, প্রথম প্রকাশ, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮।

সৈয়দ আলী আহসান

১. *চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা*, মোকাররম পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৪৫।
২. *অনেক আকাশ*, প্রথম প্রকাশ : বার্ডস এ্যান্ড বুকস, , ঢাকা ১৯৫৯।
৩. *একক সন্ধ্যায় বসন্ত*, প্রথম প্রকাশ : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬২।
৪. *সহসা সচকিত*, প্রথম প্রকাশ : বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৬।
৫. *উচ্চারণ*, প্রথম প্রকাশ : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮।

সৈয়দ শামসুল হক

১. *একদা এক রাজ্যে* , প্রথম প্রকাশ : সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬১।
২. *বিরতিহীন উৎসব*, প্রথম প্রকাশ : বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৬৯।
৩. *বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা*, প্রথম প্রকাশ : সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০।

হাসান হাফিজুর রহমান

১. *বিমুখ প্রান্তর*, পারাবত প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৬৩।
২. *অন্তিম শরের মতো*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়কগ্রন্থ

আজীজুল হক, *আত্তিত্ব চেতনা ও আমাদের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

আন্ওয়ার আহমদ (সম্পাদিত) *কবি ও কবিতা*, রূপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪।

আবদুর রহিম আজাদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রকৃতি ও প্রবণতা* (সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৭।

আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর*, নওরোজ কিতাবিস্তান (প্রথম সংস্করণ), ঢাকা, ১৯৬৯।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, *আবদুল গনি হাজারী (১৯২১—১৯৭৬)* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।

আবদুল হাফিজ, *আধুনিক সাহিত্য : বিবেচনাসমূহ*, বাংলাদেশ বুক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮২।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *উত্তর প্রজন্ম*, শিল্পতরু, ঢাকা, ১৯৯২।

আবদুস সাত্তার জীবন ও সাহিত্য, শিল্পতরু, ঢাকা, ১৯৯০।

আবিদ আজাদ (সম্পাদিত) *আবদুল মান্নান সৈয়দের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উৎসব* সংবর্ধনা গ্রন্থ, শিল্পতরু, ঢাকা, ১৯৯৩।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *কথা ও কবিতা*, মুক্তধার, ঢাকা, ১৯৮১।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, (বাংলাবিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২।

আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি সংসদ, ঢাকা, ১৯৭৮, *বাংলাদেশের কালচার*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৬৬।

আহমদ ছফা, *শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৯।

আহমদ শরীফ, *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা*, আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯১, ঢাকা, *মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, ঢাকা।

ইজাজ হোসেন, *শামসুর রাহমান*, ব্যক্তিত্ব প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১

ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

কবীর চৌধুরী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, শিল্পতরু, ঢাকা, ১৯৯২, *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৩৭৫।

কাজী দীন মুহম্মদ, ডক্টর, *বাংলা সন ও পহেলা বৈশাখ*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বসন্তসংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭৪।

কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*, প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৭৯।

কে. এম. রাইসউদ্দিন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স, ঢাকা।

খান সারওয়ার মুরশিদ সম্পাদিত *সমকালীন বাংলা সাহিত্য*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৯।

গোলাম কিবরিয়া, *বাংলাদেশের জাতিসত্তার স্বরূপ*, ঢাকা, ১৯৮৭।

গোলাম মুরশিদ, *পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, ঢাকা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *শব্দের সীমানা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬।

তুষার দাশ, *নিঃশব্দ বজ্র, আহসান হাবীবের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

নিতাই দাস, *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

নির্মলেন্দু গুণ, *আমার ছেলেবেলা*, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৭, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০।

বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

বশীর আল-হেলাল, *সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫।

বার্ণিক রায়, *কবিতা : চিত্রিত ছায়া, সংকৃত পুস্তক ভান্ডার*, কলিকাতা, ১৩৭৮।

মজির উদ্দীন, ডক্টর, *বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, ঢাকা, ১৯৬৭।

মনসুর মুসা, *বাংলাদেশ* (সম্পাদিত) বাঙলাবিভাগ, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭৪।

মধুসূদন চক্রবর্তী, ডক্টর, *বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা (১৯৪১—১৯৭১)* সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা, ১৯৮২।

মযহারুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলা কবিতা*, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাসুদুজ্জামান, ডক্টর, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকানদার আবু জাফর, কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

মুহম্মদ আবদুর রহিম, ডক্টর, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২ (৪র্থ সংস্করণ)।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর, *পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন*, উদ্বোধনী ভাষণ পুস্তিকা, ঢাকা, ১৯৫৪।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, (সম্পাদিত) *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ*, ঢাকা, ১৯৮৫।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *বাংলাকাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৩৭২।

রশীদ হায়দার, *অসহযোগ আন্দোলন : একাত্তর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

রেহমান সোবহান, *বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২।

রোকনুজ্জামান খান (সম্পাদিত) *আহসান হাবীব স্মারকগ্রন্থ*, আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা, ১৯৮৭।

শামসুজ্জামান খান, *নানা প্রসঙ্গ* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

শাহরিয়ার কবির, *মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৮।

শাহাবুদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮, ঢাকা।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ডক্টর, *সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার*, মন্ডল বুক হাউজ, কলিকাতা, ১৩৮৪, *সমকালীন সাহিত্যের ধারা*, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৬৫।

সত্যেন সেন, *বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম*, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা।

সরলানন্দ সেন, *ঢাকার চিঠি :* মুক্তধারা, কলিকাতা, ১৯৭১।

সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি—সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *স্বাধীনতার স্পৃহা সাম্যের ভয়*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৮।

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, *কাব্যনির্মাণকলা আরিস্টটল*, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৬।

সেলিনা হোসেন, *ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬।

সৈকত আসগর, *আধুনিক বাংলা কবিতা, শিল্পরূপ বিচার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

সৈয়দ আবুল মকসুদ, *ভাসানী (১ম খন্ড)* নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৬।

সৈয়দ আলী আহসান, *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭০।

হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩।

হায়াৎ সাইফ, *উক্তি ও উপলব্ধি*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

হুমায়ুন আজাদ, *শামসুর রাহমান নিঃসঙ্গ শেরপা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

সহায়ক প্রবন্ধ

আবদুল কাদির, 'বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তা : চিত্রের অপর দিক', *মাহেনও*, ২৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর, ঢাকা, ১৯৭১।

আবদুল কাদির খান, 'দশ বছরের বাংলা কবিতার একদিক', *মাহেনও*, ১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা মার্চ, ঢাকা, ১৯৬৭।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, সম্প্রতিক একটি কাব্যগ্রন্থ, *সমকাল*, ৮ম বর্ষ, ১৩৭১।

আবদুল হক, আধুনিক কবিতা, *মাহেনও*, ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা মার্চ, ঢাকা, ১৯৬৭।

আবদুল হাফিজ, সিকান্দার আবু জাফরের কবিতা-ভুবন, *সমকাল*, ১৮শ বর্ষ, মাঘ, ঢাকা, ১৩৮২।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশের কবিতা, একটি সামাজিক সমীক্ষা, *সমকাল*, ফাল্গুন, ঢাকা, ১৩৮৩।

আহসান হাবীব, পূর্ব পাকিস্তানী কবিতা : তার অন্বিষ্ট এবং ভাষা প্রসঙ্গে, *মাহেনও*, ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই, ঢাকা, ১৯৬৭।

কবীর চৌধুরী, আবদুল গনি হাজারীর কাব্যবিচার : একটি ভূমিকা, *সাকো সাহিত্য সাময়িকী*, সেপ্টেম্বর, ঢাকা, ১৯৭৭।

গোলাম মুস্তফা কামাল, পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা ও কবিমন : সমীক্ষণ, *মাহেনও*, ১৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ঢাকা, ১৯৬৭।

গোলাম মুস্তফা কামাল, সমাজ সাহিত্যে সমস্যা, *মাহেনও*, ২০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

মযহারুল ইসলাম, ডক্টর, পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন সাহিত্য, *মাহেনও*, ১৯শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর, ঢাকা, ১৯৬৭, ।

মীর আবু সালেক, আমাদের কাব্য সাহিত্যে জাতীয়চেতনা, *মাহেনও*, ২০শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৬৮, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর, বাংলাভাষা উন্নয়নে বাংলা বোর্ডের অবদান, *মাহেনও*, ১৮শ ভর্ষ ১২শ সংখ্যা মার্চ, ঢাকা।, ১৯৬৭

মুহম্মদ মতিউর রহমান, পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যের প্রেক্ষাপট, *মাহেনও*, ১৮শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা জানুয়ারি, ঢাকা, ১৯৬৭।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ : হাতেম তায়ী, *মাহেনও*, ১৯শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ঢাকা, ১৯৬৭।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বিশ বছরের সাহিত্য, *মাহেনও*, ১৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগষ্ট, ঢাকা, ১৯৬৭।

পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলিক গ্রন্থের আলোচনা

আজীজুল হক, ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে, '*দৈনিক সংবাদ*' ৩রা আষাঢ়, ঢাকা ১৩৮৫

আজীজুল হক, সাক্ষাৎকার, *দৈনিক বাংলা*, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ঢাকা, ১৩৯৮

আজীজুল হক, আজীজুল হকের কবিতা, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯শে বৈশাখ, ঢাকা, ১৩৯৭

আজীজুল হক, ঘুম ও সোনালী ঈগল, '*হালখাতা*' প্রস্তুতি সংখ্যা-১ / ডিসেম্বর, ঢাকা, ১৯৮৯

আতাউর রহমান, দুই ঋতু, '*বই*', ঢাকা, ১৯৬৬

আতাউর রহমান, দুই ঋতু, '*পূবালী*' ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৭২

আতাউর রহমান, দুই ঋতু, *দৈনিক ইত্তেহাদ*, ১৯৫৭

আতাউর রহমান, একদিন প্রতিদিন, 'পরিক্রম' অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

আতাউর রহমান, একদিন প্রতিদিন, '*পূবালী*', ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩৭২

আতাউর রহমান, বাংলাদেশের কবিতা : কয়েকজন কবি, *সাহিত্য চিন্তা*, আশ্বিন, কলিকাতা, ১৩৯১।

আবদুল গনি হাজারী, সামান্য ধন '*সমকাল*' আষাঢ়, ১৩৬৬।

আবদুল গনি হাজারী, সামান্য ধন '*উত্তরণ*' কার্তিক - অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬।

আবদুল গনি হাজারী, সূর্যের সিঁড়ি '*পরিক্রম*' অগ্রহায়ণ, ১৩৭২।

আবদুল গনি হাজারী, জাগ্রত প্রদীপে '*সাঁকো*' স্মৃতিসংখ্যা, ১৯৭৮।

আবদুল গনি হাজারী, জাগ্রত প্রদীপে '*সাঁকো*' স্মৃতিসংখ্যা, ১৯৭৭।

আবদুল গনি হাজারী, সামান্য ধন, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, ১৯৭৩।

আবদুল গনি হাজারী, সূর্যের সিঁড়ি, '*সাঁকো*', ঢাকা, ১৯৭৭।

আবদুল গনি হাজারী, সিকান্দার আবু জাফর-কালায়নের কবি, '*বই*' জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৭আহসান হাবীব, হায়াহরিণ, *সমকাল* (কবিতাসংখ্যা) ৮ম বর্ষ, ১৩৭১।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ঢাকা, ১৩৭৭।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ, *সমকাল*, ঢাকা, ১৯৬৭

আবদুল মান্নান সৈয়দ, জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা, *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ঢাকা, ১৩৭৭।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা, *কণ্ঠস্বর*, আগষ্ট, ঢাকা, ১৯৭০।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলাদেশের কবিপরিচিতি ও কবিতা, '*গঙ্গোত্রী*' জুন-আগস্ট, কলিকাতা, ১৯৭১।

আবদুর রশীদ খান, নক্ষত্র : মানুষ : মন, *দৈনিক বসুমতী*, কলিকাতা, ১৯৫২।

আবদুর রশীদ খান, বন্দী মুহূর্ত '*দেশ*' অক্টোবর, কলিকাতা, ১৯৬০।

আবদুর রশীদ খান, বন্দী মুহূর্ত '*সমকাল*' পঞ্চম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৬৯।

আবদুর রশীদ খান, নক্ষত্র : মানুষ : মন, *সোনার বাংলা*, ২৪শে মে, ঢাকা, ১৯৫২।

আবদুর রশীদ খান, বন্দী মুহূর্ত, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ঠা ডিসেম্বর০, ঢাকা, ১৯৬।

আবদুর রশীদ খান, বন্দী মুহূর্ত, *সওগাত*, আষাঢ়, ঢাকা, ১৯৬৮।

আবদুর রশীদ খান, মহুয়া, *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ই জানুয়ারি, ঢাকা, ১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুর রশীদ খান, মহুয়া, *পূবালী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭৩।

আবদুর রশীদ খান, নক্ষত্র : মানুষ : মন, '*আজাদী*' ৮ই জুন, ঢাকা, ১৯৫২।

আবদুর রশীদ খান, নক্ষত্র : মানুষ : মন, *মিল্লাত*, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ঢাকা, ১৩৪৯।

আবদুর রশীদ খান, নক্ষত্র স্মারক (*তৃতীয় সাহিত্য সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা*) *বাংলা সাহিত্য পরিষদ*, ঢাকা, ১৯৯১।

আবদুর রশীদ খান, নক্ষত্র, বিস্মিত প্রহর, *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ই মার্চ, ঢাকা, ১৯৭০।

আবদুস সাত্তার, বৃষ্টিমুখর, '*আগামী*' সেপ্টেম্বর, ঢাকা, ১৯৬০।

আবদুস সাত্তার, বৃষ্টিমুখর, 'সাপ্তাহিক দেশ' সেপ্টেম্বর সংখ্যা, কলিকাতা, ১৯৫৯।

আবদুস সাত্তার, বৃষ্টিমুখর, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ই ভদ্র, ঢাকা, ১৩৬৬।

আবদুস সাত্তার, বৃষ্টিমুখর, *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩০ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক-আশ্বিন , ঢাকা, ১৩৬৫-১৩৬৬।

আবদুস সাত্তার, অন্তরঙ্গ ধ্বনি, *আবদুস সাত্তার জীবন ও সাহিত্য*, শিল্পতরু, ঢাকা, ১৯৯০।

আবদুস সাত্তার, আমার ঘর নিজের বাড়ী, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১শে মাঘ, ঢাকা, ১৩৮৫।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সাতনরী হার, *মাসিক মোহাম্মদী*, ২৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৪, আশ্বিন, ঢাকা, ১৩৬৫।

আবু বকর সিদ্দিক, ধবল দুধের স্বরগ্রাম, '*উচ্চারণ*' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৬৯।

আবু বকর সিদ্দিক, কবিতার বিষয় ও লক্ষ্য, *দৈনিক বার্তা সাময়িকী*, ঢাকা, ১৯৮৫।

আবু বকর সিদ্দিক, ধবল দুধের স্বরগ্রাম, *এলান*, ঢাকা, ১৯৭০।

আবু বকর সিদ্দিক, কবিতার কবি, *মাসিক কিংশুক*, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭৬।

আবু বকর সিদ্দিক, ধবল দুধের স্বরগ্রাম, '*কালস্রোত*' ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭২।

আবু বকর সিদ্দিক, বাংলাদেশের কবিতা : কয়েকজন কবি, '*সাহিত্য চিন্তা* আশ্বিন, কলিকাতা, ১৩৯১।

আবুল হোসেন, নববসন্ত '*সওগাত*' শ্রাবণ, ঢাকা, ১৩৫০।

আবুল হোসেন, বিরস সংলাপ '*পূর্বমেঘ* ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭৭।

আবুল হোসেন, হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস, *দৈনিক দেশ*, ঢাকা, ১৯৮২।

আবুল হোসেন, বাংলাদেশের কবিতা : কয়েকজন কবি '*সাহিত্যচিন্তা* আশ্বিন, কলিকাতা, ১৩৯১।

আবুল হোসেন, আবুল হোসেনের কবিতা, '*সংবাদ* ২২ আশ্বিন, ১৪০০, ৭ অক্টোবর , ঢাকা, ১৯৯৩।

আবুল হোসেন, আবুল হোসেনের কবিতা, '*বই*' , ঢাকা, ১৯৮২।

আল মাহমুদ, কালের কলস, *দেশ*, ১০ জুলাই সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭১।

আল মাহমুদ, কালের কলস, '*বেলা—অবেলা*' কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৮।

আল মাহমুদ, কালের কলস, '*পরিচয়*' পৌষ-মাঘ, ১৩৭৮।

আল মাহমুদ, লোক লোকান্তর, *সমকাল*, ৮ম বর্ষ, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭১।

আল মাহমুদ, বাংলাদেশের কবিতা : কয়েকজন কবি, '*সাহিত্য চিন্তা*', আশ্বিন, কলিকাতা, ১৩৯১।

আল মাহমুদ, বাংলাদেশের কবি পরিচিতি ও কবিতা, '*গঙ্গোত্রী*' জুন-আগষ্ট, কলিকাতা, ১৩৯১।

আল মাহমুদ, কবিতা ও আল মাহমুদ, '*সময়ানুগ*' অক্টোবর, কলিকাতা, ১৯৭৮।

আশরাফ সিদ্দিকী, তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা, মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ঢাকা, ১৩৬৫, আশ্বিন, ১৩৬৬।

আহসান হাবীব, ছায়াহরিণ, *পূবালী*, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৬৯।

আহসান হাবীব, রাত্রিশেষ, *মাসিক মোহাম্মদী*, বিংশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৪।

আহসান হাবীব, সারা দুপুর, *পূবালী* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম - ২য় সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৭২।

আহসান হাবীব, পাক বাংলার কবিতার কথা, *পূবালী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৭২।

আহসান হাবীব, রাত্রিশেষের কবি, 'সংবাদ' ' ২১শে সেপ্টেম্বর, ঢাকা, ১৯৫২।

ওমর আলী, এদেশে শ্যামল রঙ রমনীর সুনাম শুনেছি, *পূর্বমেঘ*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ঢাকা, ১৩৬৮।

জাহানারা আরজু, নীল স্বপ্ন *পূবালী* ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, চৈত্র, ঢাকা, ১৩৬৯।

জিয়া হায়দার, বাংলাদেশের কবি পরিচিতি ও কবিতা, '*গঙ্গোত্রী*' জুন-আগষ্ট, কলিকাতা, ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

দিলওয়ার, ঐকতান, *পূবালী*, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, আষাঢ়, ঢাকা, ১৩৭২।

দিলওয়ার, সাক্ষাৎকার, *বাংলাবাজার*, ১ম বর্ষ, ১৫৫ সংখ্যা, ২০ পৌষ, ঢাকা, ১৩৯৯।

নির্মলেন্দু গুণ, প্রেমাংশুর রক্ত চাই, '*উত্তরাধিকার*' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

নির্মলেন্দু গুণ, বাংলাদেশের কবি পরিচিতি ও কবিতা, '*গঙ্গোত্রী*' জুন-আগস্ট, কলিকাতা, ১৯৭১।

নির্মলেন্দু গুণ, নতুন কবিতা, তেরজন আধুনিক কবির কবিতা, '*কাফেলা*' ৮ম ও ৯ম সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ঢাকা, ১৩৫৬।

ফজল শাহাবুদ্দীন, তৃষ্ণার অগ্নিতে একা, *পূবালী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ, ঢাকা, ১৩৭৩।

ফজল শাহাবুদ্দীন, বাংলাদেশের কবি পরিচিতি ও কবিতা, '*গঙ্গোত্রী*' জুন-আগস্ট, কলিকাতা, ১৯৭১।

ফররুখ আহমদ, মুহূর্তের কবিতা : একটি স্মরণীয় গ্রন্থ, *পূবালী*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ঢাকা, ১৩৭০।

ফররুখ আহমদ, হাতেম তায়ী, *পূবালী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ঢাকা, ১৩৭৩।

ফররুখ আহমদ, ফররুখ মানস : দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে, '*বাংলার বাণী*' ২৩শে অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৯২।

ফররুখ আহমদ, বিপরীত ঐক্যের কবি '*ঢাকা*' ৩রা আষাঢ়, ঢাকা, ১৪০০।

ফররুখ আহমদ, ফররুখ আহমদের কবিতা, *পূর্বমেঘ*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭১।

মুনীর চৌধুরী, সারা দুপুর, মাসিক *পূবালী*, আশ্বিন-কার্তিক, ঢাকা, ১৩৭২।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, দুর্লভ দিন, *পূবালী*, ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ভাদ্র, ঢাকা, ১৩৬৯।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশের কবি পরিচিতি ও কবিতা, '*গঙ্গোত্রী*' জুন-আগস্ট, ঢাকা, ১৯৭১।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, অন্ধকারে রক্তিম হৃদয়, '*মাহেনও*' আশ্বিন, ঢাকা, ১৩৭৭।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জুলেখার মন, *সমকাল*, আশ্বিন, ঢাকা, ১৩৬৬।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জুলেখার মন, *পূবালী*, মাঘ, ঢাকা, ১৩৭৬।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, অন্ধকারে একা, *মাহেনও*, আশ্বিন, ঢাকা, ১৩৭৭।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, অন্ধকারে একা, *পূবালী*, ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ, সপ্তম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭৭।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, অন্ধকারে একা, *কাফেলা*, এপ্রিল, ঢাকা, ১৯৮১।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, রক্তিম হৃদয়, *চিত্রাকাশ*, ১২ নভেম্বর, ঢাকা, ১৯৭০।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, রক্তিম হৃদয়, *বই*, নভেম্বর, ঢাকা, ১৯৭০।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, রক্তিম হৃদয়, *মাসিক ডাইজেস্ট*, ঢাকা, ১৯৭০।

রশীদ করীম, ফেলে আসা দিন : আবুল হোসেনের নববসন্ত, *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রোকনুজ্জামান খান, 'আহসান হাবীব স্মারক গ্রন্থ' *আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি*, ঢাকা, ১৯৮৭।

শামসুর রাহমান, প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, '*উত্তরণ*' ২য় বর্স ৪থ, ৫ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৬৭।

শামসুর বাহমান, প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, *সমকাল*, ৪থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৬৮।

শামসুর রাহমান, প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, *মাসিক পূবালী*, ঢাকা, ১৩৫৯।

শামসুর রাহমান, রৌদ্র করোটিতে, *সমকাল কবিতা সংখ্যা*, ৮ম বর্ষ, ঢাকা, ১৩৭১।

শামসুর রাহমান, নিরালোকে দিব্যরথ, *উত্তরাধিকার*, ২য় বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭৪।

শামসুর রাহমান, নিজ বাসভূমে, *পূর্বমেঘ*, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ঢাকা, ১৩৭৭।

শামসুর রাহমান, বাংলাদেশের কবি পরিচিতি ও কবিতা, *গঙ্গোত্রী*, জুন-আগস্ট, কলিকাতা, ১৯৭১।

শামসুর রাহমান, পূর্ববঙ্গের কবিতা, *সাহিত্যপত্র*, চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতা, ১৩৭৫।

শহীদ কাদরী, উত্তরাধিকার, *পরিক্রম*, ৫ম বর্ষ, ৮ম, ৯ম সংখ্যা, ফেব্রু-মাচ, ঢাকা, ১৯৬৯।

সানাউল হক, সূর্য অন্যতর, *সমকাল*, ৮ম বর্ষ, ঢাকা, ১৩৭১।

সানাউল হক, সম্ভবা অনন্যা, *পূবালী*, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, বৈশাখ, ঢাকা, ১৩৭০।

সানাউল হক, সানাউল হকের কবিতা, *পূর্বমেঘ*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭১।

সিকানদার আবু জাফর, প্রসন্ন প্রহর, তিমিরান্তিক, বৈরী বৃষ্টিতে, *সমকাল*, কবিতাসংখ্যা, ৮ম বর্ষ, ঢাকা, ১৩৭১।

Dhaka University Institutional Repository

সিকানদার আবু জাফর, সাহিত্য সাধনা, *'বই'* ষষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭০।

সিকানদার আবু জাফর, কবিমানস, *সমকাল*, অষ্টাদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ঢাকা, ১৩৮২।

সৈয়দ আলী আহসান, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, *সমকাল*, ৮ম বর্ষ-পৌষ-চৈত্র, ঢাকা, ১৩৭১।

সৈয়দ আলী আহসান, সাক্ষাৎকার, *'বই'* ২৬ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান, সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি, *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ*, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক, একদা এক রাজ্যে, *সমকাল*, ৮ম বর্ষ, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭১, ঢাকা, হায়াৎ সাইফ, নৌফেল ও হাতেম, *পূর্বমেঘ*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৬২।

হাসান হাফিজুর রহমান, বিমুখ প্রান্তর, *সমকাল*, ৮ম বর্ষ, পৌষ-চৈত্র, ঢাকা, ১৩৭১।

হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের কবিপরিচিতি ও কবিতা, *'গঙ্গোত্রী'* জুন-আগষ্ট, কলিকাতা, ১৯৭১।

দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয়, ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৬৯।

দৈনিক পাকিস্তান সম্পাদকীয়, ২৯শে আগস্ট, ঢাকা, ১৯৭০।

দৈনিক সংবাদ সম্পাদকীয়, ২১শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৭০।

পয়গাম সম্পাদকীয়, ২৭ আগস্ট, ঢাকা, ১৯৬৭।

Bangla Academy Journal (ed) Kabir Chowdhury, 1970, Dhaka

Bangladesh Observer, Mohammad Mahfuzullah Profile of A Poet-1, Dhaka

Zillur Rahman Siddique, *Literature of Bangladesh and Essays*

অভিধান, বিশ্বকোষ, গ্রন্থপঞ্জি ও অন্যান্য

আবু হেনা মোস্তফা কামাল সম্পাদিত বাংলা একাডেমী পত্রিকা, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, ১৩৯৫।

আহমদ শরীফ সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬।

একুশের স্মারক গ্রন্থ, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, ১৯৮৪।

একুশের প্রবন্ধ, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৮৯।

বাংলা একাডেমী প্রণীত বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, ১৯৮৪।

মনজুরে মওলা সম্পাদিত বাংলা একাডেমী পত্রিকা, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, ১৩৯০।

পদাবলীর অষ্টম কবিতা সন্ধ্যা, *ব্রোশিওর*, ঢাকা, ১৯৮৩।

পদাবলী পুরস্কার '৮২ প্রদান ও কবিতা সন্ধ্যা, *ব্রোশিওর*, ঢাকা, ১৯৮৩।

পদাবলী পুরস্কার, '৮৫ প্রদান অনুষ্ঠান ও কবিতা সন্ধ্যা, *ব্রোশিওর*, ঢাকা, ১৯৮৭।

যোগেশ চন্দ্র বোগল প্রণীত ভারত কোষ (৫ম খন্ড), *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ*, কলিকাতা, ১৯৭৩।

Report of the East Bengal Language Committee, 1979,